হরর কাহিনি

হাকিনী

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত



হরর কাহিনি

হাকিনী

সম্পাদনা

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0247-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

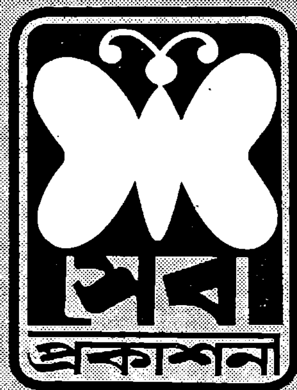
পেস্টিং ইনচার্জ: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

HAKINI
Horror Stories
Edited by: Anish Das Apu



পঁচাশি টাকা

সূচি

ভূমিকা

আমার সম্পাদিত সর্বশেষ হরর সংকলন বেরিয়েছে দু'বছরেরও আগে। এরপরে আমি বাংলাবাজার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে সেবা'য় লেখার সময় করে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই। আমার হরর-ভক্ত পাঠকরা আমি সেবায় কেন নিয়মিত নই এবং আরেকটি হরর সংকলন কেন করছি না সেজন্য সমানে অনুযোগ করে আসছিলেন। মাস দেড়েক আগে, এক বিকেলে টিংকু ভাইয়ের হঠাৎ ফোন। লেখালেখি সংক্রান্ত খুব জরুরী প্রয়োজন না হলে তিনি সাধারণত ফোন করেন না। আমার আশংকাই সত্যি। তিনি বললেন, 'অনীশ দা, সেই কবে *ছায়াবৃত্ত* করলেন। তারপর আর আপনার কোন খবর নেই। এমনকী রহস্যপত্রিকাতেও তো লিখছেন না!'

তাঁর অভিযোগের তোড় থেকে মুক্তি পেতে সাত-পাঁচ না ভেবেই বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আবার আমি সেবা'য় একটি হরর সংকলন করার কথা ভাবছি। রহস্যপত্রিকার জন্যেও এক সঙ্গে কয়েকটি গল্প জমা দেব। ভাববেন না।'

আমি সাধারণত কথা দিলে কথা রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে যাই, কথা রক্ষা করা হয়ে ওঠে না। তবে এবারে সেরকম কোনও বিপদ আসার আগেই **'হাকিনী'** নামের হরর সংকলনটি তৈরি করে মুখরক্ষা করে ফেললাম।

মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর-এর *'হাকিনী'* পড়ে আমি রীতিমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে একটি হরর মুভি দেখছি। কোন লেখক একটি ভৌতিক কাহিনিকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে কত যে পরিশ্রম করতে পারেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ *হাকিনী*। আমি এ পর্যন্ত যতগুলো হরর সংকলন করেছি, সন্দেহ নেই, তৈমূর সাহেবের মত ইতিহাস-আশ্রয়ী ভৌতিক গল্প খুব কমই পড়েছি। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় সত্যি বাস্তবে এরকম কিছু বুঝি ঘটতে পারে। *'হাকিনী'* পড়ুন। আমার সঙ্গে একমত হবেন।

ইমরান খান খুব ভাল একজন হরর লেখক। তাঁর লেখা এর আগেও আমার সংকলনে ছাপা হয়েছে। *বালাই* একটি উৎকৃষ্টমানের পিশাচ কাহিনি বলে এ সংকলনে সসম্মানে জায়গা করে নিতে পেরেছে।

রহস্যপত্রিকায় ইদানীং যে ক'জন তরুণ লেখক চুটিয়ে হরর গল্প

লিখছেন তাদের মধ্যে সহজেই নজর কেড়েছেন আফজাল হোসেন। এ লেখকের *বহুরূপী* গল্পের শেষে যে চমকটি রয়েছে তা সত্যিই পাঠকদের চমকিত করে তোলে।

রুমানা বৈশাখীর হরর গল্প আমার প্রায় প্রতিটি সংকলনেই স্থান পেয়েছে। তার *ভয়* গল্পটি শিহরিত করে তুলবে পাঠককে।

এ সংকলনে গা শিউরানো আরও দু'টি গল্প রয়েছে—রিয়াজুল আলম শাওনের *রাত ঠিক ১২টা* এবং মোঃ রাকিব হাসানের *মৃত্যু খেলা*। নবীন এ লেখকদ্বয়ের লেখা আশা করি আপনাদেরকে হতাশ করবে না।

মিলন গাঙ্গুলীর কোন লেখা আমি আগে পড়িনি। টিংকু ভাই বললেন, '*হরর গল্প লিখতে চেয়েছিলাম* লেখাটি পড়ুন। ভাল লাগবে।' পড়লাম। এবং বেশ লাগল লেখকের লেখনীতে চমৎকার রসবোধের পরিচয় পেয়ে। হরর-এর মধ্যে হিউমারের যে মিশেলটা দিয়েছেন মিলন, সত্যি দারুণ! লেগে থাকলে এ লেখকটি যাবেন অনেকদূর।

এ সংকলনে ভিন্নরকম রোমাঞ্চের স্বাদ দেবে হাসানুজ্জামান মেহেদীর *ফকির*। রতন চক্রবর্তীর *লালবিবি*, শামীম আল মামুনের *ঘুমবাড়ি* কিংবা রাসেল আহমেদের *অন্য ভুবন*ও কিন্তু মন্দ নয়।

ভাল লাগবে সংকলনে স্থান পাওয়া অনুবাদ হরর গল্পগুলোও। এ প্রসঙ্গে আর বিশদ আলোচনায় গেলাম না। লেখাগুলো পড়লেই আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।

সবশেষে পাঠকদের অনুযোগের জবাবে বলি–আমি আগামী বছর অর্থাৎ ২০১২ সাল থেকে সেবায় আবার নিয়মিত লেখালেখি শুরু করব। তারই সূচনা হিসেবে ফেব্রুয়ারি বইমেলায় আমার **অশুভ কুয়াশা** নামে একটি হরর সংকলন বেরুবে। ওতে শুধু আমার হরর গল্পই থাকবে এবং সবগুলো গল্পই হবে নতুন, আগে কোথাও ছাপা হয়নি।

আমি এর আগে বলেছিলাম ডেনিস হুইটলির অসাধারণ সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পাঠকদেরকে উপহার দেব। কথা দিলাম–আগামী বছর থেকে তাঁরা হুইটলির দুর্দান্ত কাহিনিগুলোর অনুবাদ অবশ্যই পাবেন। সে সঙ্গে আমার হরর উপন্যাস ও গল্প সংকলনও থাকবে। সবাইকে শুভেচ্ছা। সবাই ভাল থাকুন।

অনীশ দাস অপু
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

হাকিনী

এক

পয়সাঅলা বাঙালি পরিবারগুলোর ব্যাপারে একটি প্রবাদ আছে। সেটি হলো এদের প্রথম পুরুষ কেনারাম, দ্বিতীয় পুরুষ ভোগারাম, আর তৃতীয় পুরুষ বেচারাম। সোজা কথায় প্রথম পুরুষ টাকা বানাতে, জমিজমা কিনতেই জীবন হারাম করে ফেলে। দ্বিতীয় পুরুষ শুধু বসে বসে খায় আর ঘোরে। তৃতীয় পুরুষ সব বেচেকিনে শেষ করে। চতুর্থ পুরুষের বেলায় কী হয় তা অবশ্য বলা নেই। তবে সে যে বস্তিরাম হবে তা নিশ্চিত। আমাদের পরিবারে অবশ্য কেনারাম যে বেচারাম সেই-ই। এক পুরুষেই সব উড়েপুড়ে শেষ। আমার বাবার ছিল তেজারতির ব্যবসা, যাকে বলে সুদের কারবার। জমিজমা গহনা বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়াই ছিল তাঁর কাজ। প্রথমদিকে বাবা ছিলেন খুলনা শহরের এক মাড়োয়ারীর দোকানের হিসাব লেখক। ৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর সেই মাড়োয়ারী ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে গেল। সেই সাথে গেল বাবার চাকরিও। বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। একদিন দুপুরে চার আনার বাদাম কিনে হাদিস পার্কের এক বেঞ্চের ওপর বসে কীভাবে আগামী মাসের ঘর ভাড়া দেবেন সেই কথা যখন ভাবছেন এবং

উদাস হয়ে পার্কের গেটের সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, তখন হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল গেটের পাশে বটগাছের নীচে বসা এক জ্যোতিষীর ওপর। জ্যোতিষীর পাশে পার্কের রেলিংয়ে লাল সালুতে রূপালী রঙে লেখা:

জ্যোতিষ সাগর নেতাই নাথ
হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা হয়
দর্শনী ১২ আনা মাত্র।

মাঝ বয়সী ঘোর সংসারী মানুষ অর্থকষ্টে পড়লে তার মাথার ঠিক থাকে না। চার আনার বাদাম কেনার পর বাবার সম্বল তখন একুনে বারো আনা। তিনি জ্যোতিষ সাগরকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করালেন। নেতাই নাথ বাবাকে বললেন ব্যবসার লাইনে বৃহস্পতি তুঙ্গে। চাকরির ক্ষেত্রে শনির বলয়ে কেতুর আনাগোনা। আগামী পঁচিশ বছরে শনির বলয় ছেড়ে কেতুর অন্য কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা জিরো পার্সেন্ট। জ্যোতিষ সাগরকে হাত দেখানোর আগে বারো আনাই অ্যাডভান্স করতে হয়েছে। বাবার দুবছরের পুরনো রঙজ্বলা ক্রিজভাঙা প্যান্টের পকেট তখন গ্যাস বেলুনের মত হালকা। বাসায় শ'খানেক টাকা মা'র কাছে আছে। শেষ সম্বল। ব্যবসা কীভাবে হবে বুঝতে পারছেন না। তিনি জ্যোতিষ সাগরকে জিজ্ঞেস করলেন কীসের ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা। জ্যোতিষ তাঁকে তেজারতির ব্যবসা ধরতে বললেন। সাফল্যের পরিমাণ শতভাগ। আগেই বলেছি ছাপোষা মানুষ বিপদে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। বাবা চলে গেলেন ঘোরের ভেতর। বাস করতে লাগলেন এক মানসিক কোমায়। বাসায় ফিরে মাকে বললেন, 'বিমলা, চাকরি তো অনেকদিন করলাম। এবার ভাবছি ব্যবসা-বাণিজ্য করব।'

মা বললেন, 'আচ্ছা তা না হয় করবেন। কিন্তু আপনার পুঁজি

কোথায়?’

‘তোমার বড় ভাইয়ের তো বিরাট অবস্থা। তার কাছ থেকে হাজার দশেক এনে দাও। এক বছরের ভেতর শোধ হয়ে যাবে।’

‘আর যদি শোধ দিতে না পারেন, তখন?’

‘না পারলে তোমার বাবার সম্পত্তির যে অংশ তুমি পাবে ওটা তার হবে।’

‘ওইটুকুই তো সম্পত্তি। হাতের পাঁচ। ওটা গেলে আর থাকল কী? পথে পথে ভিক্ষে করে খেতে হবে।’

‘অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে পথে পথে ভিক্ষে তো মনে হয় কাল থেকেই করতে হবে। যা বলি মন দিয়ে শোনো। তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকাটা এনে দাও। মাড়োয়ারীর দোকানটা এখনও খালিই আছে। আপাতত ওখানেই বসা যাবে। নতুন মালিককে মাঝে মাঝে কিছু ভাড়া দিলেই হলো।’

দুই

সেই থেকে শুরু। দশ বছরে বাবা প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেলেন। সুদের কারবারে সাধারণত যা হয়। আসল শোধ দিতে পারলেও সুদ থাকে। যদি সুদ শোধ হয় তো আসল থাকে। এগুলেও নির্বংশের ব্যাটা পেছালেও নির্বংশের ব্যাটা। খাতকদের কাউকেই ছ'মাসের বেশি সময় বাবা দিতেন না। এর ভেতর আসলসহ সুদের টাকা শোধ না হলে বন্ধকী সম্পত্তি কিম্বা গহনা বাজেয়াপ্ত হত। নিয়মানুযায়ী সুদসহ আসল কেটে রেখে সম্পত্তি

বা গহনা বিক্রির উদ্বৃত্ত টাকা খাতককে দেয়ার কথা। বাবা দিতেন না। বিশেষ করে অসহায় বিধবা, এতিম অথবা অন্য জেলার লোকদের বেলায়। তাঁর পোষা কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা ছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে এলে তাদেরকে এরা ভাগিয়ে দিত।

তিন

বাবা তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। দুটি বাড়ি কেনার পর তিন নম্বর বাড়ির বায়না করবেন, বিপদ ঘটল ঠিক তখন। পৌষ মাসের এক মেঘলা দিনে সন্ধে বেলা অশীতিপর এক বৃদ্ধা রিকশা থেকে তাঁর দোকানের সামনে নামল। মহিলা কালীঘাটে পুরনো এক বাড়িতে থাকে। দুটো বালা বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে চায়। বালাদুটো হাতে নিয়ে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন বাবা। পুরনো জিনিস। আদ্যিকালের ডিজাইন। তবে জিনিস ভারি। দুটোতে কম করে হলেও পাঁচ ভরি সোনা আছে। বর্তমান বাজার দরে ওগুলোর দাম সাড়ে তিনহাজার টাকা হওয়ার কথা। বাবা বললেন, 'ওগুলো রেখে পাঁচশো টাকা নিয়ে যান। ছ'মাসের ভেতর সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বালা ফেরত নিয়ে যাবেন। দেনা পরিশোধ করতে না পারলে মাল বাজেয়াপ্ত হবে।'

বুড়ি কাগজে টিপ সই দিয়ে টাকা, রশিদ নিয়ে কালীঘাটে ফিরে গেল। ছ'মাস পার হলো। বুড়ির দেখা নেই। বাবা বালাদুটো বাসায় এনে তাঁর শোবার ঘরে সিন্দুকে রেখে দিলেন। তখন

১৯৭৫ সাল।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক দল বা জাগ দল নামে নতুন দল গঠন করেছেন। সেই দলের উঠতি নেতাদের সাংঘাতিক দাপট। এইরকম এক নেতা যার নাম মোটা মোসলেম। বাবাকে বলল দোকান ছেড়ে দেয়ার জন্যে। মাড়োয়ারীর ওই দোকান অর্পিত সম্পত্তি। ভেস্টেড প্রপার্টি। সরকারের কাছ থেকে নিরানব্বই বছরের লিজ নিয়েছে সে। কাগজপত্র আপটুডেট। বাবা বললেন দোকান তাঁর দখলে। আগের মালিকের কাছ থেকে তিনি কিনে নিয়েছেন। কাগজপত্র তাঁরও আছে। বাবা যেমন বুনো ওল নেতাও তেমন বাঘা তেঁতুল। গণ্ডগোল চরমে উঠল। নেতা বুঝল হুমকি-ধামকিতে কাজ হবে না। সে ধরল অন্য রাস্তা। থানার ওসিকে হাত করে দুটো মার্ডার কেসে বাবার নাম ঢুকিয়ে দিল। এর একটিতে তাঁর পোষা গুণ্ডা-পাণ্ডার একজনকে বানাল রাজসাক্ষী। ভাল রকমের জটিল মামলা। টুটপাড়ার এক হিন্দু বিধবার নাতি খুন হয়েছিল। পুরোপুরি বখে যাওয়া এই নাতির বাবা-মা থাকত কলকাতায়। বিরাট বাড়িতে দিদিমা একা। কলকাতার ছোট্ট খুপরি বাসায় তার দম বন্ধ হয়ে আসে। নাতির কাজ কলেজে পড়াশুনো করা, দিদিমাকে দেখে রাখা। এই দুটোর কোনটাতেই তার আগ্রহ ছিল না। তার সব আগ্রহ জুয়া, মদ আর বাজে মেয়েমানুষে। দাদীর গহনাপাতি বন্ধক রেখে বাবার কাছ থেকে প্রায়ই টাকা ধার নিত সে। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা গেল প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা বন্ধক রেখে বাবা তাকে দিয়েছেন মাত্র দুহাজার। খুনের মোটিভ 'পরিষ্কার'।

বাবার ঠাঁই হলো জেল হাজতে। কেস চলল মাসের পর মাস।

থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি উকিল মোক্তার করতে যেয়ে টাকা খরচ হতে লাগল হুহু করে। সুদখোরকে কেউ পছন্দ করে না। আমরা কারও সহানুভূতি পেলাম না। যেখানে পাঁচশ'তে কাজ হওয়ার কথা সেখানে দিতে হয় হাজার টাকা। ক্যাশ যা ছিল গেল। এরপর গেল জমিজমা বাড়িঘর। বাবা হাজত থেকে আর বেরোতে পারলেন না। সাজানো মামলায় ফাঁকফোকর কম। উকিল সাহেব প্রথম প্রথম বলতেন আগামী হেয়ারিংয়েই বেইল হবে। এখন কিছুই বলেন না। একদিন চেম্বারে অপেক্ষা করছি। উকিল সাহেব কোথায় যেন গেছেন। তাঁর মুহুরী আস্তে করে বলল, 'মনে হয় কনভিকশান হয়ে যাবে।'

এদিকে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। একদিন সকালে বসে ডায়রী লিখছি, শোবার ঘরের সিন্দুক খুলে সেই পুরনো বালাদুটো বের করে মা বললেন, 'দেখ তো সঞ্জয়, এগুলো বেচা যায় কি না?'

চার

খুলনার সবচেয়ে বড় সোনার দোকান অমিয় জুয়েলার্স। মন্ময় চৌধুরী দোকানের মালিক। বিরাট ধনী লোক। কারও সাথে মেশেন না। দোকানের কাউন্টারে বালাদুটো রেখে সেল্‌সম্যানকে বললাম, এগুলো আমি বেচতে চাই। সেল্‌সম্যান প্রথমে খুঁটিয়ে দেখল। কষ্টি পাথরে ঘসে সোনার মান যাচাই করল।

সবশেষে নিল ওজন। তারপর বলল, 'এদুটোতে পাঁচভরি

সোনা আছে। অনেক টাকার ব্যাপার। মালিককে দেখাতে হবে।'

বললাম, 'ঠিক আছে দেখান আপনার মালিককে।'

ভেতরে চলে গেল সেল্সম্যান। পাঁচ মিনিট পর ঘুরে এসে বলল, 'আপনাকে আমরা এদুটোর জন্যে পাঁচ হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। দোকানে এত ক্যাশ নেই। সাহেব বলেছেন এখন আড়াই হাজার দিতে। বাকিটা সন্ধ্যার পর আসলে পাবেন। কী করবেন দেখেন।'

সত্যি বলতে কী, তিন হাজারের বেশি আমি আশাই করিনি। সেই তুলনায় পাঁচ হাজার অনেক বেশি।

বললাম, 'ঠিক আছে, সন্ধের পর এসে বাকিটা নিয়ে যাব। একটা রশিদ লিখে দেন।'

সন্ধের পর আবার গেলাম অমিয় জুয়েলার্সে। আগের সেল্সম্যান কাস্টমার নিয়ে ব্যস্ত। বুড়োমত একজন এগিয়ে এল। বলল, 'আমি দোকানের ম্যানেজার। সাহেব আপনার সাথে দুমিনিট কথা বলতে চান। টাকাটা উনিই আপনাকে দেবেন। আমার সাথে একটু ভেতরে আসেন।'

কাউণ্টার পার হয়ে শোকেসের পাশে সরু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বিরাট হলঘরের মত কামরায় আবছা অন্ধকারে স্যাঁকরার দল লাইন দিয়ে বসে কাজ করছে। নাইট্রিক এসিডের ঝাঁঝাল গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। লোকগুলো বছরের পর বছর এই পরিবেশে কাজ করছে কী করে? পেতলের সরু পাইপ মুখে লাগিয়ে গহনার গায়ে অনবরত ফুঁ দিচ্ছে তারা। গাল শ্রাবণ মাসের কোলা ব্যাঙের মত ফুলে উঠেছে। ফুসফুস এত চাপ সহ্য করে কীভাবে? হলঘর পেরিয়ে লাল কার্পেট মোড়া ছোট একটি প্যাসেজের মাথায় কাঁচ লাগানো সেগুন কাঠের দরজা। নক্ করে ম্যানেজার আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড জানালাঅলা ঝকঝকে কামরা। দেয়ালের একদিকে রেমিংটন কোম্পানির ইয়াবড় সিন্দুক। এই জগদ্দল পাথরের মত ভারি বস্তু দোতলায় যে কারিগর উঠিয়েছে তাকে অভিনন্দন। অন্য দেয়ালের পুরোটা জুড়ে বই ভর্তি কাঁচের শোকেস। মন্ময় চৌধুরী আমার দিকে তাকালেন। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের 'কিনু গোয়ালার গলি' কবিতার কথা। 'যত্নে পাট করা লম্বা চুল। বড়বড় চোখ। সৌখিন মেজাজ। কর্নেট বাজানো তার শখ।' পার্থক্য শুধু এই যে এঁর চুলগুলো ধবধবে সাদা। ছড়িয়ে আছে ঘাড়ের ওপর। ইস্ত্রি করা ফিনফিনে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা। তবে ইনি যন্ত্র শিল্পী কিনা বুঝতে পারছি না। ধারণা করেছিলাম কালো মোটা ফতুয়া পরা ধূর্ত চেহারার কাউকে দেখতে পাব। মন্ময় চৌধুরী দেখতে রবীন্দ্রনাথের মত। সাধক টাইপ চেহারা। এই লোকের লেখালেখি করার কথা। মাঝে মধ্যে সভাসমিতিতে বক্তৃতা। কাগজে কাগজে ইণ্টারভিউ। মনোযোগ দিয়ে পুরনো আমলের একটি ক্যাটালগ দেখছেন মন্ময় চৌধুরী। ইশারায় বসতে বললেন।

'আপনি সঞ্জয় বাবু?' গভীর কালো চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আজ্ঞে, আমিই সঞ্জয়।'

'বালাদুটো পেলেন কোথায়?'

কোনকিছু গোপন না করে তাঁকে সব ভেঙেচুরে বললাম।

'বুড়ির বাড়ির ঠিকানা কি আছে আপনার কাছে?'

'ছিল তো বটেই। তবে পুলিশ খাতাপত্র সব জব্দ করে মালখানায় রেখেছে। এখন আর সেটা পাব কীভাবে?'

'হুমম, বুঝতে পারছি।'

'একটা প্রশ্ন করি। কিছু মনে করবেন না তো?'

'সেটা বোঝা যাবে প্রশ্ন শোনার পর। কী প্রশ্ন?'

'বুড়ির বাড়ি যেয়ে ভেরিফাই করতে চান আমি সত্যি বলছি কিনা এই তো? তার প্রয়োজন নেই। আমি সত্যি কথাই বলছি। মিথ্যে বললে আপনি ধরে ফেলতেন।'

'ব্যাপারটা তা নয়। বুড়ির সাথে একটু কথা বলতে চাই আমি। বালাদুটো তার কাছে এল কীভাবে সেইটে জানতে চাই। আপনি বলেছেন বুড়ি থাকে কালীঘাটে। এটাই বা জানলেন কীভাবে? খাতাপত্র মালখানায়। বাবা জেল হাজতে। বালাদুটো হাতে পেয়েই আপনি আমার এখানে।'

'মার কাছ থেকে জেনেছি। দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাবা গহনাপাতি বাসায় আনতেন খুব কম। পুরনো গয়না মাকে কখনও দেননি। নতুন গড়িয়ে দিতেন। বালাগুলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বাবাকে জিজ্ঞেস করে মা জানতে পারেন কালীঘাটের এক বুড়ির গয়না ওগুলো। আপনি যদি বুড়িকে খুঁজে বের করতে পারেন তা হলে বলবেন কিছু টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই আমি।'

''আপনার কোনও ফোন নম্বর থাকলে আমাকে দিয়ে যান। খোঁজ পেলে জানাব।'

লক্ষ করলাম কথা বলার পুরো সময়টাতেই ম্যানেজার ঠায় দাঁড়িয়ে। বুঝলাম কর্মচারীরা মন্ময় চৌধুরীকে খুব সমীহ করে। ভাবুক ধরনের এই মানুষটাকে এরা এত ভয় পায় কেন কে জানে?

পাঁচ

পরদিন কোর্টে বাবার হেয়ারিং ছিল। সাবজজ-১-এর কোর্টে তাঁর কেস। বিশ-পঁচিশটা ফৌজদারী মামলার শুনানি হবে। কার কেস কখন উঠবে আগে থেকে বলার উপায় নেই। অফিস সকাল ন'টায় শুরু হলেও জজসাহেব এগারোটার আগে এজলাসে ওঠেন না। কেসের শুনানি চলে একটানা বিকেল চারটে অবধি। এর ভেতর লাঞ্চ ব্রেক, নামাজের ওয়াক্ত এসব আছে। সকাল ন'টার ভেতরই জেল থেকে প্রিজন ভ্যান সব আসামী এনে পুলিশেরা কোর্ট হাজতে রাখে। দশ টাকা বিশ টাকা দিলে হাজতীকে জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়াতে দেয় তারা। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা হয়। দর্শনার্থীদের ভেতর গ্রামের বৌঝিরাই বেশি। কোলে কাঁখে দুতিনটা ছেলেমেয়ে। সিকনি গড়িয়ে পড়ছে বাচ্চাগুলোর নাক দিয়ে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে এর খানিকটা গালেও মেখেছে তারা। শুকিয়ে চড়চড় করছে গাল। সবকটার পা খালি। এদের মায়েদের স্পঞ্জের স্যাণ্ডেলপরা ধুলোভরা পা দেখে এত মন খারাপ হয়! একটা ছোট ছেলে তার হাজতি বাবাকে বলছে, 'আব্বা, আমাকে একটা পাঁউরুটি কিনে দেন না।'

শহরের মানুষের কাছে পাঁউরুটি কিছু না। গ্রামের মানুষের কাছে ওটা স্বপ্নের খাবার। আমাদের গাঁয়ের একটি খুব বুড়ো লোককে চিনতাম। অনেক দিন থেকেই রোগে ভুগছিল। মরণ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বা, কী

খেতে মন চায়?'

'আমাকে একটা পাঁউরুটি খাওয়াতি পারবি?' জবাব দিলেন বাবা।

গ্রাম থেকে রেল স্টেশন সাতাশ মাইল দূরে। পাঁউরুটি পাওয়া যায় শুধু সেখানেই। পায়ে হেঁটে একজন রওনা হলো পাঁউরুটি আনতে। পরদিন বাসি পাঁউরুটি এসে যখন পৌঁছাল বুড়ো তখন পরপারে। একটা পাঁউরুটির দাম ষাট পয়সা। বাবার চোখ ছলছল করছে। তার কাছে এক টাকাও নেই।

আগেই বলেছি কার কেস কখন উঠবে বলা যায় না। এ হচ্ছে 'শেষ পুরোহিত কঙ্কালের পাশাখেলা'। সাক্ষী-সাবুদ, আসামী সব বসে আছে সকাল থেকে। উকিলরা দুতিনটা কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করছে। আরিচা ঘাটে ফেরি-ধরা টেনশন। কোর্টে কেস উঠল। সত্য-মিথ্যা সব সাক্ষী রেডি। আসামী হাজির। জজসাহেব অপেক্ষা করছেন। উকিলের দেখা নেই। কিছুক্ষণ দেখে জজসাহেব সে কেস বাদ দিয়ে আর একটি ধরলেন। নেক্সট হেয়ারিং ডেট তিন সপ্তাহ পরও পড়তে পারে, দু মাস পরও পড়তে পারে। আসামী আবারও প্রিজন ভ্যানে। গন্তব্য কারার ওই লৌহ কপাট। কার গোয়ালে কে দেয় ধুঁয়ো। বাবার কেস ওঠা নিয়ে রাশিয়ান রুলেত খেলা চলে না। পেশকারকে দুশো টাকা দিয়েছি। প্রথমেই যাতে বাবার কেসটা জজসাহেবের হাতে ধরিয়ে দেয় সে। হেয়ারিং হলে আরও পঞ্চাশ। উকিলকে ধরে এনে বসিয়ে রেখেছি। তিনজন সাক্ষীকে একশ' টাকা করে দিতে হয়েছে। ভাল হোটেলে গোস্ত-পরোটা খেয়েছে সকালে। কোর্টে এসে চা পান সিগারেট। মুহুরীকে বিশ টাকা দিয়ে হাজিরা জমা করে বসে আছি। ওপারের ডাক যদি আসে। দুহাত বুকের সামনে

জড় করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বাবা। হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবী। ক্ষুদিরামের খালু। তাকিয়ে আছেন জানালার বাইরে ড্রেনের ধারে কচুগাছের দিকে। মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে! পয়সাঅলা মানুষদের চেহারায় যে তেলতেলে ভাব থাকে তার ছিটে-ফোঁটাও এখন নেই তাঁর ভেতর। উকিল একবার উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ধন বাবু (বাবার নাম ধনঞ্জয়) ভাল তো?'

বাবা পাত্তাও দিলেন না। তাঁর চোখে সক্রেটিসের উদাসীনতা। পাথরের বাটিতে কখন হেমলক পরিবেশন করা হবে তার অপেক্ষা।

বাবার কেস উঠল ঠিকই, তবে হেয়ারিং হলো না। মোটা মোসলেম আসেনি। জাগ দলের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় গেছে। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত। তার উকিল টাইম প্রেয়ার দিয়েছে। পরের হেয়ারিং ডেট পড়ল তিন সপ্তাহ পর। ছোট্ট টিফিন ক্যারিয়ারে বাবার জন্যে ইলিশ মাছ ভাজি, লাউ দিয়ে রান্না মাষ কলাইয়ের ডাল পাঠিয়েছিলেন মা। এক জেল পুলিশকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বললাম টিফিন ক্যারিয়ারটা বাবাকে দিতে। পুলিশ বলল, 'জেলে গিয়া দিমুআনে।' শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা পুলিশ আজও পেলাম না।

পরদিন দুপ'রে খেয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিছানায় শুয়েছি। বাইরে শুরু হলো বৃষ্টি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মা ঘুম ভাঙিয়ে বললেন অমিয় জুয়েলার্স থেকে ফোন এসেছে। চৌধুরী সাহেব সন্ধের সময় দোকানে দেখা করতে বললেন। বুড়ির বাসার ঠিকানা পাওয়া গেছে।

ছয়

রিকশা করে আমাকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন চৌধুরী বাবু। কালীঘাট এলাকায় আগে কখনও আসিনি আমি। সরু রাস্তার দুপাশে পুরনো সব টিনের বাড়ি। অনেকেই ধুনুচি জ্বালিয়ে সন্ধ্যা আরতি দিয়েছে। বাতাসে ধূপধুনোর গন্ধ ম ম করছে। সরু গলির মাথায় ছোট ছোট ইটে গাঁথা আদ্যিকালের বাড়ি। পলেস্তারা খসে ইট বের হয়ে সেই ইট পর্যন্ত ক্ষয়ে গেছে। চারদিকে ভাঙা-চোরা ইটের স্তূপ। মানগাছ কচুগাছের ঝোপ। এর মাঝে দুখানা মাত্র ঘর কোনওরকম টিকে আছে। ছোট জানালায় চটের পর্দা ঝুলছে। ভেতরে কুপি জ্বলছে বলে মনে হলো। এ বাড়িতে কারেন্টের কারবার নেই। সামনেই সরু কাঠের দরজা। বারান্দা-সিঁড়ি এসবের কোনও বালাই নেই। কোনও কালে হয়তো ছিল। ঢোকার সরু দরজাটা পুরনো ভাঙাচোরা হলেও এর জটিল নক্সা দেখে বোঝা যায়, একসময় কত সুন্দর ছিল ওটা। দরজার ওপরে শেকল, মাঝে দুটো কড়া। খুব জোরে কড়া নাড়লেন চৌধুরী বাবু। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা বুড়োরা কানে কম শোনে। প্রায় সাথেসাথেই মাঝ বয়েসী শ্যামলা এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন। পরনে ধূতি-পাঞ্জাবী, গলায় কাঠের মালা। কামানো মাথার পেছনে ছোট একটা টিকি ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায় মন্দিরের পুরুত ঠাকুর। ভদ্রলোক বের হচ্ছিলেন বোধহয়।

'আজ্ঞে, আপনারা?' কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন

পুরুত।

'আমার নাম মৃন্ময় চৌধুরী। অমিয় জুয়েলার্স থেকে আসছি। আমরা কাদম্বিনী দেবীর কাছে এসেছি।'

'আমি ওঁর নাতজামাই। তোমার শরীরটা খারাপ। কী দরকার জানা যাবে?'

'উনি কিছু টাকা পাবেন। দেয়ার জন্যে এসেছি,' বললাম আমি।

'আপনারা বসেন। দেখি কী করা যায়।'

ঘরের মেঝে স্যাঁতসেঁতে। নোনাধরা দেয়াল। পায়া ভাঙা শালকাঠের চকির ওপর পাটি বিছানো। পুরু ধুলো জমে আছে ওপরে। কড়ি-বর্গা দেয়া ছাদ থেকে আগের আমলের শেকলে বাঁধা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। ঝুলকালিতে দেখতে হয়েছে কাকের বাসা। বুড়ি ওটাকে এতদিন বেচে দেয়নি কেন? যেভাবে লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা তাতে নামানোর পারিশ্রমিক বিক্রীত মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। ঝাড় লণ্ঠন বিলুপ্ত না হওয়ার পেছনে ওটাই প্রধান কারণ।

'ঠাম্মা বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। উনি উঠে আসতে পারবেন না। আপনাকেই ওঁর কাছে যেতে হবে।' ফিরে এসে বলল পুরুত।

পুরুতের পেছন পেছন যে কামরায় এসে ঢুকলাম সেবা প্রকাশনীর বইয়ের ভাষায় সেখানে দারিদ্র্য 'মুখ ব্যাদান' করে আছে। বিমূর্ত দারিদ্র্য এখানে মূর্ত। পভার্টি ইজ আ কার্স। অভিশাপ নয়, এখানে পভার্টির গজব নাজিল হয়েছে। জরাজীর্ণ ছোট এক খাটের ওপর চাঁদি ছিলা জাজিম। তুলো নারকোলের ছোবড়া এত কালো হয়ে বেরিয়ে পড়েছে যে ওগুলো তেলতেলে

হয়ে গেছে। জাজিমের ওপর আঁশ-ছেঁড়া শীতলপাটিতে শুয়ে আছে ফ্রানৎজ কাফকার 'দ্য হাঙ্গার আর্টিস্ট'। স্রেফ হাড়ের ওপর কোঁচকানো চামড়ার জীবন্ত বিভীষিকা। বুড়ির বয়সের গাছ-পাথর নেই। টি এস এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড' কবিতার দ্য সিভিল অভ ক্যুমা। ঘরের সিলিঙের নীচে পলিথিন টাঙানো। বৃষ্টি হলে ছাদ থেকে মনে হয় পানি পড়ে। দেয়ালের এককোণ ভেঙে ইট গেঁথে ড্রেনের মত করা হয়েছে। বুড়ির বাথরুম। সেখানে এক বালতি পানিতে লাল রঙের প্লাস্টিকের মগ ভাসছে। খাটের পাশে চিলুঞ্চি। কফ থুথু চিলুঞ্চির ভেতরে যত, বাইরে তার শতগুণ। ঢাকা শহরের ডি আই টি ডাস্টবিন। মনে হলো ঘরের ভেতরে ভেসে আছে 'অনাদি কালের বিরহ বেদনা'। নাকে এসে লাগল গা গুলিয়ে ওঠা তীব্র আঁশটে গন্ধ। হাতল ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসলেন মন্ময় চৌধুরী। চেয়ার একটাই। পুরুত ঠাকুর বুড়ির মাজার কাছে বিছানায় বসেছে। আমি দাঁড়িয়ে।

'ঠাম্মা উনার নাম মন্ময় চৌধুরী। আপনার সাথে আলাপ করতে চান।' শুরু করল পুরুত।

ছানিপড়া চোখ তুলে মন্ময় চৌধুরীর দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। কিছু দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। পকেট থেকে বালাদুটো বের করে বুড়ির দিকে এগিয়ে দিলেন মন্ময়। বললেন, 'দেখুন তো এগুলো চিনতে পারেন কি না?'

বালা হাতে নিয়ে ছুঁয়ে দেখল বুড়ি। তারপর রিনরিনে অথচ স্পষ্ট করে বলল, 'চিনতে পেরেছি, বাবা। সারা জীবন ওগুলো নাড়াচাড়া করেছি। এর প্রতিটি ঘাট আমার মুখস্থ।'

'ওগুলো কে দিয়েছিল আপনাকে?'

'কেউ দেয়নি। মায়ের কাছে ছিল। মা মারা যাওয়ার আগে দিয়ে গেছেন। মায়ের দেয়া জিনিস শত কষ্টের ভেতরও বাঁচিয়ে

রেখেছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো কোথায়?'

'আপনার মা ওগুলো পেলেন কোথায় সে ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'আমার বাবা তাঁকে দিয়েছিলেন। সে অনেক কাল আগের কথা, বাবা। তখন এই শহরে অনেক সাহেব ব্যবসায়ী ছিল। এদের একজনের সাথে বাবার খাতির ছিল খুব। এই খুলনা শহরের নাম ছিল রেয়ালে বাদরপুর। রূপসা নদীর ধারে অনেককাল আগের একটা মন্দির আছে। ওটা খুল্লনা দেবীর। ওঁর নাম থেকেই এই এলাকার নাম খুলনা। বাবা ওই মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। পরে এই বাড়িতে চলে আসেন। এই বাড়িটা আগে থেকেই ছিল। এর মালিক ছিল নানাভাই ধূনজী। কলকাতার ব্যবসায়ী। বিখ্যাত ধনী। আমার জন্ম এ বাড়িতেই। তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল। মন্দিরে বাবা আর ফিরে যাননি। বাকি জীবন তন্ত্র সাধনা করে কাটিয়েছেন। ওই সাহেব প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। দক্ষিণে আলাদা একটা ঘর ছিল। আমরা বলতাম কালী মন্দির। বাবার সাথে ওখানেই দেখা করতেন সাহেব।'

'সাহেবের নামটা বলতে পারবেন?' বুড়িকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মন্ময়।

আসল প্রশ্নের উত্তরের ধারে কাছেও বুড়ি এখনও আসেনি। হাজার এক রজনী গল্পের ভূমিকা এঁকে দিয়ে লেখালে ভাল হত।

'উনাকে সবাই ঠাকরে সাহেব বলে ডাকত। লাল টকটকে চেহারা। সারা গায়ে ভালুকের মত লোম। খুব শক্তিমান পুরুষ। দেখলে ভয় হত। এবাড়িতে আসার কিছুদিন আগে বাবার ক্যাশ বাক্সের ভেতর মা ওদুটো দেখতে পান। ভীষণ অবাক হন ওগুলো দেখে। সোনার বালা নিজের কাছে কেন রাখবেন বাবা? গহনা

আগলে বসে আছে এজাতীয় পুরুষ বিরল। বাবা ওই গোত্রের লোক ছিলেন না মোটেও। এ ছাড়া মা'র এও মনে হলো ওগুলো আগে কোথাও দেখেছেন। আগের দিনে অনেকেই মূল্যবান জিনিস সোনাদানা টাকা পয়সা মন্দিরে জমা রাখত। কেউ কেউ প্রতিমাকে অনেক কিছু দানও করত। মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের জোড় মূর্তির পেছনে ছোট্ট একটা ঘরে ওগুলো জমা করে রাখা হত। বছরে একবার বের করে হিসেব মেলানো হত, ঝাড়পোঁছ করা হত। এসব কাজে মাকে সাহায্যও করতে হয়েছে। সে সময়ই বালাগুলো দেখেন। বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন মা। বাবা বলেছিলেন কয়েকদিনের জন্যে বালাগুলো নিজের কাছে রেখেছেন। বিশেষ দরকার। পরে ফিরিয়ে দেবেন। ফিরিয়ে আর দেননি। আষাঢ় মাসে অমাবস্যার একরাতে কালী মন্দিরে সাধনায় বসেন। রাতে তাঁর কাছে মন্দিরে যাওয়া মানা ছিল। সকালে মা গিয়ে দেখেন বাবা মরে পড়ে আছেন। সবার ধারণা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়েছিলেন বাবা, কিন্তু মা বলতেন অপঘাতে মৃত্যু হয় তাঁর।'

'নান্নাভাই ধূনজীর সাথে কখনও দেখা হয়েছে আপনার?'

'ঠাকরে সাহেবের সাথে দুএকবার এখানে এসেছিলেন। বাবার সাথে মন্দিরে দেখা করতেন। লম্বা চুলদাড়িঅলা খুব মোটা লোক। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ।'

'আলাপ করে অনেক ভাল লাগল। আশা করি শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠবেন।'

'আমার আর ভালমন্দ, বাবা। ভগবানের ডাক আসলে বাঁচি। যে অবস্থায় আছি তা মরারও অধম।'

আমি এগিয়ে গিয়ে বুড়ির একটি হাত ধরলাম। তাকে দুহাজার টাকা দিলাম। বুড়ি জিজ্ঞেস করল, 'টাকা কীসের জন্যে,

বাবা?'

'আপনার ওই বালাদুটো যার সাথে এতক্ষণ কথা বললেন তিনি কিনে নিয়েছেন। আমার বাবার কাছে ওগুলো বন্ধক রেখেছিলেন মনে আছে? পুরো টাকাটা তো নেননি তখন। এখন কিছু রাখেন।'

বুড়ি খুশি হলো কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে নাতজামাই যে খুশি হয়েছে সেটা বোঝা গেল। ফেরার সময় চৌধুরী এবং আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল। বলল, 'দরকার হলে আবারও আসবেন। আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়।

সাত

বুড়ির বাসা থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে দুজনে বড় রাস্তায় এলাম। গুমগুম করে মেঘ ডাকছে। হিলহিলে ঠাণ্ডা বাতাস। যে কোন সময় ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে। মন্ময় বাবু কোথায় থাকেন জানি না। এখান থেকেই আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। উনি আবারও রিকশা করে বাসায় পৌঁছে দেবেন ভাবাই অন্যায়। বললাম, 'বাবু, আমাকে একটু নিউমার্কেটের দিকে যেতে হবে। তবে আর একবার আপনার সাথে দেখা করতে চাই। আপনার সময় হবে তো?'

'সময় করে একদিন আসেন। এ হপ্তা ব্যস্ত আছি। আগামী শনিবার আসতে পারেন। ফোন করে আসলে ভাল হয়।

দোকানের ফোন নম্বর আছে না আপনার কাছে?'

'আজ্ঞে আছে। দোকান থেকে যে রশিদ দিয়েছিলেন। তার ওপর লেখা আছে।'

'গুড। দেখা হবে, কেমন?'

অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন মন্ময়। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা কচুড়ির অর্ডার দিলাম। রেস্টুরেন্টের নাম ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। ঢুকতেই বাঁ হাতে ভাঁটের আগুনে বাবলার খড়ি পুড়ছে। গাঁট পোড়ার পটপট শব্দ পেলাম। এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের প্রকাণ্ড তাওয়ায় মোগলাই পরোটা, নরমাল পরোটা, কিমা পুরি ভাজা হচ্ছে। পাশে কেরোসিনের পাম্প কুকারে কড়াইয়ের ডোবা তেলে কচুড়ি, সিঙাড়া, ডালপুরি, রেগুলার পুরি ফুটছে। এগুলোর সাথে ফ্রি আমড়া জলপাইয়ের চাটনি। ঘন দুধের ধোঁয়া ওঠা চা। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। রেস্টুরেন্টের টিনের চালে ঝমঝমাঝম। চমৎকার পরিবেশ। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। বৃষ্টি ধরে এল দুঘণ্টা পর। এর মধ্যে কচুড়ি, সিঙাড়া, পুরি, দুই খুরি চাটনি, তিন কাপ চা, তিনটা ৫৫৫ সিগারেট শেষ করেছি। বাসায় ফিরতে হবে। মা দুশ্চিন্তা করবে। শেখ মুজিব হত্যার পর হিন্দুরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে। আসল অবস্থা সেরকম না মোটেও। বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘই খাচ্ছে বেশি। মাইনরিটি সারাজীবনই নিজেদের অনিরাপদ ভাবে।

আট

ছ'দিন বাদে ফোন করলাম মন্ময় চৌধুরীকে। পরদিন শনিবার। বিকেলের দিকে দোকানে যেতে বললেন। দোকানে গিয়ে দেখি কাউণ্টারে বুড়ো ম্যানেজার বসে আছে আমাকে বাবুর ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। পুরো দোকান খালি। শনিবার আধবেলা, রবিবার পুরোদিন ছুটি। অফিসে বসে আছেন মন্ময়। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন বালাদুটোর দিকে। আমাকে ইশারায় বসতে বললেন। ম্যানেজারকে বললেন চলে যেতে। শুরু করলেন মন্ময় বাবু:

'সঞ্জয় বাবু, কোনও প্রশ্ন করবেন না। শুধু শুনে যান। আশা করি আপনার সব কৌতূহল মিটে যাবে। এই বালাদুটো অনেকদিন আগেকার। লক্ষ্মণ সেনের আমলের। সেনেরা দক্ষিণ ভারতের লোক জানেন তো? তারা ছিল গোঁড়া হিন্দু। ওরা বাংলাদেশে আসার আগে এই দেশ শাসন করত পালেরা। তখন এখানকার বেশিরভাগ লোকই ছিল বৌদ্ধ। হিন্দুদের ভেতরও জাতপাত তেমন ছিল না বললেই চলে। থাকলেও তেমনভাবে কেউ মানত না। সেনেরা এসে সবকিছু পাল্টে দিল। বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হলো বৌদ্ধ নিপীড়ন। পরে বখ্‌তিয়ার খল্‌জির আমলে এই বৌদ্ধরাই দলে দলে মুসলমান হয়। এই জন্যেই হিন্দুরা বাঙালি মুসলমানদের বলে নেড়ের জাত। বৌদ্ধরা মাথাটাতা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে থাকত বলেই এই বিশেষণ। সেনেরা বাঙালিদের বিদেশে যাওয়াও বন্ধ

করে দেয়। ব্রাহ্মণেরা ঘোষণা করে কোনও বাঙালি বিদেশে গেলে জাতিচ্যুত হবে। বাঙালি জাতি কুয়োর ব্যাঙ হয়ে ঘরে বসে থাকল। দিনদুনিয়ার খবর আর রইল না কিছু তার কাছে।

'লক্ষণ সেনের ঝোঁক ছিল তান্ত্রিকতার দিকে। লক্ষ্মী নারায়ণ নামের এক কাপালিক ছিল তার গুরু। এই বালাদুটোর মুখগুলো দেখেন। দুটো ছাগীর মুখ। অথচ সাধারণ বালাতে ব্যবহার হয় হাতি অথবা মাছের মুখ। মুখগুলোতে প্যাঁচ লাগানো। দুআঙুলে ধরে ঘোরালেই খোলে। আমি খুলেছি ওগুলো। ভেতরে সাদা সিল্কের ওপর ব্রাহ্মি লিপিতে হাকিনী বশীকরণ মন্ত্র লেখা। তন্ত্রসাধনায় বসলে সাধকের আসনের চারপাশে যে নক্সা আঁকতে হবে সেটাও দেয়া আছে এখানে। এগুলোকে ইংরেজিতে বলে অ্যামুলেট। নক্সার ভেতরের ঘরগুলোর একটাতে লেখা 'নাদেস সুরাদেস ম্যানিনার'। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ভাষা। এ মন্ত্রও ভারতীয় নয়। এটা ব্যাবিলনীয়। প্রথম খ্রিস্টধর্ম এরপর ইসলামের যখন প্রসার হলো সেই সময় অনেক প্রেতসাধক ইরাক এবং সিরিয়া থেকে ভারতে চলে আসে। তন্ত্রমন্ত্র এখানে সারা জীবনই আছে। নরবলি শবসাধনা এসব কাজে কোনও বাধা নিষেধ নেই। লাকুম দ্বীনুকুম। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। ব্যাবিলনে তান্ত্রিকেরা বেড়ে উঠেছিল রাজানাকূল্য পেয়ে। ভারতেও সেটা পেতে তাদের খুব বেশি অসুবিধা হয়নি।

'বখ্‌তিয়ার খল্‌জি বাংলা দখল করে নিলে লক্ষণ সেন পালিয়ে গেল পূর্ব বাংলার রাজধানী বিক্রমপুরে। সাথে লক্ষ্মী নারায়ণ। মনে প্রতিহিংসার আগুন। হারানো রাজ্য কীভাবে ফিরে পাবে রাতদিন সেই ভাবনা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বখ্‌তিয়ার আর তার মুসলমান সৈন্যরা এক মূর্তিমান বিভীষিকা। চিন্তা বাড়ে তার সাথে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে হতাশা। বাঙালি সেনদের দুঃশাসনে

নিষ্পেষিত। গণ সমর্থন দুরাশা। লোকবল অর্থবল মনোবল কোনটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রান্তিকালে এগিয়ে এল কাপালিক লক্ষ্মী নারায়ণ। বখ্‌তিয়ার বিনাশ হবে হাকিনীর হাতে। জ্বরাসুরের বিকট মূর্তির সামনে জোড়া মোষ বলি হলো। লক্ষ্মী নারায়ণের ইচ্ছে ছিল কুমারী উৎসর্গ করার। লক্ষণ রাজি হননি। দেশের অবস্থা ভাল না। কুমারী অকুমারী বিবাহিতা সবারই বাবা মা থাকে। এ নিয়ে ভ্যাজাল হলে বিক্রমপুর ছেড়ে বার্মায় গিয়ে উঠতে হবে। পুবে এখন শুধু ওই রাজ্যই নিরাপদ। বখ্‌তিয়ারের এখতিয়ার মগের মুল্লুকে নেই। আয়োজন সম্পন্ন হলো বটে তবে সমস্যা একটা রয়েই গেল। শবসাধনা করে হাকিনী ডেকে এনে বখ্‌তিয়ার বধ্ করতে হলে বখ্‌তিয়ারের কাছাকাছি থাকতে হবে। হাকিনীর কাছে রামও যা রাবণও তাই। সে থাকে চির অন্ধকারের রাজ্যে। বখ্‌তিয়ারকে হাকিনী চেনে না। তাকে চিনিয়ে দিতে হবে। লক্ষণ সেন পালিয়ে আসার সময় সে ছিল নদীয়ায়। এখন কোথায় আছে কে জানে? মুসলমান যোদ্ধারা নাকি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেই না। খাওয়া ঘুম নামাজ সব ওখানেই। বখ্‌তিয়ার ঘোড়ার পিঠেই থাকে দিনের অর্ধেক সময়। ভেবে চিন্তে এক বুদ্ধি বের করল লক্ষ্মী নারায়ণ। তার দুজন শাগরেদকে পাঠাল এই কাজে। শুরু হলো মিশন বখ্‌তিয়ার।

'বাসমতি চাল পুড়িয়ে বানানো কয়লার সাথে ঘোড়ার রক্ত আর গর্ভবতী নারীর প্রস্রাব মিশিয়ে তৈরি কালিতে সাদা সিল্কের ওপর হাকিনী জাগানো মন্ত্র লিখে কাপড়টা দুটুকরো করে লক্ষ্মী। এই দুটো বালার ভেতর টুকরোদুটো ভরে শাগরেদ দুজনের হাতে একটা করে পরিয়ে দেয়। দুই শাগরেদ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নদীয়ায় এসে জানতে পারে বখ্‌তিয়ার রংপুর অভিযানে। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে রংপুর রওনা হলো তারা। দুদিন পর পদ্মা পার হয়ে

বরেন্দ্র বা রাজশাহী পৌঁছাল। তখন চৈত্র মাস। রাজশাহীতে কলেরা বসন্তে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হচ্ছে। কলেরার মহামারী চলছে এমন এক গ্রামে সন্ধের মুখোমুখি ঢুকল দুজনে। দেখতে পেল তিন রাস্তার মাথায় ফাঁকা উঁচু ঢিবির মত হাট বসার জায়গা। এর পাশেই প্রকাণ্ড বটগাছতলায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে ওলাওঠা দেবীর পুজো হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ পরপরই কাঁচা বাঁশের খাটিয়ায় বলহরি হরিবল করতে করতে শ্মশানে যাচ্ছে লাশ। শুম্ভ নিশুম্ভ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। মহামারী লেগেছে এমন গ্রামে পানি পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। অথচ শাগরেদদের অবস্থা এত খারাপ যে কিছু না খেলে কলেরা বসন্তে নাও যদি মরে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবশ্যই মারা যাবে। হাটের কাছে এক ময়রার দোকান দেখতে পায় তারা। সেখানে দই চিড়ে খাগড়াই খেয়ে প্রাণ বাঁচাল। শুয়ে পড়ল বটতলায়। শেষরাতে নিশুম্ভের পেট নেমে গেল। এশিয়াটিক কলেরা বড় মারাত্মক ছিল। কাউকে ধরলে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে যমালয়ে পাঠিয়ে দিত। পরদিন বিকেলে নিশুম্ভ ওলাওঠা দেবীর পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকল।

'বালাটা আস্তে করে তার হাত থেকে খুলে নিয়ে বিদেয় হলো শুম্ভ। রংপুরের রাস্তা ধরল। অন্তত তার কাছে তাই-ই মনে হলো। অন্ধকারে সারারাত হেঁটে সকালে যেখানে পৌঁছাল সে জায়গার চেয়ে কলেরা গ্রাম অনেক ভাল ছিল। ছোট এ গ্রামটির প্রায় সবাই ফাঁসুড়ে ডাকাত। বাইরে থেকে দেখে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। দ্বারা-পরিবার নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসার করছে সবাই। সম্পন্ন গৃহস্থ। কিন্তু ভেতরে ভিন্ন চিত্র। নিরীহ শ্রান্ত পথিকদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়িতে এনে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলাই এদের কাজ। এমনই এক ডাকাত ফ্যামিলির পাল্লায় পড়ে সে। দুদিন পর ডাকাতদের হাতে প্রাণ হারাল শুম্ভ। তবে মারা যাওয়ার

আগে সব ঘটনা লিখে রেখে যায় সে। একাজে মন্ত্রলেখা সিল্কের কাপড়টিই ব্যবহার করে। আমি ধারণা করছি বালাদুটো ডাকাত তার স্ত্রী অথবা মেয়েকে দিয়েছিল। বাঙালি মায়েরা তাদের গয়না দিয়ে যান মেয়েকে বা ছেলের বৌকে। বংশ পরম্পরায় একই গহনা হাতবদল হয়। পুরনো গয়না ভেঙে নতুন গয়না বানানোর চল এখন যেমন আছে আগে তেমন ছিল না। ওতে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি পড়ত।

'সুলতানী আমলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে আট রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্প হয়েছিল। ব্যাপক ভূমি ধসে তলিয়ে যায় অসংখ্য গ্রাম গঞ্জ নগরী। গৃহহীন হয়ে পড়ে লাখ লাখ লোক। এদের অনেকেই তখন দক্ষিণাঞ্চলে মাইগ্রেট করে। সম্ভবত সেইসময়ই এগুলোর তৎকালীন মালিক এই এলাকায় চলে আসে। পরে এখানে বর্গীদের উৎপাত শুরু হলে বালাগুলো খুল্লনা দেবীর মন্দিরে রেখে দেয় সে বা তার উত্তর পুরুষ। পরে আর ফিরিয়ে নিতে পারেনি।

'ব্রিটিশ আমলে খুলনায় ম্যাকপিস থ্যাকারে নামের এক ইংরেজ সাহেবের দোকান ছিল। স্যাবর অ্যাণ্ড ড্র্যাগুন নামের এই দোকানটির ব্রাঞ্চ ছিল কলকাতাতেও। মূল দোকান লণ্ডনে। এই দোকানে ভাল ভাল সব অ্যান্টিক বিক্রি হত। এই থ্যাকারে সাহেবকেই লোকেরা ডাকত ঠাকরে সাহেব বলে। থ্যাকারে জানতে পারে খুল্লনা দেবীর মন্দির অনেক পুরনো। প্রচুর অ্যান্টিক লুকানো আছে ওখানে। বুড়ির বাবার সাথে খাতির জমিয়ে অনেক জিনিস হাতিয়ে নেয় সে। অ্যান্টিক কেনার মত লোক খুলনায় কেউই ছিল না। থ্যাকারের দোকানটি ছিল আসলে অ্যান্টিক কালেকশনের একটি আউটপোস্ট মাত্র। দালালেরা সরাসরি দোকানে যেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করা আর্টিফ্যাক্ট সাহেবের কাছে বিক্রি করত। যা হোক, বালাগুলো সাহেবের হাতে

পড়লে সে বুঝে ফেলে ওগুলোর মুখ খোলা যায়। মুখ খুলে একটি বালার ভেতর পায় মন্ত্রতন্ত্র লেখা সিল্ক অন্যটিতে শুম্ভের লেখা কাহিনি। ধারণা করছি কাদম্বিনী দেবীর বাবাকে ওগুলো দেখায় সে। জানতে চায় কী লেখা আছে।

'নানা ভাই ধূনজীর ছিল ফিটন গাড়ি, পালকি, তাঞ্জাম এসব তৈরির কারখানা। কোম্পানি আমল থেকেই লাট সাহেবরা পালকির ভক্ত হয়ে পড়ে। এতবেশি ভক্ত হয় যে অর্ডিন্যান্স জারি করে, আমলারা ছাড়া ওগুলোতে কেউ চড়তে পারবে না। তবে ওই আইন কেউ মানেনি। আমলা-কামলা যে যেমন পারে দেদারসে পালকি ব্যবহার করত। এখন যেমন ট্যাক্সি কোম্পানি আছে কলকাতায় তেমন পালকি কোম্পানি ছিল। অসংখ্য বেহারা বেতন দিয়ে পুষত তারা। সবচেয়ে বড় পালকি কোম্পানির মালিকও ছিল আবার ধূনজীই। পাকা রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার পর ল্যাণ্ডো এবং ফিটন গাড়ির চাহিদা হয় ব্যাপক। ইংরেজ সাহেব উঠতি জমিদার স্থানীয় মহারাজারা ছিল ওগুলোর খদ্দের। থ্যাকারে ছিল নানাভাই ধূনজীর কমিশন এজেন্ট। ধূনজীর সাহায্যে অনেক অ্যান্টিকও কালেক্ট করত সে। দুজনে হয়ে ওঠে মানিকজোড়।

'অ্যান্টিক ডিলার হওয়ায় রহস্যময় সব ব্যাপারে থ্যাকারের আগ্রহ ছিল অসীম। সিল্কের টুকরোদুটো পাওয়ার পর তন্ত্রমন্ত্রে আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। কান টানলে মাথা আসে। ধূনজীও যোগ দিল এসে। ওদিকে মন্দির থেকে বহু জিনিস লোপাট করায় কাদম্বিনী দেবীর বাবার ওপর প্রধান সেবায়েতের সন্দেহ হয়। ওখান থেকে সরে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে সে। ধূনজী নবাবী আমলের বড় একটি বাড়ি খুলনায় আগেই কিনেছিল। এ অঞ্চলে ভাল কাঠ সস্তা ছিল। তার কলকাতার কারখানার কাঁচামাল এই বাড়ি থেকে নদীপথে চালান হত। ধূনজীকে বলে

বাড়িটা কাদম্বিনী দেবীর বাবাকে পাইয়ে দেয় থ্যাকারে। উদ্দেশ্য তাকে কাছাকাছি রাখা। আমার ধারণা হাকিনী বশীকরণ ছাড়াও আরও যেসব তন্ত্র বা পিশাচ সাধনা আছে সেগুলোও তারা করেছে। টাকা আর ক্ষমতা লাভই ছিল তাদের সাধনার মূল লক্ষ্য।'

অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন মন্ময়।

'কাদম্বিনী দেবীর কাছে এতদিন ওগুলো ছিল অথচ একদিনও উনি খুলে দেখলেন না? আপনিই বা বুঝলেন কী করে যে ওগুলো খোলা যায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বিখ্যাত স্বর্ণকারের নিখুঁত কাজ। আগে থেকে জানা না থাকলে বোঝার উপায় নেই। এ পর্যন্ত কলকাতা থেকে গয়নার যত ক্যাটালগ বেরিয়েছে তার সবগুলোই আছে আমার কালেকশনে। মজার ব্যাপার কী জানেন এর ভেতরে থ্যাকারে সাহেবের নিজের ছাপানো একটা ক্যাটালগও আছে। হাতে পাওয়ার পর ক্যাটালগ বের করে মিলিয়ে দেখেছি ছবির সাথে আসল বালাদুটো। সব আইটেমের বিস্তারিত বিবরণ আছে বইটিতে। ইতিহাস, শৈলী, মূল্য, প্রাপ্তিস্থান এইসব আরকী। ওগুলো যে সেন আমলের ডিজাইন সেটা থ্যাকারের বর্ণনা থেকেই পাওয়া। তবে এর পেছনের যে কাহিনি সেটা এর ভেতরের চিরকুট থেকে জেনেছি। বাকিটা নিজের হাইপোথেসিস। তবে সে সময়ের লেখা খুলনা গেজেটিয়ার এবং খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির ফাইলপত্র ঘেঁটেও অনেক তথ্য পেয়েছি।'

আমার মনে হলো মন্ময় সবটুকু আমাকে এখনও বলেননি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আগ্রহ কি শুধু ওগুলোর ইতিহাস জানার ব্যাপারেই সীমিত?'

মন্ময় আমার দিকে তাঁর ঘুমঘুম চোখ তুলে তাকালেন।

বললেন, 'না, হাকিনীর ব্যাপারটি আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। সবচেয়ে অদ্ভুত হলো হাকিনী জাগানোর যে সাধনা সেটার বৈশিষ্ট্য। এই হাকিনীরা খুব নিঁচু স্তরের পিশাচ। এদের বুদ্ধিবৃত্তি পশু শ্রেণীর। তবে ক্ষমতা প্রচণ্ড। এদেরকে ডেথ এঞ্জেল বলতে পারেন। ডেকে এনে যার মৃত্যু চান তাকে চিনিয়ে দেবেন। সেটারও প্রক্রিয়া আছে। তবে সমস্যা হলো এরা প্রাণ না নিয়ে ফিরবে না। যার জন্যে ডাকা তাকে মারতে না পারলে যে ডেকেছে তাকেই মেরে ফেলবে। হাকিনী জাগাতে হলে অশুচি যজ্ঞ করতে হয়। এই অশুচি যজ্ঞ হলো মৃতা কোনও যুবতীর সাথে যৌন সঙ্গম। যাকে পশ্চিমারা বলে নেক্রোফিলিয়। নেক্রোফিলিয় বহু প্রাচীন প্রথা। বার্মা এবং দক্ষিণ ভারতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। ছিল পুরাকালে মিশরে ও ব্যাবিলনে। বার্মা এবং দক্ষিণ ভারতে কোনও অবিবাহিত তরুণী মারা গেলে একজন পুরুষকে সেই শবের সাথে বিয়ে দেয়া হত। পুরুষটি তখন স্বামী হিসেবে যুবতীর লাশের সাথে সঙ্গম করত। মিশরের মমির কারিগরদের ভেতর এই নেশা ছিল প্রবল। এজন্যে যুবতী মেয়েদের লাশ তাদের বাবা বা স্বামীরা দুতিনদিন বাইরে ফেলে রেখে পচিয়ে এনে তারপর মমির কারিগরদের হাতে তুলে দিত। ইউরোপেও নেক্রোফিলিয়র চর্চা ছিল। এ নিয়ে বহু গল্প কাহিনি প্রচলিত আছে।'

'আপনি এতকিছু জানলেন কীভাবে? দেখতেই পাচ্ছি এর পেছনে সময় শ্রম দুটোই ব্যয় করেছেন প্রচুর। কিন্তু এতসব করে লাভ কী?'

'এই এক নেশা রে ভাই। আমার এক কাকা ছিলেন তান্ত্রিক ছেলেবেলা. তাঁর পিছে পিছে ঘুরতাম। রাজ্যের যত অদ্ভুত

জিনিসপত্রে কাকার ঘর ভর্তি ছিল। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি বিহারে যান। সেখানে এক দুর্গম এলাকায় মস্ত গুণিনের খোঁজ পান তিনি। এরপর নিজেই নিখোঁজ হন। আমার বয়স বাড়তে লাগল সেই সাথে পৌনঃপুনিকভাবে বাড়তে লাগল নেশাও। সোনার কারবার আমাদের তিনপুরুষের। প্রচুর বিষয় সম্পদ। ব্যবসা চলছে কঠিন এক সিস্টেমের ভেতরে। কিছু না দেখলেও ওটা ঠিকই চলবে। আমি সময় কাটাই ভারতের উপজাতীয় গোত্রগুলোর উপাস্য দেবদেবী, তন্ত্রমন্ত্র বিষয়ে পড়াশুনো করে। প্রকৃত তান্ত্রিক আজকাল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঠিক উপাচার সাজিয়ে নৈবেদ্য দিলে এগুলো আসলেই কাজ করে কি না জানা যেত।'

'আপনার তো এ ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা। এইসব মাম্বোজাম্বো আসলেই বিশ্বাস করেন?'

'দেখেন থিওরী এক জিনিস, প্র্যাকটিকাল আর এক। সব নিয়ম মেনে ট্রাই করলেই কেবল এর প্রায়োগিক ব্যাপারটি জানা যাবে।'

'হাকিনী জাগানো মন্ত্র, প্রক্রিয়া সব তো হাতের কাছেই আছে। এই বিষয়টি দিয়েই সেই পরীক্ষা হতে পারে।'

'সঞ্জয় বাবু, হাকিনী এক সর্বনাশা জিনিস। যদি সত্যিই তাকে জাগানো যায় তা হলে সে তো প্রাণ না নিয়ে ফিরবে না। এ হচ্ছে আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে খায় হায়েনা। পিশাচ সাধনা আর ঝুঁকি হলো পি'জ অ্যাণ্ড ক্যারট। হাকিনী সাধনায় যে সব উপাচার লাগে তা জোগাড় করা যাবে। তিথি নক্ষত্র দেখে যজ্ঞের কাল নির্ণয় করাও কঠিন না। কঠিন হলো শব সাধনার জন্যে যুবতী নারীর টাটকা লাশ জোগাড় করা। তারচেয়ে কঠিন ওই লাশের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া। ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছি

আমি। বের করার চেষ্টা করেছি এর বিকল্প। শয়তান হলো চূড়ান্ত অপবিত্র সত্তা। জুডিও-ক্রিশ্চান-ইসলামিক ট্রেডিশানে বলা হয়েছে আজাজিল আদম হাওয়ার পতন ঘটিয়েছিল তাদের যৌনতাকে পুঁজি করে। ইহুদী-খ্রিস্টান দু ধর্মেই যৌনমিলন একটি অপবিত্র বিষয়। ক্যাথলিক পাদ্রীদের জন্যে এই কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ধর্মগুলোতে বলা হয়েছে নিষিদ্ধ যৌনমিলন দেহ ও মনকে পুরোপুরি কলুষিত করে। একটা উদাহরণ দেই। ইসলাম বলে হযরত ইব্রাহিম তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মেরই আদি পিতা। ব্যাবিলনের বাদশা নমরুদ তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। বিশাল আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তাঁকে তুলে তার ভেতর ফেলতে গেল নমরুদের লোকেরা। দেখা গেল পয়গম্বর এত ভারি যে তাঁকে মাটি থেকে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপার কী জানার জন্যে নমরুদ তার পুরোহিত-গণকদের ডেকে পাঠাল। এরা যা বলল তা এই রকম। খোদার ফেরেশতারা ইব্রাহিমকে ধরে আছে। একশো হাতি লাগিয়ে টানলেও তাঁকে মাটি থেকে উঠানো যাবে না। উপায় কী? ফেরেশতাদের তাড়াতে হবে। গণকেরা নমরুদকে বুদ্ধি দিল জায়গাটিকে অপবিত্র করার। নমরুদ তখন উপস্থিত জনতাকে প্রকাশ্যে অবাধ যৌনমিলনের নির্দেশ দিল। ঘটনাস্থল অপবিত্র হলো। পালাল ফেরেশতার দল। ইব্রাহিমকে নিক্ষেপ করা হলো আগুনে। যেসব মেয়ে ওই সব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল তারা নমরুদের কাছে পুরস্কার দাবি করে। সঙ্গমবাজ রতিক্লান্ত রমণীদের সহজে চেনার জন্যে তাদের কপালে টিপ দেয়া হয়। এজন্যে মুসলমান মেয়েদের কপালে টিপ দেয়ার ব্যাপারে কিছুটা নিষেধাজ্ঞা আজও আছে।'

'মন্ময় বাবু, আপনার পরিকল্পনাটা আসলে কী?'

'মন্ত্র-তন্ত্র পিশাচ সাধনা এসব বিষয়ে সঠিক সূত্র খুঁজে পাওয়া

খুব কঠিন। শবসাধনার কথাই ধরি। প্রায় সব বর্ণনায় আছে ডোম চাঁড়ালের কুমারী যার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে সেই রকম একটি উলঙ্গ লাশের ওপর অমাবস্যার রাতে বসে সাধনা করতে হবে। লাশের বয়স তিনদিনের বেশি হওয়া চলবে না। ভেবে দেখেন, ডোম চাঁড়ালের মেয়েদের প্রায় সবারই বিয়ে হয় যখন তারা কিশোরী। তার ওপর তাকে মরতে হবে অপঘাতে। সবচেয়ে কঠিন শর্ত হলো এই মৃত্যুটাও হতে হবে অমাবস্যা রাতের কাছাকাছি সময়ে। সাতদিন আগে পিছেও যদি হয় তা হলেও সমস্যা। লাশে পচন ধরবে। ফরমালিন, বরফ, হিমঘর এইসব সামগ্রী কাপালিক, তান্ত্রিকদের কল্পনাতেও ছিল না। তবে এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস ঠিকমত সবকিছু করলে ফল ফলবে। এটা প্রামাণ্য দলিল। অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি। তবে প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। হাকিনী ডেকে এনে তাকে দিয়ে করবটা কী? আমি অজাত শত্রু। তবে আপনার কথা আলাদা। মোটা মোসলেমের ওপর আপনি যদি প্রতিশোধ নিতে চান তা হলে...'

'লাশের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিকল্পটির কথা কিন্তু এখনও বলেননি।'

'বলেছি। আপনি খেয়াল করেননি। আমাদের হয় কোনও জায়গা অশুচি করতে হবে। অথবা এমন জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেখানে শুচি বলে কিছু নেই। অশুচি অনেকভাবেই হতে পারে। তবে এরমধ্যে যৌন ব্যাপার মুখ্য হতে হবে।'

'পতিতালয় ছাড়া এমন জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ধারণা সঠিক। তবে আশপাশের এলাকায় করা যাবে না। লোকে চিনে ফেলবে। দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পদ্মার চরে নতুন পাড়া হয়েছে। জমজমাট ব্যবসা। পাড়ার মাঝখানে একটা কামরা ভাড়া নেয়া যেতে পারে। সাধনার সব উপাচার এখান থেকে রেডি

করে নিয়ে গেলে একরাতেই কাজ সারা সম্ভব। হাকিনী সাধনায় নক্ষত্র-তিথি কোনও বিষয়ই নয়। পূর্ণিমা ছাড়া যে কোনও রাতেই হতে পারে। তবে আষাঢ় মাসের দিকে হলে উত্তম। আপনি ভেবে দেখেন সাধনায় বসতে চান কি না। খরচপত্র ব্যবস্থা সব আমার দায়িত্ব।'

'মোটা মোসলেমকে চিনিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি কীভাবে হবে?'

'ওর একটা ফুল সাইজ ছবি আমাকে এনে দেন। তারপর কী করতে হবে বলে দেব।'

মোটা মোসলেমের ছবি জোগাড় হলো সহজেই। সাপ্তাহিক রূপসা সংবাদ-এর রিপোর্টার কমল কান্তি পাড়ার লোক। আমরা তাঁকে ডাকি ককা'দা বলে। ছবি তার বাসাতেই এক ফাইলে ছিল। এলাকারই এক ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী সভা। মোটা মোসলেম প্রধান অতিথি। বিজয়ীর হাতে কাপ তুলে দিচ্ছে। মুখে দেঁতো হাসি। বললাম দুদিনের ভেতর ছবি ফেরত দেব।

'ছবি নিয়ে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল ককা।

উত্তর আগেই রেডি করে রেখেছিলাম।

বললাম, 'দৌলতপুরে নন্দঘোষ মার্ডার কেসের কথা তো জানেন। বছর খানেক আগের ঘটনা। ভর দুপুরে মোকামে বসা অবস্থায় খুন হয় সে। খুনিদের সাথে মোটা মোসলেম ছিল। নন্দঘোষের কর্মচারীদের ছবিটা দেখাতে চাই আমি। যদি আইডেণ্টিফাই করতে পারে? বাবার উকিলই এ পরামর্শ দিয়েছে।'

'পারলেও মোসলেমের বিরুদ্ধে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেবে বলে মনে হয় না। শোনো সঞ্জয়, আমি কিন্তু এসবের ভেতরে নেই। তোমাকে ছবি দিয়েছি এটাও কাউকে বলতে পারবে না।

ক্রাইম রিপোর্ট আমি করি। পত্রিকার কাটতি বাড়ে। সম্পাদক পছন্দ করেন। তবে ওগুলো "রিকশাঅলা কর্তৃক মেথরানী ধর্ষিত" টাইপের হয়। বড়বড় চাঁইদের ঘাঁটাতে জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টাররাই সাহস পায় না! ককা কিছু লিখতে গেলে ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে অবস্থা হবে।'

ছবি মন্ময় চৌধুরীর হাতে পৌঁছে দিলাম। বললেন দুদিন পর বিকেল তিনটের দিকে তাঁর দোকানে যাওয়ার জন্যে। আরও জানালেন বাসায় যেন বলে আসি ফিরতে একদিন দেরি হবে।

নয়

পরদিন ইনস্যুলিন কিনে জেলে বাবার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর ডায়বেটিস আছে। রেগুলার ইনস্যুলিন নেন। বাবার ইনস্যুলিন শেষ। সকাল ন'টায় দরখাস্ত জমা দিয়ে জেলগেটে বসে আছি। চারদিকে পানের পিক, চুনের দাগ, কলার খোসা, বিড়ির মাথা, প্রস্রাবের ঝাঁঝাল গন্ধ। সাব ইন্সপেক্টরকে এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট, একশো টাকা দিয়েছি। দালাল নিয়েছে বিশ। বড় সাহেব এখনও আসেননি। অপেক্ষা করছি তো করছিই। এগারোটার দিকে তিনটা মোটর সাইকেলে পাঁচজন রাজনৈতিক কর্মী সঙ্গে নিয়ে মোটা মোসলেম এসে হাজির। সাব ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বিষয় কী? তার দুজন 'ছেলে' জেল হাজতে আছে। আজকেই বেইল হবে। অথচ তাদের জেল পুলিশ কোর্টে চালান করেনি। সাব ইন্সপেক্টর বলল, 'বড়ভাই, কোনও চিন্তা

করবেন না। দুজন কন্সটেবল দিয়ে এখনই রিকশা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বসেন চা খান। আমি কাগজপত্র রেডি করি। চালানে জেলার সাহেবের সই লাগবে। উনি এখনও অফিসে আসেন নাই। সেটা কোনও ব্যাপার না। সেপাইয়ের হাতে দিয়ে কাগজ পাঠাচ্ছি। সই নিয়ে আসবে। বাসা কাছেই। বেশিক্ষণ লাগবে না। এই হামিদ, ভাইয়ের জন্যে ডবল পাতি চা আন। দুধ চিনি বেশি। সাথে হুগলী বেকারীর কেক।'

আমাকে দালাল বলল, 'ভাই, কালকে আসেন। আজ দেরি হবে। ওপর থেকে চাপ আছে। সাহেব ব্যস্ত।'

রাগে আমার গা কাঁপতে লাগল।

দশ

পরদিন জেলে যেতে পারলাম না। মন্ময় চৌধুরীর সাথে দেখা করার কথা। গেলাম সেখানে। আমাকে বসতে বলে ড্রয়ার খুলে বেল কাঠে তৈরি ফুটখানেক লম্বা একটা মূর্তি বের করলেন বাবু। তাঁর কারিগর বানিয়েছে। হাতে নিয়ে দেখলাম ভেতরটা ফাঁপা। কিছুক্ষণ পর জিপে করে রওনা হলাম আমরা।

'আরও আগে বের হলে ভাল হত না?' গাড়ি ছাড়ার পর বললাম আমি।

'না, হত না। দিনের বেলা ওখানে যেতে চাই না আমি। সন্ধ্যা আটটা নাগাদ পৌঁছাব আমরা।'

ড্রাইভারকে গোয়ালন্দ বাজারে গাড়ি পার্ক করতে বললেন

মন্ময়। পাশেই বড়বড় গোডাউন। চিটেগুড়ের মিষ্টি গন্ধে আকাশ বাতাস সয়লাব। মালপত্র সমেত দুজন দুটো রিকশায় উঠলাম। দৌলতদিয়ার নিষিদ্ধ পল্লী এখান থেকে চার মাইল দূরে। মাঝ বয়সী রিকশাঅলা জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, আপনারা কোন্ জাগাত যাবেন?'

'দৌলতদিয়া,' বললাম আমি।

'দৌলতদিয়ার কুথায়? ফেরিঘাট, না মাগিপাড়া?'

'পাড়ায় চলো।'

'কুড়ি ট্যাকা ভাড়া দিবেন।'

'কুড়ি টাকাই পাবে, চলো।'

হেরিং বোণ্ড রাস্তা। ঝাঁকুনি প্রচণ্ড। রিকশার সিট ছোট। সামনের দিকে ঢালু। বসে থাকা দায়। একবার হুড ধরতে হচ্ছে। আরেকবার রিকশাঅলার সিট। চারদিক ফাঁকা। হুহু ঠাণ্ডা বাতাস। গুমগুম করে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি শুরু হলে ভিজে ন্যাতা হতে হবে। চর এলাকা। একটা গাছ পর্যন্ত কোথাও নেই। শুধু কাশবন। হঠাৎ পুরো ব্যাপারটিকেই মনে হলো এক অবাস্তব অলীক কল্পনা।

ঘণ্টা খানেক পর ভিজে পুড়ে যেখানে এসে পৌঁছালাম সে এক অন্য জগৎ। এখানে কারেন্ট নেই। দোকানে দোকানে হ্যাজাক বাতি। ঘরে ঘরে হারিকেন। অগুনতি ছোটবড় ঘর, গলি ঘুপচি। দোকানপাট ঘরবাড়ি বাঁশ চাটাই টিন দিয়ে বানানো। দেদার বিক্রি হচ্ছে পান সিগারেট ফুল বাংলা মদ। কালো কুচকুচে ইয়াবড় কড়াইয়ে ভাজা হচ্ছে পেঁয়াজু, ডালপুরি। ছোট মাইকে গান বাজছে: নিশিথে যাইয়ো ফুলবনে ও ভোমরা। অনেকগুলো ঘরে শুধু একদিকেই চাটাইয়ের বেড়া। মাটির উঁচু মেঝেতে বাঁশের

মাচা। সেজেগুজে খোলামেলা শাড়ি সালওয়ার কামিজ পরে বসে আছে সুবর্ণ কঙ্কন পরা স্বাস্থ্যবতী রমণীরা। খিলখিল হাসি। মাঝে মাঝে গানের কলি। আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন। তবে একটি জিনিস ভাল এদের। উগ্র সাজগোজ ঝ্যালঝেলে মেকাপের বালাই নেই।

বুড়ো একলোক আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল। সরু দরজা, দুদিকে দুটো কাঠের জানালা। মাটির মেঝে। ঘর পুরো খালি। মন্ময় চৌধুরী পাকা লোক। আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মন্ময় বুড়োকে দুশো টাকা দিয়ে কী যেন বললেন। কিছুক্ষণ পর লোকটা আমাদের মিশকালো দুটো মোরগ আর একটি কেরোসিনের স্টোভ দিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিলেন বাবু। ব্যাগ খুলে টুকিটাকি অনেক জিনিস বের করলেন। টকটকে লাল সিঁদুর দিয়ে উল্টো করে বড় একটা ত্রিভুজ আঁকলেন মেঝেতে। ওটার ওপর সোজা আর একটি ত্রিভুজ। দেখতে হলো ছয়কোনা তারা। তারাটাকে ঘিরে দিলেন আতপ চালের গুঁড়োয় আঁকা প্রকাণ্ড একটি বৃত্ত দিয়ে। ত্রিভুজের ভেতর ছয়টি কোণে সাপের কাটা লেজ, পেঁচার নখ, বাদুড়ের মাথা, ঘোড়ার খুর, শিশুর পাঁজরের হাড়, বানরের থাবা রাখলেন। বৃত্তচাপ এবং তারার পয়েন্টগুলো মিলে আরও ছয়টি কোণ তৈরি করেছে। এরপর এই কোণগুলোতে হালকা লাল রঙের কালি দিয়ে অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকলেন। নতুন একটা ধুতি বের করে আমাকে বললেন পরে নিতে। দুটো ত্রিভুজের মাঝখানে যে পেন্টাগ্রাম তৈরি হয়েছে ঠিক সেখানে মোরগদুটো জবাই করলেন। রক্তে মাখামাখি হলো জায়গাটা। শুকনো বালুমাটি খুব দ্রুত রক্ত শুষে নিল। এরপর সেখানে বাঘছাল বিছিয়ে আমাকে বললেন খালিগায়ে পদ্মাসনে বসতে।

হালকা লাল রঙের যে কালিতে চিহ্ন এঁকেছিলেন সেই তরলের কিছুটা মূর্তিটার ভেতর ঢেলে একচুমুক খেতে বললেন। খেতে খারাপ লাগল না। ঘিয়ের গন্ধ পেলাম। মূর্তিটা ফিরিয়ে নিয়ে বাংলায় লেখা একটা সংস্কৃত মন্ত্র খুব ধীরে একশো চুয়াল্লিশবার পড়তে বললেন। মাটির মালসায় মরা একটা চড়ুই পাখি রেখে ঢেকে দিলেন সরা দিয়ে। কেরোসিনের স্টোভ জ্বেলে তার ওপর মালসাটা রেখে সবটুকু সলতে উসকে দিলেন। লাল গনগনে হয়ে উঠল মালসা। ঘণ্টাখানেক পর আঁচ কমিয়ে সরা যখন তুললেন তখন দেখলাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চড়ুই। এক চিমটে ছাই তুলে যে তরলটুকু এখনও বাকি ছিল তার সাথে মেশালেন মন্ময়। আমাকে বললেন পুরোটা খেয়ে ফেলতে। এইবার চড়ুইয়ের বাকি ছাইটুকু বৃত্তের চারপাশে ছিটিয়ে দিলেন। অন্য একটি কাগজ বের করে দুলাইনের আরেকটি মন্ত্র আমার হাতে দিয়ে বললেন আবারও একশো চুয়াল্লিশ বার পড়তে।

মন্ত্র পড়তে শুরু করার পরই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। মনে হলো ঘরের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে নেমে গেছে। দেখলাম মরু এলাকায় বিশাল এক পাথুরে মন্দিরে বসে আছি। পরমুহূর্তে পাল্টে গেল দৃশ্যপট। দেখতে পেলাম আদ্যিকালের এক বনের কিনারায় থানপরা শতশত টাকমাথা লোক শয়তানের বিকট মূর্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। মূর্তির পায়ের কাছে পাথরের বেদীতে সাতটি তরুণীর কাটা মাথা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বেদী, শয়তানের পা। হঠাৎ অনুভব করলাম এক অপার্থিব কুৎসিত ঠাণ্ডা হাত দিয়ে কে যেন আমার হৃৎপিণ্ড চেপে ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারালাম আমি।

হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখি সেই বুড়ো লোকটা আমার মাথায় পানি

ঢালছে। চৌধুরী তাঁর সব জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন। মেঝের ওপরকার নক্সা উধাও। খুব ভোরে যখন বের হলাম পাড়াটাকে মনে হলো ভূতের শহর। কোথায় হারিয়ে গেছে রাতের সেই মৌতাত। দুটো রিকশা নিয়ে গোয়ালন্দ বাজারে ফিরলাম আমরা। ড্রাইভার রওনা হলো সাথে সাথে। পথে রাজবাড়ি বাজারে নেমে মুরগির ঝোল নানরুটি দিয়ে নাস্তা সেরে আবারও গাড়িতে। বাসার সামনে আমাকে নামিয়ে দিলেন মন্ময়। হাতে খবরের কাগজে পেঁচানো একটা প্যাকেট আর একটি চিঠি দিলেন। বললেন, 'প্যাকেট সাবধানে রাখবেন। চিঠিটা ভাল করে পড়বেন।' ড্রাইভারকে বললেন, 'বাসায় চলো, জলদি।'

এগারো

বাসায় ফিরে জানলাম মা বড়মামার ওখানে। গতরাতে তাঁর স্ট্রোক করেছে। গোসল সেরে খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে চিঠি খুললাম। সুন্দর করে গুছিয়ে লেখা চিঠি। খুব সম্ভব চৌধুরী আগেই লিখে রেখেছিলেন। দিন তারিখ কিছু উল্লেখ নেই:

সঞ্জয় বাবু,
আপনার সাথে আমার হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না। তার প্রয়োজনও নেই। সাধনা কতটুকু সফল হয়েছে তা বোঝা যাবে তিন দিনের মধ্যেই। কাগজের প্যাকেটে কাঠের মূর্তিটা আছে। এটা একটা টাইম বম্ব। মূর্তিটার কাজ কার প্রাণনাশ করতে হবে

হাকিনীকে সেই বক্তিকে চিনিয়ে দেয়া। সেই অর্থে এটাকে হোমিং ডিভাইসও বলতে পারেন। টাইম বম্ব এই অর্থে যে সময় মাত্র তিনদিন। আজ রাতেই মূর্তিটা যার ছবি থেকে ওটা বানানো তার বাসার সীমানার ভেতর পুঁতে রেখে আসবেন। মূর্তিটা ভারি মনে হবে। এর কারণ ওটার পেটের ভেতর আপনি যেখানে বসে যজ্ঞ করেছেন সেখানকার মাটি ভরে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করতে পারেন যে তরল পদার্থ আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম সেটা আসলে কী ছিল? অনেক পুরনো রেড ওয়াইন-এর সাথে একজন বারবণিতার ঋতুস্রাব এবং কালী মন্দিরে যে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে সেই পিদিমের ঘি মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। এসব কথা আপনাকে বলছি এই কারণে যে আপনি যেন না ভাবেন আপনাকে বিষাক্ত কোনও কিছু খাইয়ে অসুস্থ করে ফেলেছি। ঋতুস্রাব খেলে মানুষ অসুস্থ হয় না। প্রাক ইসলামী যুগে মক্কার লোকেরা ঋতুস্রাব খেত। তাদের কোনও সমস্যা হয়নি।

আবারও বলছি, যত তাড়াতাড়ি পারেন মূর্তি দাফনের ব্যবস্থা নিন। শুভ কামনা রইল।

লেখকের নাম-ঠিকানা নেই। মোটা মোসলেমের নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই কোথাও। চিঠি অন্যের হাতে যদি পড়েও মন্ময় চৌধুরীকে জড়ানো যাবে না কিছুতেই। সত্যি কথা বলতে কী. লোকটা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। এ হচ্ছে পিরামিড। সামনেই আছে অথচ চির রহস্যময়। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। তলিয়ে গেলাম ঘুমের গভীরে। স্বপ্নে দেখলাম বুড়ির বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে। তার সেই বীভৎস বসার ঘরের সরু দরজা দিয়ে মন্ময় চৌধুরীর সাথে মোটা মোসলেম বেরিয়ে এল। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ হাঁ করল। তাদের খোলা মুখ থেকে অসংখ্য ছোটছোট তীর আমার গায়ে এসে বিঁধতে লাগল। আমি

দাঁড়িয়েই আছি। কোত্থেকে বুড়ির নাতজামাই ছুটে এল। ধাক্কা মেরে রাস্তার একপাশে সরিয়ে দিল আমাকে। জেগে উঠে দেখি বাসার কাজের ছেলে নিমাই আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে দেখে বলল, 'ও সঞ্জুদা, আপনাকে তো মশা খায়ে ফেলল। সেই ককুন সাঁজ হয়েচে। একুনও ঘোম পাড়তিচেন। ওটেন। আপনের বড়মামা মইরে গেচে। তেনার বাড়িত যাতি হবে। খপর পাটায়েচে।'

মাথায় আকাশ সৌরজগৎ ছায়াপথ সব ভেঙে পড়ল। আমরা জাতে হিন্দু। বড় মামার সৎকার করতেই হবে। যত রাতই হোক শ্মশানে লাশ দাহ করা চাই। মূর্তি কখন দাফন করব বুঝতে পারছি না। হায়রে সময়! সময় গেলে সাধন হবে না। ছুটলাম বড় মামার বাড়ি। মূর্তি পড়ে থাকল বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে। শ্মশান মশান ঘুরে বাড়ি এসে লোহা লবণ ছুঁয়ে পাকসাফ হয়ে যখন ঘরে উঠলাম তখন সকাল আটটা। আবারও সেই রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা। সারাদিন ঘুমালাম। বিকেলের দিকে হেঁটে হেঁটে মোটা মোসলেমের বাড়ির দিকে গেলাম। আহসান আহমেদ রোডে এক হিন্দু জমিদারের মেয়ের বাড়ি দখল করে বাস করছে। বাড়ির সামনে নিচু প্রাচীর ঘেরা একটা ছোট বাগান। এককালে সুন্দর ছিল। এখন সেখানে চার পাঁচটা কলাগাছ। ডানে বাঁয়ে হেলে আছে। বাড়ির রঙ ক্যাটকেটে হলুদ। জানালা দরজা রয়েল ব্লু। মূর্তি দাফনের জন্যে বাগানটাকেই বেছে নিলাম। রাত বারোটা নাগাদ দেয়াল টপকে ঢুকলাম ওখানে। ফুট খানেক গভীর গর্ত করতে হবে। কোদাল আনা সম্ভব হয়নি। ছোট একটা খুরপি এনেছি। বাগানে ঢুকে রাস্তার কাছাকাছি এক কোনায় গর্ত খুঁড়লাম। কাগজের মোড়ক সরিয়ে বের করলাম মূর্তিটা। হাতে নিয়ে মনে হলো ভীষণ ঠাণ্ডা এবং একই সাথে অনবরত ঘামছে

ওটা। মাটি চাপা দিয়ে উঠতে যাব এমন সময় দুটো মটরসাইকেল আসার শব্দ পেলাম। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাতে লাগল চালকেরা। জাগ দলের কর্মী মোটা মোসলেমের সাথে কথা বলতে চায়। দেখে ফেললে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি পড়বে। পাঁচিল ঘেঁষে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। ইচ্ছে হলো মাটিতে মিশে যাই। ভেবেছিলাম লোকগুলো বাড়ির ভেতরে ঢুকবে। ঘটল এর উল্টোটা। বাসা থেকে বেরিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল মোসলেম। কথা আর শেষ হয় না। পাঁচিলের ওপাশে পৌর কর্পোরেশনের ড্রেন। মশাদের মহাদেশ। শরীরের ওপর চাদর বিছিয়ে দিল তারা। মনে হলো অনন্তকাল শুয়ে আছি। অসহ্য হয়ে উঠল মশা আর অদৃশ্য পোকার কামড়। সব কিছুরই শেষ আছে। কর্মীরা বিদায় হলো, মোটা ঘরে ফিরল। পাঁচিল টপকে আমি ফিরলাম বাসায়।

৭

পরদিন বিকেলে চা নাস্তা খেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড় ঘুরে হাঁটতে লাগলাম আহসান আহমেদ রোড ধরে। মনে প্রশান্তি। মিশন অ্যাকমপ্লিশ্‌ড। দেখিব খেলাতে কে হারে কে জেতে! মোসলেমের বাড়ির সামনে এসে খেলাম জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা। ধুন্ধুমার কাণ্ড। বাগান কলাগাছ পাঁচিল সব উধাও। পুরো জায়গাজুড়ে ফাউণ্ডেশনের গর্ত। ওখানে নীচে মার্কেট ওপরে জাগ দলের অফিস হবে। দুটো বাঁশের খুঁটিতে সাইনবোর্ড টাঙানো: দোকান-কোঠা বরাদ্দ চলছে। তিনটে বেডফোর্ড ট্রাক দাঁড়ানো। সারাদিন মাটি টেনেছে ওগুলো। এই বিরাট শহরে কোথায় মাটি ডাম্প করেছে কে বলতে পারে?

সন্ধে থেকে একটানা ডায়েরী লিখছি। মা মরা-বাড়িতে। ন'টার দিকে নিমাই এসে খবর দিয়েছে খাবার রেডি। বলেছি

রাতে খাব না। এক মহাজাগতিক হতাশায় ডুবে আছি। অপেক্ষা করছি চূড়ান্ত পরিণতির। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। জানালার শিক গলে ঘরে ঢুকল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। পর্দা ফুলে ঢোল। বাড়ির সামনে দেখতে পেলাম জমাট বাঁধা একতাল ঘন অন্ধকারকে। মনে হলো আষাঢ়ী অমাবস্যার রাতে ডবল সাইজ গরিলা দাঁড়িয়ে। খুব ধীরে জানালার দিকে এগুতে শুরু করল ছায়াছায়া কিংকং। হাকিনী তার শিকার চিনে ফেলেছে...

মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর

বালাই

উপক্রমণিকা

রাস্তার ওপাশে শেষ দোকানের আলোটাও নিভে গেল। শীতজর্জর অন্ধকারে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সিগারেটের শেষাংশটা কেরামবোর্ডের গুটির মত টোকা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন ডা. রহমান। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আলো ছড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। জানালার শার্সি টেনে দিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। নাইট ডিউটি দিতে মন্দ লাগে না তাঁর। তাঁর ইনসমনিয়া আছে। অতিশয় কষ্টদায়ক এই রোগটিকে কাজে লাগানো গেছে এই হাসপাতালে চাকরিটা নিয়ে।

'আখতার বানু মেমোরিয়াল সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিক' একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ঢাকা থেকে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরে এক অজপাড়াগাঁয়ে এর অবস্থান। জিন্নাত আলী নামে ঢাকার একজন প্রথমস্থানীয় শিল্পপতির স্বপ্নের সার্থক পরিণতি এই ক্লিনিক। জিন্নাত আলী তাঁর স্ত্রী আখতার বানুকে অত্যধিক ভালবাসতেন। আখতার বানুও তাই। হিংসা করার মত সুখী দম্পতি ছিলেন তাঁরা। একটাই অপূর্ণতা ছিল তাঁদের—তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। ডাক্তার দেখিয়েছেন অনেক। কোন লাভ হয়নি। শুধু জানা গেছে সমস্যাটা জিন্নাত আলীর। সন্তান দত্তক

নেয়ার কথাও ভেবেছিলেন দু'জনে। তার আগেই, কে জানে কেন, আখতার বানু মানসিক রোগে আক্রান্ত হলেন। রাতে ঘুমোতেন না। রাতভর ঘরময় নিঃশব্দে পায়চারি করতেন আর বিড়বিড়িয়ে কী সব আওড়াতেন। খুব খেয়াল করে কান পাতলে শোনা যেত, তিনি কিছু অবোধ্য অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করছেন। যেমন—নারা রিকা রাসা বিও; নারা রিকা রাসা বিও। আখতার বানুর সাথে জিন্নাত আলীকেও রাতভর জাগতে হত। ভাগ্যের কী খেলা, জিন্নাত আলীর প্রিয়তমা স্ত্রী একসময় জিন্নাত আলীকে অপছন্দ করতে শুরু করলেন। ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী এই অপছন্দ একসময় চূড়ান্ত রূপ নিয়ে ঘৃণায় পরিণত হলো এবং আখতার বানু একসময় বলতে আরম্ভ করলেন যে, তাঁর গর্ভে সন্তান এসেছিল এবং এই সন্তানকে জিন্নাত আলী হত্যা করেছেন। সম্ভবত জিন্নাত আলীর সন্তান জন্মদানে অক্ষমতাকে নির্দেশ করতেন তিনি। প্রিয়তমা স্ত্রীর এসব প্রলাপ জিন্নাত আলীকে অত্যন্ত মনোকষ্ট দিত। তবু নিজেকে সামলে যথাসম্ভব স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টা করতেন তিনি। মনোবিকারগ্রস্ত একজন মানুষের কথায় রাগ করার কোন মানে হয় না। অবশেষে এক নিশুতি রাতে উন্মাদ অবস্থায় আখতার বানু আত্মহত্যা করেন। অ্যাপার্টমেন্টের বাইশ তলার ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়েন তিনি। সকাল বেলা লাশের আঙুলে বিয়ের আংটি দেখে তাঁকে সনাক্ত করেন জিন্নাত আলী। বাইশ তলা থেকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়েছিলেন আখতার বানু। চেহারা থেঁতলে বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। সুরতহাল রিপোর্টে প্রকাশিত হলো, আখতার বানু সন্তানসম্ভবা ছিলেন। জিন্নাত আলী বললেন, এই সন্তান তাঁরই ছিল, অনেক রকম চিকিৎসা করে তাঁরা অবশেষে বাবা-মা হতে চলেছিলেন এবং দু'একদিনের মধ্যেই তাঁরা এই সুসংবাদটা প্রকাশ করতেন। স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানকে

একসঙ্গে হারিয়ে কিছুদিন নিজেকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখলেন তিনি। স্ত্রীকে সুস্থ্ করতে চেষ্টার অন্ত ছিল না জিন্নাত আলীর। দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন, নিয়ে গেছেন দেশের বাইরেও। কোন ফল পাননি। এ সবই বছর পঁচিশেক আগের কথা।

জিন্নাত আলীর অভিযোগ, যত সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন তিনি হয়েছেন, তাঁরা সবাই প্রফেশনাল হলেও, আন্তরিক নন কেউই। মানসিকভাবে অসুস্থ্ একজন মানুষের চিকিৎসার চেয়ে ভালবাসাটা বেশি দরকার। তিনি নিয়ত করলেন, সৃষ্টিকর্তা যদি সামর্থ্য দেন, তবে তিনি মানসিক রোগীদের জন্য একটি মানসম্মত দাতব্য চিকিৎসালয় করে দেবেন। কাজেই তিনি নিরিবিলি একটা সুপ্রশস্ত জায়গার খোঁজ লাগালেন। পেয়েও গেলেন একসময়। তারপর এই আড়াই বিঘা জমির উপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল অত্যাধুনিক একটি মানসিক হাসপাতাল—'আখতার বানু মেমোরিয়াল সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিক'। জিন্নাত আলী ইচ্ছে করেই 'মেণ্টাল' শব্দটার বদলে 'সাইকোলজিক্যাল' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। 'মেণ্টাল' শব্দটা শুনলেই কেমন যেন পাগল পাগল মনে হয়। মানসিক রোগী মাত্রই পাগল নয়। পঁচিশ বছর পর নিজের নিয়তের সার্থক পরিণতি ঘটালেন তিনি। এই হাসপাতালের জন্য ডাক্তার, নার্স এবং দারোয়ান চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলো। অফার করা হলো আকর্ষণীয় বেতন। নইলে ঢাকা ছেড়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে আধুনিক ডাক্তাররা আসবে কেন? বিজ্ঞাপনে জিন্নাত আলী আবেদনকারীদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন, রোগীদেরকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসতে না পারলে যেন তাঁরা আবেদন না করেন। চিকিৎসা করতে হবে মমতা মিশিয়ে। অনেক বাছাবাছির পর আপাতত চারজন ডাক্তার

নেয়া হলো। এদের মধ্যে ডা. রহমান বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি অবসরপ্রাপ্ত সাইকোলজিস্ট। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে দীর্ঘদিন কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন। অবসর নিলেও হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে কাজ করার নেশাটা ছাড়তে পারেননি আজও। মানব মনের দুর্গম গলি-ঘুপচিতে বিচরণ করাও এক ধরনের নেশা। ডা. রহমান বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে বউ বাচ্চা নিয়ে সিঙ্গাপুরে থাকেন। একা একা কী করবেন ডা. রহমান ভেবে পান না। নিঃসঙ্গতা এবং কর্মহীনতা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। মনে হচ্ছিল তাঁকে জোর করে অবসর দেয়া হয়েছে। শারীরিকভাবে এখনও যথেষ্ট সবল তিনি। বয়সই জরা মাপার একমাত্র মাপকাঠি নয়, এ কথা কেউ বোঝে না। এরা বোধহয় কাজী নজরুলের যৌবনের গান পড়েনি। তার উপর অনিদ্রা রোগটা হয়ে উঠল গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত। এখানে এসে তিনি বেশ স্বস্তি অনুভব করছেন। যা হোক সারারাত করার মত একটি কাজ তো পাওয়া গেল।

হাসপাতালটা আপাতত আড়াইশো সিটসহ দোতলা করা হয়েছে। পরে আরও বাড়ানো হবে। হাসপাতালে পেছন দিকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ডক্টরস কোয়ার্টার। তার একটু ডানদিকে স্টাফ কোয়ার্টার। পুরো কম্পাউণ্ড বিশাল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ডা. রহমান নিজেই যেচে নাইট ডিউটি নিয়েছেন। একঘণ্টা পরপর তিনি পুরো হাসপাতালটা একবার চক্কর দেন। দু'জন নার্স আর দু'জন দারোয়ান জেগে থাকে সারারাত। কোন রোগীর কোন অসুবিধা হলে নার্স খবর দেয় তাঁকে, তিনি ছুটে যান। ফ্লাস্ক ভর্তি চা থাকে তাঁর টেবিলে। আর থাকে বই। জিন্নাত আলী প্রতি সপ্তাহে একবার আসেন, ঘুরে ফিরে দেখেন সবকিছু। স্টাফ এবং ডাক্তারদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নেন, ব্যবস্থা নেন

প্রয়োজন মত। চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি এখানে। ব্যবসায়ী জিন্নাত আলী এই প্রথম ব্যবসার বাইরে কোন কাজে হাত দিলেন। দেশের মানসিক রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন তিনি। তিনি অধিকাংশ হাসপাতালেই দেখেছেন, জায়গাটা যথেষ্ট নির্জন নয়। মানসিক রোগীদের প্রয়োজন নির্জনতা। বাইরের হৈ চৈ তাদের অসুস্থতা ত্বরান্বিত করতে পারে। রোগী আনা নেয়ায় কোন ঝামেলা নেই। হাসপাতালের নিজস্ব গাড়ি আছে। কেউ রোগী ভর্তি করতে চাইলে মোবাইলে খবর দিলেই হয়। অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে ঢাকা থেকে শুধু নয়, সারা বাংলাদেশ থেকেই রোগী নিয়ে আসবে।

মোটামুটি নির্জন দেখেই জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন জিন্নাত আলী। আশপাশে কোয়ার্টার মাইলের ভেতর কোন জনবসতি নেই, শালবন আর ফসলের ক্ষেত। এরপর গ্রাম আছে কয়েকটা। এই হাসপাতালকে কেন্দ্র করে তিনটে চায়ের দোকান বসেছে এই জনবিরল জায়গায়। দোকানদাররা সবাই ওইসব গ্রামের বাসিন্দা। ডাক্তার এবং স্টাফরা অফ টাইমে এখানে চা খায়, আড্ডা দেয়। পতিত জায়গা হওয়াতে সরকারি সোডিয়াম বাতি এখনও বসেনি হাসপাতালের সামনের ইট বিছানো পথে। কাজেই দোকানের আলোগুলো নিভে গেলেই পুরো চরাচর অন্ধকারের আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে যায়। অথৈ সমুদ্রের মাঝে একটুকরো প্রবাল দ্বীপের মত হাসপাতালটা শুধু আলোকিত হয়ে থাকে জেনারেটরের বদৌলতে। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ পৌছেনি এখনও। ধীরে সুস্থেই কেটে যাচ্ছিল হাসপাতালের দিনগুলো।

কিন্তু আজ রাতটা বড় অশুভ।

এক

চশমাটা চোখে দিয়ে বই খুললেন ডা. রহমান।

এম. আর. জেমসের ভূতের গল্প। গভীর রাতে কেন যেন তাঁর ভারি, বাস্তবধর্মী বই পড়তে ভাল লাগে না। তিনি মনে করেন, সব মানুষেরই উচিত মাঝে মাঝে বাস্তবতার বাইরে কাল্পনিক কোন জগতে ঘুরে আসা। চব্বিশ ঘণ্টা বাস্তবতার কষাঘাত সইতে সইতে মানুষ একসময় ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন তার একটু রিলিফ দরকার হয় আর কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ভূতের গল্পের চেয়ে ভাল কিছু আছে বলে মনে করেন না ডা. রহমান।

কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে একটা চক্কর লাগিয়ে এসেছেন তিনি। একটু পর যাবেন আবারও। হাসপাতালে চক্কর লাগানোর ফাঁকে তিনি চক্কর লাগান বইয়ের পাতায়, চায়ের কাপে, সিগারেটের ধোঁয়ায় এবং নিজের মনের অলিগলিতে। ভাবতে বড় ভাল লাগে তাঁর। মানব জীবনটা অসীম রহস্যময় মনে হয় তাঁর কাছে। দুইদিনের এই জীবন নিয়ে কত আয়োজন মানুষের। আসলেই কি মানুষের জীবনটা দু'দিনের? অধিকাংশ মানুষ যেভাবে জীবন যাপন করে, জীবনটা কি আসলেই তাই? কতই না তাৎপর্যহীন জীবন কাটায় মানুষ। খাওয়া, ঘুম, গোসল, বাথরুম করা আর যৌনতা বাদে আর একটি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে অধিকাংশ মানুষ—টাকা কামানো। অত্যন্ত গুরুত্বহীন জীবন কাটায় এসব মানুষ। জন্ম নেয়া, শৈশবে খেলাধুলা করা, স্কুলে

যাওয়া, কৈশোর হয়ে যৌবনে পদার্পণ করা, পড়াশোনা শেষ করে হুড়মুড়িয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়া, সুন্দরী স্লীম ফিগারের একটি মেয়েকে বিয়ে করা (যে কিনা প্রৌঢ়ত্বে এসে মৈনাক পর্বতে পরিণত হবে), প্রজনন, ছানাপোনা জন্ম দেয়া, তারপর একদিন ফট করে মরে যাওয়া, এমনই দুর্ভেদ্য বৃত্তে মানুষের জীবন চক্র আবদ্ধ? এই চক্র কি অভেদ্য? ডা. রহমান তা মনে করেন না। তাঁর কাছে জীবনটা আরও প্রসারিত। টাকার প্রয়োজন আছে বটে, তবে সেটা যতটুকু দরকার, ততটুকু। বিলাসিতাহীন এবং অভাবহীন জীবন যাপনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা উপার্জন করা এবং প্রতি মাসে কিছু সঞ্চয়, এই যথেষ্ট। বিলাসিতা ডা. রহমানের একেবারেই অপছন্দ। যেমন শো পীস। যে জিনিস শারীরিক বা মানসিকভাবে কোন কাজে আসছে না, তা ঘরে সাজিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। আর বইয়ের চেয়ে ভাল শোপীস কিছু আছে বলে মনে করেন না ডা. রহমান। এক শেলফ ভর্তি বই-এর চেয়ে ভাল দেখতে আর কী আছে!

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, পৃথিবীতে আজ অবধি যত দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ধর্মীয় গুরু, কবি-সাহিত্যিক, সাধক-বাউল এসেছেন, এঁরা সবাই বলে গেছেন, মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসের সেই সংলাপ তো মনুমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেকসপিয়র সাহেব বলে গেছেন, 'লাইফ ইজ নাথিং বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো, রিটেন বাই অ্যান ইডিয়ট।' কিটস, শেলি, ব্লেক সহ রোমান্টিক যুগের সকল কবি জীবনের অস্থায়ীত্ব নিয়ে আফসোস করে গেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিলস তো জগদ্বিখ্যাত ট্রানজিয়েন্ট পোয়েম। হাসন রাজা, লালন শাহ এঁরা সবাই গান রচনা করেছেন জীবনের অস্থায়ীত্ব নিয়ে আফসোস করে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত

সন্নিকটে, প্রস্তুত হও। অথচ এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে ক্ষুদ্রাকারে কিছু লেখার উপায় নেই। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানব জীবন নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই সেটা মহাকাব্য হয়ে ওঠে। জীবন তৃণসম, তার ব্যাখ্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতুল্য।

মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই সচকিত হয়ে উঠলেন ডা.রহমান। নিজের মস্তিষ্কটাকে মাঝে মাঝে আটলান্টিক মহাসাগর বলে মনে হয় তাঁর। ভাবনার এতই গভীরে তলিয়ে যান, সময়ের ব্যবধান মুছে যায়। নিজেকে বাস্তবে ফেরানোর জন্যই সেলফোনে অ্যালার্ম দিয়ে রাখেন তিনি। অ্যালার্ম বাজলেই বুঝতে পারেন, হাসপাতালে চক্কর দেয়ার সময় হলো। আধখাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। পাতা ভাঁজ করে বই বন্ধ করলেন। স্টেথিসকোপটা গলায় ঝুলিয়ে রওনা হলেন ওয়ার্ডগুলোর দিকে। আপাতত হাসপাতালে ওয়ার্ডের সংখ্যা দুটি—ওয়ার্ড এ এবং বি। একটা শান্তশিষ্ট রোগীদের জন্য যারা সাইকোলজিক্যালি ডিজঅর্ডারড ঠিকই, তবে কোন পাগলামি করে না। নিজের মত থাকে, আপন মনেই কথা বলে। অন্য ওয়ার্ডটা তাদের জন্য, যারা সুযোগ পেলেই পাগলামি করে, যাকে সামনে পায় মারতে আসে, এমনকী নিজেকে মারাত্মকভাবে আহত করার প্রবণতাও আছে অনেকের। এদেরকে ঘুমের ওষুধ বা ইনজেকশন, অনেক সময় অ্যানাসথেসিয়া দিয়েও ঘুম পাড়াতে হয়। ঘুমানোর পর হাতে পায়ে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হালকা কিন্তু মজবুত শেকল পরিয়ে রাখা হয় এদের। কে জানে, রাতে ঘুম ভেঙে কার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। কয়েকজন আছে, যাদের চব্বিশ ঘণ্টাই ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখতে হয়, অতিশয় বিপজ্জনক এরা।

প্রথমে শান্ত ওয়ার্ডটির দিকে রওনা হলেন ডা. রহমান। এই

ওয়ার্ডের একটি রোগী সম্প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার নাম সিতারা। অশিক্ষিত, মধ্যবয়স্ক এবং অন্ধ এই মহিলার বাড়ি আড়াই কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে। তার স্বামী তাকে এখানে রেখে গেছে। তার ভাষ্যমতে, সিতারা তন্ত্রমন্ত্র চর্চা করত। কোন এক সন্ন্যাসী তাদের গ্রামের কবরস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। সিতারা কীভাবে যেন তাকে খুশি করে তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়েছিল। সন্ন্যাসী একদিন চলে গেল, কিন্তু সিতারা তন্ত্র চর্চা ছাড়ল না। এও একধরনের নেশা। যা কিছু নিষিদ্ধ, তাই আকর্ষণীয়। অন্ধকারের একটা চৌম্বকীয় ক্ষমতা আছে, দুর্দমনীয় আকর্ষণে সে মানব সন্তানকে আকর্ষণ করে। তন্ত্র চর্চা করতে করতে সিতারা রাত দিন এক করে ফেলল। সন্ন্যাসী তাকে একটি সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিল, যা সে মানেনি। সে স্বচক্ষে শয়তানকে দেখতে চেয়েছিল, যার পূজা তান্ত্রিকরা যুগ যুগ ধরে করে আসছে। সন্ন্যাসী সিতারাকে বলেছিল, যার আরাধনায় শয়তান খুব সন্তুষ্ট হয়, তাকে সে দেখা দেয়। আর পূজা করে করে শয়তানকে একবার দেখে নিতে পারলে অসীম ক্ষমতা এসে যাবে তার হাতে। বহুদূর থেকেই সে শায়েস্তা করতে পারবে তার শত্রুকে, চাইলেই লাখ লাখ টাকা জমা হবে তার ভাঙা আলমারিটাতে, কোন আসন্ন বিপদের কথা আগে থেকেই টের পেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে। তবে ওই চেহারা সহ্য করার ক্ষমতা সবার থাকে না। আর সহ্য করতে না পারলে ক্ষমতা তো দূরের কথা, হয় সে মারা যাবে, নতুবা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। সিতারার দ্বিতীয়টি হয়েছে। তার স্বামী বলেছিল, সিতারা নাকি রাতভর তান্ত্রিক সাধনা করত। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার লোভ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। একরাতে সিতারার মরণ চিৎকারে তার স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। সে ছুটে পাশের ঘরে যায় এবং দেখতে পায়, তার স্ত্রী

মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে এবং তার দু'চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। একটি খুব দ্রুত অপসৃয়মাণ অতিকায় ছায়াও সে দেখতে পেয়েছিল। তবে সেটা শয়তান ছিল নাকি চোখের ভুল, তা সে বলতে পারে না। সবার ধারণা, শয়তানকে দেখে সিতারা ওই রূপ সহ্য করতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে সে আক্ষরিক অর্থেই অন্ধ এবং উন্মাদ হয়ে গেছে।

ডা. রহমানের অবশ্য ধারণা, ভণ্ড এক সন্ন্যাসীর প্রলোভনে পড়ে তন্ত্রমন্ত্র নামক একটি অলীক ধারণায় বিশ্বাস করে এই অশিক্ষিত মহিলার মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে। শয়তানকে দেখতে না পারার ক্ষোভে নিজেই নিজের চোখ গেলে দিয়েছে। তবে সিতারার দু'একটি কাজ তাকে মোটামুটি বিস্মিত করে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, কেউ ঘরে ঢুকলেই সে টের পায় এবং কে ঢুকেছে, তাও বলে দিতে পারে অনায়াসে। আজও তাই হলো। ডা. রহমান সিতারার ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সে বলে উঠল, 'ডাক্তার নি? আছ কেমুন?'

ডা. রহমানের পায়ে রাবার সোলের জুতো এবং স্বভাবতই তিনি মোটামুটি নিঃশব্দে হাঁটেন। সিতারার ঘরে ঢোকার সময় তিনি আরও নিঃশব্দে ঢুকেছেন। প্রতিদিনের মত আজও সামান্য বিস্মিত হলেন তিনি। তাঁর কঠোর যুক্তিবাদী মনটা ঈষৎ টলে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। তিনি জানেন দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষের শ্রবণশক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি প্রখর হয়। সচরাচর কানে বাজে না, এরকম অতি সূক্ষ্ম শব্দও এদের অনেকের কর্ণগোচর হয়। কিন্তু এতই কি প্রখর হয়, যে নিস্তব্ধতাও শুনতে পাবে? ডা. রহমান সিতারার বিছানাতেই তার পাশে বসলেন, 'ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?'

সিতারা বেগম ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, 'ভালাই।'

ডা. রহমান সিতারার ব্লাড প্রেসার মাপলেন, হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, 'আমি ঘরে আসলে আপনি টের পান কীভাবে?'

আবারও হাসল সিতারা, 'খালি তুমি না, যেই আউক, আমি আলাপ পামু। ওইযে ছুকরি নার্সটা, কী জানি নাম—, একটু আগে আমার ঘরে উঁকি দিয়া গেল। তাও ট্যার পাইছি।'

'কীভাবে টের পান? শব্দ শুনে?'

এই কথা শুনে সিতারা হেসে বাঁচে না, 'ধুরো যা, ডাক্তার কিযে কও। শব্দ শুইনা নি মানুষ চিনন যায়? হি হি হি। আর তুমি কি আওয়াজ কইরা ঘরে ঢুকছ? না, তুমি তা করো নাই। আমি মানুষ চিনি গন্ধ শুঁইক্যা।'

মহিলা বলে কী? ডা. রহমান ডানে বামে মাথা নেড়ে হাসলেন। মানুষ কী কুকুর, যে গন্ধ শুঁকে চিনবে?

'না, মানুষ কুত্তা না। তয় শয়তানও কুত্তা না।'

ডা. রহমান চমকে উঠলেন। সিতারা কি থট রিডিং জানে নাকি? এধরনের রোগী তিনি তাঁর ডাক্তারি জীবনে পাননি। মানসিক রোগীদের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা প্রখর হয় কিনা তাঁর জানা নেই। তিনি জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, 'আমি কী ভাবছি আপনি কী করে বুঝলেন?'

'বুঝি বুঝি। শয়তানের চেহারাডা ঠিকমত দ্যাখতে পারলে আরও বহুত কিছু দেহাইতে পারতাম।'

'শয়তান দেখতে কেমন?'

'ঠিকমত তো দ্যাখতে পারি নাই। যদ্দূর দেখছি, আর দেহনের সাধ নাই। তয় কয়লার লাহান দুইখান চক্ষু দেখছি, সেই চক্ষের আগুনে জানি আমার চক্ষু দুইখান পুইড়া গেল। আর কিছু মনে নাই। তয় আমার মন্ত্রতন্ত্র এক্কেরে ফেল মারে নাই বুঝলা?

কিছু কিছু আগে থেইকাই বুঝতে পারি গন্ধ শুঁইক্যা। তোমারে একখান কতা কমু, আমল দিয়া শুইনো কইলাম।'

'জ্বি. বলুন।'

'খাঁড়াও, কেউ শুনতাছে নি বুইজ্যা লই।'

চোখ বন্ধ করে নাক উপরের দিকে তুলে নেকড়ের মতই শব্দ করে গন্ধ নিল সিতারা। তারপর ডা. রহমানের দিকে ঝুঁকে এসে নিচু গলায় বলল, 'হাসপাতালে বালাই ঢুকছে। চোখ কান খোলা রাইখ্যো।'

'মানে?'

'আইজ রাইতের চানডা দ্যাখছো?'

'চাঁদ? হ্যাঁ, দেখেছি। তো?'

'চানডা এট্টু ত্যারছা উঠছে খেয়াল করো নাই?'

'কী করে বুঝলেন? গন্ধ শুঁকে? আপনি চাঁদেরও গন্ধ পান বুঝি?'

ফোকলা দাঁতে নিঃশব্দে হাসলেন সিতারা, 'শইলে ট্যার পাই। আইজ বড় খারাপ রাইত। সাবধানে থাইকো। হাসপাতালে বালাই ঢুকছে।'

'কী বালাই?'

'হেইডা জানি না। এত ক্ষমতা তো পাইনাই। বালাইডা ভাল না মন্দ তাও বুঝতাছি না। ভাল অইলে তো ভালাই! আর যদি খারাপ হয়...'

'খারাপ হলে কী হবে?'

'সয়লাব।'

দুই

দুই নম্বর ওয়ার্ডের দিকে রওনা হলেন ডা. রহমান। পথে রিনার সাথে দেখা। সে নার্স, নাইট ডিউটিতে আছে আজ। ডা. রহমানকে দেখে সালাম দিল। ডা. রহমান তার দিকে চেয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন। অর্থাৎ, 'খবর ভাল?'

হাসপাতালে আজ একটি নতুন রোগী ভর্তি করা হয়েছে। ডা. রহমানই এনেছেন তাকে। হাসপাতালের বাউণ্ডারি পার হলেই ইট বিছানো রাস্তা, সেই রাস্তা পেরোলে ঘন শালবন। ডা. রহমান মাঝে মাঝেই বিকালে ওই শালবনে ঢুকে পড়েন। একাকী হাঁটেন, কিংবা চুপচাপ বসে থাকেন কোথাও ঘাসের ওপর। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসতে বড় ভাল লাগে তাঁর। মনে হয় তাঁর আয়ু বেড়ে গেছে, রিচার্জ হয়ে গেছেন তিনি। আজ একটু বেশিই ভেতরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। ঘন শালবনের মধ্যে হঠাৎই ফোঁসফোঁস আওয়াজ এবং গোঙানির মত শব্দ শোনা গেল। মনে হচ্ছিল কোন হিংস্র পশু প্রচণ্ড ক্রোধে গজরাচ্ছে। থমকে গেলেন ডা. রহমান। তিনি যদ্দূর জানেন, এই বনে কোন হিংস্র পশু নেই। তবে কি সাপ? কিন্তু এই শীতকালে সাপ বেরোনোর কথা না। মেছোবাঘ নাকি? ডা. রহমান পিছু হঠলেন না। ভয়ের মুখোমুখি হওয়া উচিত। প্রশ্রয় পেলেই সে ডালপালা মেলবে। হয়তো তাঁর শালবন বিহারই বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি যথাসম্ভব শব্দ না করে এগোলেন এবং একটা শালগাছের গোড়ায়

একটি অল্পবয়সী মেয়েকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলেন।

গোঙানির মত শব্দটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। উবু হয়ে বসে থাকা মেয়েটি অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল। ডা. রহমান একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি কে? একা এই বনের ভেতর বসে আছ কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'আসসালামুআলাইকুম।'

ডা. রহমান মেয়েটিকে ভাল করে দেখলেন। বছর পঁচিশেক বয়স হবে। মাঝারি উচ্চতা, শ্যামরঙা মেয়েটার চোখদুটি পদ্মপাতার মত। রুক্ষ চুল, পরনে একটি শতচ্ছিন্ন সূতির শাড়ি। খালি পা। ডা. রহমান সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি কোত্থেকে আসছ? যাবে কোথায়? পথ হারিয়েছ?'

'আমি অনেক দূর থেকে আসতেছি। যাব হাসপাতালে। এদিকে নাকি একটা হাসপাতাল আছে?'

'তা আছে। কিন্তু সেখানে কেন? কে ভর্তি হবে?'

'আমি। আমার মাথা খারাপ তো। চিকিৎসা দরকার।'

মানসিক রোগী নিজেই চিকিৎসা করতে হাসপাতালে উপস্থিত, এমন ঘটনা বোধকরি খুব বেশি ঘটে না। ডা. রহমান মেয়েটির চোখ পরীক্ষা করলেন। অত্যন্ত শান্ত দুটি চোখ। তবে দুটি চোখই অতিশয় উদাসীন। সুস্থ একজন মানুষের চোখে এত উদাসীনতা থাকে না। মানসিক অসুস্থতার কিছুটা লক্ষণ এর মধ্যে আছে। ডা. রহমান তাকে সাথে করে হাসপাতালে নিয়ে এলেন। মেয়েটি জানাল তার নাম তরী।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণে রেখে বোঝা গেল, তরী অতি শান্ত স্বভাবের রোগী। কাজেই তাকে শান্ত ওয়ার্ডে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। দু'জন নার্স তাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে গোসল করিয়ে

নতুন কাপড় পরাল। পুরোটা সময় সে খুব চুপচাপ রইল। তখনও তাকে বেড়ে নেয়া হয়নি। ডা. রহমানের ঘরে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসেছিল সে আর নার্স তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। তখনি জিন্নাত আলী ঘরে ঢুকলেন। সাপ্তাহিক পরিদর্শনে এসেছেন তিনি। তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে একটা ব্যাপার হলো। অতি শান্তশিষ্ট তরী আচমকা ভয়ানক খেপে উঠল। চেয়ার ছেড়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল, নার্সের হাত থেকে ছিটকে পড়ল চিরুণী। দুই লাফে তরী জিন্নাত আলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত। ঘটনার অতর্কিতে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সবাই। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তরীর আঁচড়ে-কামড়ে জিন্নাত আলীর শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় ক্ষতচিহ্ন দেখা দিল। তিনজন ডাক্তার, একজন নার্স আর একজন জোয়ান তাগড়া দারোয়ান মিলে বহু কষ্টে তরীকে টেনে ছাড়ানো গেল। এই কাজটি করতে গিয়ে ডা. রহমান মেয়েটির শরীরের জোর টের পেলেন। আসুরিক শক্তি মেয়েটির গায়ে। অন্তত পাঁচজন মানুষের চেয়ে বেশি তো বটেই।

অতি কষ্টে তরীকে চেয়ারে বসিয়ে চেপে ধরে রাখল সকলে। তরী অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রইল জিন্নাত আলীর দিকে। চুল আবারও এলোমেলো হয়ে দু'একটি গোছা তার আগুনচোখের সামনে ঝুলে পড়েছে। নাকের পা-টা ফুলে উঠেছে। ওর জ্বলন্ত চোখদুটো দেখে ডা. রহমানের কেন যেন সিতারার মুখে শোনা শয়তানের চোখের বর্ণনা মনে পড়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা, তরী গোঙাচ্ছে। ঠিক সেই গোঙানি যা ডা. রহমান শালবনে শুনেছিলেন। কোন মানুষ এভাবে গজরাতে পারে তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

আচানক এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন জিন্নাত আলী। ডা. রহমান তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'জিন্নাত আলী সাহেব, মেয়েটা যে কারণেই হোক আপনাকে সহ্য করতে পারছে

না। আপনি এখানে না থাকলেই বরং ভাল। তা ছাড়া আপনার ফার্স্ট এইডও দরকার। নার্স।'

বাঁ হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন জিন্নাত আলী। তরীও শান্ত হয়ে এল ধীরে ধীরে। তবে তাকে শান্ত ওয়ার্ডে রাখার পরিকল্পনা বাতিল করতে হলো। একবার যখন খেপে উঠেছে, যেকোন মুহূর্তে আবারও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। দুই নম্বর ওয়ার্ডে একটি বেড এবং একগাছা শেকল বরাদ্দ হলো তার জন্য।

জিন্নাত আলী রাতেই ঢাকায় ফিরবেন। তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন ডা. রহমান। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জিন্নাত আলী বললেন, 'রহমান সাহেব, ঘটনাটা ঠিক বুঝলাম না।'

ডা. রহমান শার্টের একটি বোতাম খুলে দিয়ে বললেন, 'আমিও না'

'মেয়েটি কে?'

'ও আজই ভর্তি হয়েছে, ওর নাম তরী।'

'তরী!'

'চেনেন নাকি?'

'না না। নামটা একটু আনকমন নয় কি?'

'তা ঠিক।'

'ও আমাকে দেখে এত খেপে উঠল কেন?'

'বুঝতে পারছি না। আপনি আসার আগ পর্যন্ত তো ঠিকই ছিল। হতে পারে আপনার চশমা।'

'কী!'

'ওই ঘরে একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারও চোখেই চশমা ছিল না। কিছু কিছু মানসিক রোগীর কোন একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপর ব্যাখ্যাহীন আক্রোশ থাকে। তবে এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না।

মানসিক রোগীর সব আচরণ চট করে ঠিক বোঝা যায় না।'

'আর সুস্থ মানুষের?'

'জ্বি?'

'সুস্থ মানুষের সব আচরণ কি বোঝা যায়, ডা. রহমান?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'কিছু না। চলি।'

গাড়িতে চড়ে হুশ করে বেরিয়ে গেলেন জিন্নাত আলী।

সিতারা বলেছিল যে হাসপাতালে আজ বালাই ঢুকেছে। তরী ছাড়া হাসপাতালে গত কয়েকদিনে আর কেউ ঢোকেনি। সিতারা কি তবে তরীকেই বালাই বলছে? তার চেয়েও বড় কথা, হাসপাতালে যে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে আর সেটা যে আজই, একথা সিতারা জানবে কীভাবে? কাল সন্ধ্যায় ডা. রহমানের ঘরে যে হাঙ্গামা হয়ে গেল, সেটা কি সিতারার কান অবধি পৌঁছেছে? এমন হবার কথা না, কারণ এই হাসপাতালের প্রত্যেকটি ঘর সাউণ্ড প্রুফ। রোগীদের শান্তি নির্বিঘ্ন রাখতেই ব্যয়বহুল এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। কঠোর যুক্তিবাদী মানুষ ডা. রহমান। নিরেট যুক্তি ছাড়া কোন কিছুই তিনি বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু এই মুহূর্তে যে অজানা আশংকা তাঁর মনকে ক্রমশ গ্রাস করছে, এর পেছনে কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না।

তিন

তরীর কেবিনের সামনে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন ডা. রহমান।

অনুভব করলেন, একজন ডাক্তার হয়ে রোগীর কেবিনে ঢুকতে সামান্য ভীতি অনুভব করছেন তিনি। একটু লজ্জা পেলেন ডা. রহমান। বড় একটা শ্বাস নিয়ে কেবিনের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। চিৎ হয়ে সটান শুয়ে আছে তরী। দেখলেই বোঝা যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার দু' হাত শেকল দিয়ে খাটের রডের সাথে বাঁধা। নিঃশব্দে খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন ডা. রহমান। একটু ঝুঁকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালেন তরীর মুখের দিকে। চোখের বন্ধ পাতার দিকে মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন মেয়েটি কোন স্বপ্ন দেখছে কিনা। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে একজন মানুষের মানসিকতাটা বেশ আন্দাজ করা যায়। তরীর চোখের পাতার আড়ালে মণিদুটো একেবারেই স্থির, এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে না একটুও। অর্থাৎ মেয়েটি গভীর ঘুমে, সম্ভবত থিটা লেভেলে আছে। ঘুমের এই স্তরে মানুষ কখনও স্বপ্ন দেখবে না। মানুষ দেখে হালকা স্তরে, বিশেষ করে আলফা কিংবা বিটা লেভেলে।

ডা. রহমান এবার তরীর শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে মনোযোগ দিলেন। খুব ঘনঘন কিংবা খুব ধীরলয়ে অথবা অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস অসুস্থতার লক্ষণ। তেমন কোন সিম্পটমও দেখা গেল না মেয়েটির মধ্যে। দিব্যি সুস্থ একজন ঘুমন্ত মানুষের মত শ্বাস

নিচ্ছে। এই মেয়ের সমস্যা কোথায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কথা বলে সুস্থ মানুষের মত, আবার হঠাৎ খেপেও ওঠে। কাল মেয়েটার সাথে ভালভাবে কথা বলতে হবে। তরীর দিকে আরেকবার তাকিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল ডা. রহমানের। তরীর চোখদুটো খোলা। মাছের মত স্থির দুটি চোখ মেলে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডা. রহমানের দিকে। তাকে দেখে মনে হতে পারে সে মৃত। শ্বাস-প্রশ্বাসও চলছে কিনা সন্দেহ। চোখদুটোতে শীতল সর্পিল দৃষ্টি। ওই জীবন্মৃত চোখদুটি যেন একখণ্ড ব্লটিং পেপারের মতই ডা. রহমানের কণ্ঠনালীর সবটুকু আর্দ্রতা শুষে নিয়ে জায়গাটা শুকনো বালুচরে রূপান্তরিত করল। বহুকষ্টে একটি ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'তুমি ঘুমোওনি?'

'জিন্নাত আলী কোথায়?' ডা. রহমানের মনে হলো কয়েকশো বছর পূর্বের মৃত কোন মানুষ বুঝি তাঁর সঙ্গে কথা বলছে।

'মানে?'

'জিন্নাত আলী কোথায়? তারে আমার দরকার।'

'জিন্নাত আলীকে তুমি চেনো?'

'না।'

'তাঁকে কখনও দেখেছ?'

'না।'

'তা হলে তাঁর কথা জানলে কী করে?'

'সেইটা বলতে পারি না। খালি জানি, তারে আমার বড় দরকার।'

ডা. রহমান বুঝতে পারলেন তরী ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। উত্তেজনা বেড়ে গেলে আবারও পাগলামি করতে পারে। ঘুমের ব্যাঘাতও হবে। মানসিক রোগীদের সুস্থতার জন্য নিশ্ছিদ্র

ঘুমের কোন বিকল্প নেই। ঘুমের আগে তরীকে পাঁচশ' মিলিগ্রামের লিব্রিয়াম দেয়া হয়েছিল। ঘুমের ওষুধ হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর একটি ওষুধ। এরপরও কীভাবে তার ঘুম ভেঙে গেল ডা. রহমান ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'তরী, তোমার নামটা খুব সুন্দর, কে রেখেছেন?'

এই প্রশ্ন শুনে তরী হঠাৎ করেই বেশ খানিকটা নরম হয়ে গেল। মানসিকভাবে যারা অসুস্থ থাকে, এরা প্রশংসা শুনলে খুব খুশি হয়। তরী হাসি হাসি মুখে বলল, 'মা।'

'তিনি এখন কোথায়?'

তরীর মসৃণ কপালে চিন্তার সিঁড়ি দেখা গেল, 'ঠিক মনে নাই। তবে, একটা অন্ধকার ঘরে থাকে আমার মা। অন্ধকার হইলেও সেইখানে অনেক শান্তি।'

'তোমাদের বাড়ি কোথায়? থাকো কোথায় তোমরা?'

আরও কয়েকটি নতুন সিঁড়ি যুক্ত হলো তরীর কপালে, 'যখন বাড়ি থেইকা রওনা হইছিলাম, তখন জানতাম। এখন আর মনে নাই। খালি মনে আছে, আমাদের ঘরে সবসময় অন্ধকার থাকে। আর আমার মা খালি ঘুমায়। মাঝে মইধ্যে ধপধপা সাদা কাপড় পরা কিছু মানুষ আসে, তখন ঘরে আলো জ্বলে আর আমার মাও জাগে। ওই লোকগুলার সাথে কথাবার্তা বলে। তারপর আবার ঘুমায়ে পড়ে।'

'লোকগুলো দেখতে কেমন?'

'সাদা কাপড় পরা। তাগো গায়ের রংও সাদা। তাগো শরীর থেইকা আলো বাইর হয়।'

'অন্ধকারে তোমরা থাকো কীভাবে? খাওয়া দাওয়া কি অন্ধকারেই করো?'

'আমরা তো বাড়িতে কিছুই খাইতাম না। খিদাও লাগত না।

এইখানে আইসা দেখি খালি খিদা লাগে। মহা যন্ত্রণা।'

'তোমার মাথা খারাপ একথা তোমাকে কে বলেছে?'

'মা। একদিন আমারে ঘুম থেইকা জাগায়ে বলল, 'তোর মাথা খারাপ, চিকিৎসা লাগবে। হাসপাতালে ভর্তি হ গিয়া।' আমি বললাম, 'তুমিও চলো আমার সাথে।' মা বলল, 'আমার আর দুইন্যা দেখার ইচ্ছা নাইরে মা। খোদা আমার কপালে যা রাখছিল, দেইখা ফেলছি। তোর দুইন্যা দেখনের কথা আছিল। দেখতে পারিস নাই। তুই যা।' আমি তখন বললাম, 'আমি তো হাসপাতালের রাস্তা চিনি না, কেমনে যাব?' এই কথা শুইনা মা গেল চেইতা। বলল, 'সব আমার বলে দিতে হবে? নিজের পথ নিজেই খুঁইজা নে গা।' বলে মা আমারে দিল এক ঠেলা। মনে হইল আমি নীচে, অনেক নীচে পইড়া গেলাম। সাথে সাথে দেখলাম চারদিকে আলো, কত্ত আলো! আমি কেমন জানি অন্ধ হইয়া গেলাম। একটু পরে দেখলাম আপনি আমার সামনে দাঁড়ায়ে রইছেন।'

ডা. রহমানের মুখটা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে গেল, 'তোমার বাবা তোমাদের সাথে থাকেন না?'

'বাবা! সেইটা কী জিনিস?'

'কিছু না। তুমি ঘুমাও।'

'জিন্নাত আলী কোথায়?'

সর্বনাশ! এই মেয়ে তো দেখি তালে ঠিক আছে। ছেলে ভোলানোর মত মেয়ে তো এ নয়। ডা. রহমান আর কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন না। বললেন. 'জিন্নাত আলীকে তুমি কীভাবে চেনো?'

'জানি না। তারে আমার দরকার। এই খালি জানি।'

'কী দরকার? কী হবে তাঁকে দিয়ে?'

'মাইরা ফেলব, তারে আমি মাইরা ফেলব।' তরীর মুখের চামড়া তিরতির করে কেঁপে উঠল।

'কেন? সে তোমার কী ক্ষতি করেছে?'

'জানি না। শুধু জানি তারে আমার মাইরা ফেলতে হবে। জিন্নাত আলী আর তরী, দুইজনে একসাথে দুইন্যাতে থাকতে পারবে না। হয় সে, নয় আমি। তারে না মারলে আমি শেষ হইয়া যাব।'

'তাঁকে তো তুমি চেনো না। কীভাবে তাঁকে বের করবে?'

'আগে চিনতাম না। আইজ সন্ধ্যায় চিনছি। ওই বুইড়া হাবড়াই তো জিন্নাত আলী।'

'কী করে চিনলে?'

'জিন্নাত আলী যেইখানেই থাকুক তার বাঁচন নাই।'

'সে কোথায় থাকে তুমি জানো?'

'আমার তারে খুঁজতে হবে না। সে নিজেই আসবে। মৃত্যু কাউরে খুঁজে না, মানুষই মৃত্যুর কাছে ছুটে আসে। আমারে বেঁন্ধে রাখছেন কেন?'

'ঘুমের ঘোরে যাতে খাট থেকে পড়ে না যাও, এজন্য।'

সাপের মতই হিসহিস শব্দ বেরোল তরীর কণ্ঠ থেকে, 'ডাক্তার হয়ে মিথ্যা বলেন আপনার লজ্জা নাই? আপনারা সবাই জিন্নাত আলীরে বাঁচাইতে চান, না? বান্দন খুইলা দেন, নইলে...'

'নইলে কী?'

'খুইলা দিলে খালি জিন্নাত আলীরে মারব। না খুললে সবাইরে মারব।'

'না খুলে দিলে মারবে কী করে?'

একচিলতে ক্রূর হাসি ফুটল তরীর ঠোঁটে, সেই ক্রূরতা সংক্রমিত হলো তার চোখেও, 'আমি যেখান থেকে আসছি সেখান

থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ফিরতে পারে নাই। আমি পারছি। আর এই সুতা দিয়া আমারে আটকাবে কে? আমি আজ রাতেই বাইর হয়ে যাব। আইজ রাতেই।'

তরীকে একটা মোটামুটি শক্তিশালী ঘুমের ইনজেকশন দিলেন ডা. রহমান। অন্য কোন ওষুধে যখন কাজ হয় না, তখন এই ইনজেকশন দেয়া হয় রোগীকে। সারারাতে আর বিন্দুমাত্র জাগার সম্ভাবনা নেই। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল তরী।

চিন্তিত মুখে চোয়াল ডলতে ডলতে নিজের চেম্বারে ফিরছিলেন ডা. রহমান। সিতারার ঘরের সামনে আসতেই শোনা গেল, 'ডাক্তর না? ভেতরে আস, কথা আছে।'

ডা. রহমান ভ্রু কুঁচকে ফেললেন। এই মহিলার ত্রিসীমানায় থাকার উপায় নেই। ঠিকই টের পেয়ে যাবে আর ডাকাডাকি শুরু করবে। ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল। অগত্যা ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

'আপনি ঘুমোননি?'

'ঘুম আর আসেনারে বাবা। শয়তানের আশায় রাইত জাগা ধরছিলাম। সেই অভ্যাস হইয়া গেল। ঘুমের ওষুধেও আর কাজ হয় না। তোমারে একখান কথা কওনের লাইগা ডাকছি।'

'জ্বি, বলেন।'

আগের মতই মাথা উর্ধ্বমুখী তুলে সশব্দে গন্ধ নিল সিতারা। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'খারাপ না, ভালই।'

'কী খারাপ না? কী ভালই?'

'বালাই।'

'কী?'

'আহ। তোমারে কইছিলাম না, হাসপাতালে বালাই ঢুকছে? ভাল মন্দ তহন বুঝি নাই। এহন বুঝতাছি বালাইডা ভালই। তয়...'

'তয়?'

'বেশি ভাল আবার ভাল না।'

'বুঝলাম না।'

'আমিও না। সাবধান ডাক্তার, খুব সাবধান। বাতাসে লাশের গন্ধ। সাবধান না থাকলে লাশ পড়ব, লাশে লাশ ফালাইব।'

'আপনি ঘুমোন। আমি সাবধান থাকব।'

নিজের চেম্বারের দিকে রওনা হলেন ডা. রহমান। পেছন থেকে সিতারার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তখনও, 'হুঁশিয়ার ডাক্তার, হুঁশিয়ার।'

চার

এধরনের মানসিক অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে কখনও কল্পনা করেননি ডা. রহমান।

মানুষের মনটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নানান রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরপুর মানুষের মন। ডা. রহমানও তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছেন। আবেগের সাথে বিবেকের দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের সাথে জীবনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, কল্পনার সাথে বাস্তবের পাঞ্জাকষা, প্রাপ্তির সাথে হারানোর ডুয়েল, নিঃস্বার্থের সাথে স্বার্থের দরকষাকষি আরও বহুকিছু। মানুষকে আজীবনই নানান রকম যুদ্ধ করতে হয়—জীবনের সাথে, বাস্তবতার সাথে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে, প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ তার নিজের বিরুদ্ধে। আত্মদ্বন্দ্বই সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব। নিজেকে যে

পরাজিত করতে পারে, তার চেয়ে বড় বিজয়ী আর কেউ নেই।

নিজের চেম্বারে এসে জানালার শার্সি খুলে দিলেন ডা. রহমান। মগজটা তেতে আছে, একটু বাতাস লাগুক। হিমশীতল মৃদু বাতাস বইছে, কিন্তু মাঘ মাসের কুয়াশার নিরেট দেয়াল তাতে একটুও টলছে না, যেমন টলছে না ডা. রহমানের দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তা। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করতে পারছে না। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে জানালার কাছে ফিরে এলেন তিনি। কুয়াশা ধূসর মোটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে চরাচর। বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, হাতখানেক গিয়েই বাউন্স খেয়ে ফিরে আসে রাবারের বলের মত। এই মুহূর্তে নিজের মস্তিষ্ককে একটা রাবারের বল বলেই মনে হচ্ছে ডা. রহমানের। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত গিয়ে তাঁর চিন্তাও ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে প্যাভিলিয়নে। আবার প্রথম থেকে চিন্তা করতে হচ্ছে তাঁকে। একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। সেই ধোঁয়া কুয়াশার সাথে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে ধোঁয়াশায় পরিণত হলো। কোনটা কুয়াশা আর কোনটা সিগারেটের ধোঁয়া, বোঝার উপায় রইল না।

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায় যার কোনটিরই কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমত, হাসপাতালে তরীর উপস্থিতি সিতারা কেমন করে টের পেল? দ্বিতীয়ত, তরী কী করে জিন্নাত আলীকে চিনল? সে জিন্নাত আলীকে দেখে খেপে উঠল কেন? আর ওই লোকটার নামই যে জিন্নাত আলী, সে কীভাবে জানল? তৃতীয়ত, জিন্নাত আলীকে সে খুন করতে চায়, কেন? চতুর্থত এবং সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক, তরী তার বাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছে, এর সাথে একমাত্র কবর ছাড়া আর কিছুর মিল পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার থাকার কথা না, তার মায়ের সবসময় ঘুমিয়ে

থাকা মানে সে মৃত, জীবিত মানুষ সবসময় ঘুমোবে না। আর শুভ্র পোশাকে আলোকিত দেহধারী লোকগুলোর সাথে কোরআন হাদীসে উল্লেখিত ফেরেশতাদের বর্ণনা মিলে যায়। মেয়েটির মা কি মারা গেছে? কিন্তু সে বলছে সে তার মায়ের সাথেই থাকে, এর মানে কী? তবে এটাও মনে রাখতে হবে, মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ। মৃত মায়ের শোক কাটিয়ে উঠতে না পেরে হয়তো সে নিজেকে মায়ের সাথে কবরেই কল্পনা করছে। হয়তো সে শুনেছে কবরে ফেরেশতারা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কাজেই সে কবরের কল্পনার সাথে এটাকে সংযোজন করেছে। কিন্তু সে একাকী শালবনে ঘুরছিল কেন? খুব কম মানসিক রোগীই নিজেকে অসুস্থ বলে সহজে স্বীকার করতে চায়। এমন কিন্নর কণ্ঠের একটি মেয়ে হিংস্র পশুর মত গজরায় কেমন করে? লম্বা শ্বাস নিলেন ডা. রহমান। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়েছে। বরফশীতল বাতাস যেন তীক্ষ্ণধার খঞ্জরের মতই নাক চিরে ঢুকে গেল মস্তিষ্কে আর বেরিয়ে এল গরম হয়ে।

'সার।' নার্স রিনার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বাস্তবে ফিরলেন ডা. রহমান। নিশ্চয়ই কোন রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা কারও পাগলামির প্রকোপ বেড়েছে। পেছন ফিরে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'পেশেণ্ট পালিয়েছে।'

'কোন পেশেণ্ট?'

'আজ যে ভর্তি হয়েছে।'

'তরী?'

'জ্বি, স্যর।'

কে যেন এক চাঙর বরফ ডা. রহমানের ঘাড় থেকে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘসে দিল। একি কাকতালীয় ঘটনা? নাকি মেয়েটি তার কথা রাখল?

'শিকলে ঠিকমত তালা দাওনি?'

'দিয়েছিলাম স্যর। শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে।'

'এমন মজবুত শিকল ওইটুকু একটা মেয়ে ছেঁড়ে কী করে?'

'বিশ্বাস না হলে আপনি এসে দেখুন, স্যর।'

অস্থির পায়ে তরীর কেবিনে ছুটে এলেন ডা. রহমান। রিনার কথা নির্ভুল। ভাঙা শিকলটা খাটের রডের সঙ্গে লাজুক ভঙ্গিতে ঝুলছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, দায়িত্ব পালন করতে না পারার লজ্জায় তারা অতিশয় লজ্জিত। সন্ধ্যায় একবার তরীর দৈহিক শক্তির নমুনা পেয়েছিলেন ডা. রহমান। কিন্তু লোহার শিকল ছেঁড়ার মত গায়ের জোর এই মেয়ের থাকতে পারে, এ তো অকল্পনীয়।

'দৌড় দাও।' চেঁচিয়ে উঠলেন ডা. রহমান। 'ইণ্টারকমে দারোয়ানকে ফোন করো। হুঁশিয়ার থাকতে বলো। তরী যেন কম্পাউণ্ডের বাইরে যেতে না পারে। বাইরে গিয়ে কোন অঘটন ঘটালে কেলেংকারি হয়ে যাবে। জলদি যাও।'

রিনা তৎক্ষণাৎ ছুটল।

সিতারার কেবিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন ডা. রহমান। দরজার নীচ থেকে এক ধরনের ঘন তরল পদার্থ চুইয়ে বেরিয়ে আসছে। ডা. রহমানের বুঝতে খানিকটা সময় লাগল যে, জিনিসটা রক্ত। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে কেবিনে ঢুকলেন তিনি।

সিতারা বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ঝুলছে বিছানার বাইরে। মুখটা হাঁ করা। বিস্ফারিত চোখদুটো দেখে মনে হতে পারে, অবশেষে সে ইবলিশ দর্শন করেই ফেলেছে। মেঝে ভর্তি রক্তের উৎস সিতারার মাথা। মাথার তালুতে দু'ইঞ্চি ব্যাসের একটি ছিদ্র, রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়ে চুইয়ে বেরিয়ে এসেছে হলদেটে মগজ। তরীর কাজ সন্দেহ নেই। সে বলেছিল তাকে

ছেড়ে না দিলে সে সবাইকে মারবে। সিতারার কথাই সত্যি হলো।

লাশ শেষ পর্যন্ত পড়ল।

পাঁচ

তরীর কাছে অস্ত্র আছে।

হতে পারে ধারালো একটি ছুরি কিংবা বাটালি, যা দিয়ে মানুষের তালুতে গোলাকারভাবে ফুটো করে দেয়া যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, তরী এই অস্ত্র পেল কোত্থেকে? হাসপাতালে রোগীদের নাগালে কোন হাতিয়ার রাখার প্রশ্নই আসে না। তবে কি সিতারার কথাই সত্যি? তরী কি আসলেই কোন বালাই, যে কিনা পশুর মত গজরায়, যার গায়ে পাশবিক শক্তি, যে শেকল রেতি দিয়ে কাটলেও আধা ঘণ্টা সময় লাগে, সেই শেকল সে একটানে ছিঁড়ে ফেলতে পারে? কে সে? সে কী? কী চায়? ডা. রহমান তাঁর প্রত্যেকটি রোমকূপ দিয়ে বদ্ধ হাসপাতালে এক পাশবিক শক্তির অশুভ অস্তিত্ব অনুভব করলেন, যে কিনা এক পাগলিনীর বেশ ধরে তীক্ষ্ণধার একটি অস্ত্র নিয়ে উন্মত্ত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তপিপাসা মেটাতে। যার কোন যুক্তিবোধ নেই, নিজের পৈশাচিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হয় না। কেউ একটু অসতর্ক হলেই সর্বনাশ, মাথার তালু দিয়ে চুইয়ে বেরিয়ে আসবে মগজ।

নিজের ঘরে এসে ড্রয়ার খুলে রিভলবারটা বের করলেন ডা.

রহমান। তাঁর চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় একবার একজন রোগী আত্মহত্যা করেছিল। রোগীর আত্মীয়-স্বজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পেছনে ভাড়াটে খুনী লেলিয়ে দিয়েছিল। আত্মরক্ষার্থে তখন তাঁকে অস্ত্রের লাইসেন্স করতে হয়। তবে রিভলবারটা ব্যবহার করার প্রয়োজন তাঁর আজ অবধি হয়নি। আজও হয় কিনা কে জানে? হয়তো আজকের জন্যই নিয়তি তাঁকে দিয়ে এটা কিনিয়েছিল। ম্যাগ্যাজিনে গুলি ভরে রিভলবারটা লোড করলেন তিনি। হাতের মুঠোয় শক্ত করে সেটাকে চেপে ধরে মনে একটু জোর পেলেন ডা. রহমান। একটা সিগারেট ধরালেন।

দরজায় শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালেন ডা. রহমান। রিভলবারটা তাক করলেন শব্দের উৎস লক্ষ্য করে। না, তরী নয়, রিনা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। 'দারোয়ানকে ফোন করেছ?' প্রশ্ন করলেন ডা. রহমান। রিনা কোন জবাব দিল না। ডা. রহমান লক্ষ করলেন, রিনার ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। তার চোখ দেখে একটু আগে দেখা সিতারার বিস্ফারিত চোখদুটো মনে পড়ল তাঁর।

'কী হয়েছে রিনা?' বলেই ডা. রহমান দেখলেন রিনার মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে সিঁথি বেয়ে গাঢ় লাল রক্তধারা গড়িয়ে আসছে হিমালয় থেকে নেমে আসা কোন সদ্যসৃষ্ট নদীর মত। কপাল বেয়ে নাকের ডগায় এসে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা রক্ত মেঝেতে পড়ল। ডা. রহমান কিছু বুঝে ওঠার আগেই উপুড় হয়ে পড়ে গেল রিনা। সেই ধাক্কায় হলদেটে একটা দলা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তার মাথার তালুতে একটা ছিদ্র। আর হলদে জিনিসটা তার মগজ। ছুটে গিয়ে রিনাকে চিৎ করলেন ডা. রহমান। ওর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন। কিছু একটা বলতে চাইল রিনা, ব্যর্থ চেষ্টা। গুছিয়ে কথা বলতে হলে ঘিলু দরকার, যার

অনেকটাই রিনা হারিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরই চিরতরে চলে গেল রিনা, সেই দেশে যেখানকার কথা তরী বলেছিল। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল ডা. রহমানের। তাঁর এদেশে আপন কেউ নেই। এই মেয়েটিকে তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসতেন, মেয়েটি তা কোনদিন জানতেও পারল না। তিনি জানেন, মেয়েটির বাবা মা নেই, মামার কাছে মানুষ হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এই পর্যন্ত এসেছিল সে। মামা মামী খুব একটা যত্ন করত না হিরের টুকরো এই মেয়েটিকে। অবশেষে এই হাসপাতালে চাকরিটা নিয়ে এখানেই থাকা শুরু করল। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার ভালবাসার মানুষটিরই সাথে। আর কোন জায়গা না থাকায় হাসপাতালেরই একটি কক্ষে বিয়েটা হবে ঠিক হয়েছিল। ডা. রহমান ঠিক করেছিলেন, বিয়ের দিনই. তিনি রিনাকে তাঁর পিতৃস্নেহের কথাটা জানাবেন আর তাকে বিয়েতে উপহার দেবেন একটি সোনার টিকলি। হায় নিয়তি, রক্তের টিকলি মাথায় নিয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল তাঁর মেয়ে। নিয়তি মানুষকে নিয়ে নানান খেলা খেলে। জীবনটাকে ফুটবল বানিয়ে নিয়তি মাঝে মাঝে ফ্রি কিক দেয়। কখনও বল জালে ঢোকে, কখনও বা ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায় সীমানার বাইরে।

ডা. রহমান স্পষ্ট টের পেলেন তাঁর মুখের চামড়া তিরতির করে কাঁপছে, শরীরের রক্ত কুলকুল করে উঠে আসছে মাথার দিকে। তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছে করতে লাগল, রিভলবারটা নিয়ে পুরো হাসপাতালে চক্কর দেন আর দুমদাম এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়েন। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিজেকে একটু ধাতস্ত হবার সময় দিলেন ডা. রহমান। তারপর থানায় একটা ফোন করে ফোর্স পাঠাতে বললেন। থানা এখান

থেকে বহুদূরে। মাঝখানে একটা নদী আছে। আজ রাতের মধ্যে আসতে পারবে কিনা কে জানে। দ্বিতীয় ফোনটা তিনি করলেন সিকিউরিটি গার্ড দু'জনকে। গেটে ভাল করে তালা মেরে দু'জনকেই উপরে আসতে বললেন। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনঘন টান দিতে লাগলেন।

গার্ড দু'জন এসে সালাম ঠুকল। ডা. রহমান বললেন, 'তোমার নাম তো আনোয়ার, আর তোমার সাইদুর?'

'জ্বি, ছার।'

'তোমাদের অস্ত্র আছে না?'

'আছে ছার, এই যে রাইফেল।'

'গুড। শোনো, আজ রাতে তোমাদের কাজ হচ্ছে পুরো হাসপাতাল টইল দেবে, আর তরীকে চেনো? আজ ভর্তি হয়েছে?'

'চিনি ছার।'

'ওকে দেখা মাত্র গুলি করবে।'

'ছার!'

ডা. রহমান এগিয়ে এসে সাইদুরের কপালের মাঝখানে নিজের তর্জনীটা ঠেসে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'এইখানে গুলি করবে, এইখানে। পুরো ম্যাগাজিন খালি করবে। নইলে ওই মেয়ে তোমাদের দু'জনেরও ওই হাল করবে।'

রিনার লাশ দেখে শিউরে উঠল গার্ড দু'জন।

'লাশটা মর্গে নিয়ে যাও। নয় নাম্বার কেবিনে আরেকটা লাশ আছে দেখো। তারপর যা বললাম তাই করো।'

খবরটা জিন্নাত আলীকে জানানো দায়িত্ব মনে করলেন ডা. রহমান।

জিন্নাত আলী ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বপ্নের হাসপাতালে এরকম রক্তারক্তি তাঁকে প্রচণ্ড

আহত করেছে। না দেখেও ডা. রহমান বুঝতে পারছিলেন, ফোনের ওপাশে জিন্নাত আলীর হাসিখুশি মুখটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, 'আমি আসছি ডা. রহমান।'

ডা. রহমান বললেন, 'সেটা ঠিক হবে না স্যর। তরী মেয়েটা আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে এবং তার হাতে মারাত্মক একটি অস্ত্র। আর সে কোন সাধারণ মেয়ে নয় স্যর। তাঁর গায়ে পাশবিক শক্তি।'

'তবুও আমি আসব ডা. রহমান। আমাকে না পেয়ে সে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে, এ আমি মেনে নিতে পারব না। আমি এমন কোন মহৎ ব্যক্তি নই যে আমার জন্য আপনারা জীবন উৎসর্গ করবেন। আমাকে পেলে যদি অন্যদেরকে সে রেহাই দেয়, সেই ভাল।'

'কিন্তু, স্যর...'

'আমি আর কদ্দিন ডা. রহমান? বুড়ো হয়েছি, আপনার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড় হব। আমার স্ত্রী ছাড়া আমার আর কেউই ছিল না, সে চলে গেছে, নানান রকম দুষ্ট ব্যাধির আক্রমণে একেবারে শেষ হয়ে গেছি। হাসপাতালটাকে আপনারাই তো এগিয়ে নেবেন। হাসপাতালের কোন বদনাম হলে এটা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আমার স্বপ্নও বরবাদ হয়ে যাবে সেই সাথে। আর মেয়েটা আমাকে কী করে চেনে, কেনই বা আমার উপর এত আক্রোশ ওর, সেটাও আমি জানতে চাই।'

ভ্রু কুঁচকে ফোন রাখলেন ডা. রহমান। জিন্নাত আলীর মত ডাকসাইটে একজন শিল্পপতি যদি এই হাসপাতালে এসে খুন হয়ে যান, হাসপাতাল বন্ধ তো হবেই, সব স্টাফকে কাঠগড়ায় উঠতে হবে। আর ঘটনার যে নায়িকা, সে বিলকুল খালাস পেয়ে যাবে।

পাগলের কোন বিচার হয় না। রোগীকে সঠিক ভাবে চিকিৎসা বা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার অপরাধে সকল ডাক্তার এবং নার্সের সশ্রম কারাদণ্ড এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হওয়াতে খুনীকে সসম্মানে পাঠিয়ে দেয়া হবে কোন মেন্টাল হোমে। ব্যস, মামলা ডিসমিস, আসামী খালাস।

রাত সবে দেড়টা। এখনও পুরো রাতই বলতে গেলে পড়ে রয়েছে। বাইরের ওই নিরেট অন্ধকারের সাথে ভেতরের জেনারেটরের উজ্জ্বল আলোর বিশেষ কোন তফাৎ খুঁজে পেলেন না ডা. রহমান। আলো থাকা মানেই আলোকিত হওয়া নয়। বাইরের অন্ধকার শীতজর্জর আর ভেতরের অন্ধকার অভিশপ্ত। পাশবিক এক অমানিশা আজ মানব কল্যাণে নির্মিত এই মহৎ প্রতিষ্ঠানে।

ছুটে ঘরে ঢুকল আনোয়ার। চিতাবাঘে তাড়া করা কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে সে। চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, রাইফেলের বাঁটে হাতদুটো এত শক্ত হয়ে চেপে বসেছে, যে শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

'কী হয়েছে আনোয়ার?' কাঁপা গলায় বললেন ডা. রহমান, 'সাইদুর কোথায়?'

'সাইদুররে মাইরা ফালাইছে ছার।' অপ্রকৃতিস্থের মত বলল আনোয়ার, 'আমার বন্ধুরে মাইরা ফালাইছে।'

'কে? তরী?'

'হ, ছার।'

'তুমি ওকে দেখেছ?'

'দেখছি, ছার। ও মানুষ না, ছার।'

'সাইদুরকে কীভাবে মেরেছে?'

'গাঁইতি দিয়া, ছার।'

'গাঁইতি পেল কোথায় ও?'

'ও মানুষ না, ছার।'

'কী বলছ?'

'শয়তান ছার, সাক্ষাৎ শয়তান।'

'এদিকে এসো আনোয়ার। শান্ত হয়ে বসো। নাও, পানি খাও। হ্যাঁ, এখন বলো কী হয়েছিল।'

'সাইদুর আর আমি টহল দিতেছিলাম। আশপাশে কেউ আছিল না, ছার। সব রোগীর ঘরে তালা মাইরা দিছি। আচানক দেহি পনর হাত সামনে মাইয়াডা খাড়ায়া রইছে। আমগোরে দেইখাই কইল, 'জিন্নাত আলী কই?' আমরা আপনের কথামত রাইফেল তাক করতে নিলাম, তার আগেই ও আমাগো একহাত সামনে আইসা খাড়াইল। গাঁইতি দিয়া এক কোপ মারল সাইদুরের মাথায়। আমি পলাইয়া আইছি। আপনেই কন ছার, কোন মাইনষের বাচ্চা এক সেকেণ্ডে পনর হাত আগাইয়া আসতে পারে? মানুষ না, ছার, মানুষ না। হাসপাতালে পিচাশ ঢুকছে। আমি যাই ছার।'

'কোথায়?'

'অরে আমি ছাড়মু না, ছার। সাইদুররে মাইরা ফালাইছে। আমার ভাইয়ের মত আছিল সে। ওই মাগী শয়তানরে আমি ছাড়মু না। যাই ছার, যদি বাঁইচা না ফিরি, আমার লাশটা গেরামে পাঠায়া দিয়েন আর বেতনডা আমার মায়রে দিয়েন।'

ডা. রহমান কিছু বলার আগেই আনোয়ার রাইফেল হাতে গুলি খাওয়া ক্ষিপ্ত বাঘের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে বন্ধুকে খুন হতে দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে মনুমেন্টের মত দাঁড়িয়ে রইলেন ডা. রহমান। এমন অশুভ পৈশাচিক রাত তাঁর জীবনে কখনও

আসেনি। সিতারা বলেছিল, 'সয়লাব।'

সেই সয়লাবের ভয়াল পদধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ডা. রহমান।

ছয়

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন ডা. রহমান।

ছুটে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। কার্তুজের বাক্স থেকে দু'মুঠো গুলি নিয়ে অ্যাপ্রনের পকেটে ভরলেন। রিভলবারটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অতি সন্তর্পণে বেরোলেন কেবিন থেকে। তিনি কাপুরুষের মত ঘরে বসে থাকবেন আর বাইরে একটার পর একটা খুন হতে থাকবে, এ হতে পারে না। যে বালাই তিনি যেচে হাসপাতালে ঢুকিয়েছেন, তার শেষও তিনি দেখে ছাড়বেন।

অত্যন্ত সন্তর্পণে হাসপাতালের নির্জন প্যাসেজ ধরে এগোতে লাগলেন তিনি। রিভলবার হাতের মুঠোয়, দৃষ্টি সম্মুখে, কান খরগোশের মত সতর্ক। ডেসিবেল মাত্রায় অতি সূক্ষ্ম শব্দও কান এড়াবে না তাঁর। কিন্তু যদি আনোয়ারের কথাই সত্যি হয়? যদি সত্যিই মেয়েটি অতিমানবীয় কেউ হয়? সত্যিই যদি তার গতি হয় বিদ্যুতের মত? রিভলবারটা তাক করার সময়ও কি পাবেন তিনি? পরক্ষণেই এই চিন্তা বাতিল করে দিলেন ডা. রহমান। বন্ধুর মৃত্যুশোকে আনোয়ারের নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে। তরী মোটেই এক সেকেণ্ডে পনেরো হাত এগিয়ে আসেনি। সে এসেছে

নিঃশব্দে। একেবারে কাছে এসে দাঁড়ানোর পর ওরা টের পেয়েছে যখন আর কিছুই করার ছিল না। মানুষ কখনও একটি মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তরী মানসিক বিকারগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ একটি মেয়ে। আর তার পাগলামি বন্ধ করতে যথাসময়ে এবং যথাস্থানে একটি গুলিই যথেষ্ট।

সিতারার ঘরের সামনে এসে এই অস্থির সময়ের মধ্যেও নস্টালজিয়া অনুভব করলেন ডা. রহমান। শয়তানের পূজারী হয়েও এই বৃদ্ধা কখনও কারও ক্ষতি করেননি। আর তরী? আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ এই মেয়েটি কী তাণ্ডবই না শুরু করেছে। আগে এই ঘরের সামনে এলেই সিতারা 'কে? ডাক্তার না? ভেতরে এসো।' বলে ডাক দিত। তখন মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেও আজ তিনি অনুভব করলেন, সেই ডাকে মমতা মিশানো ছিল। কী অদ্ভুত এই জগৎ! মানুষ চলে যায়, তবু তার মমতা রয়ে যায়।

'ডাক্তার নি? ভেতরে আসো। তোমার লগে কথা আছে।'

কে কথা বলে! সিতারা নাকি! ডা. রহমানের হৃৎপিণ্ডটা যেন কণ্ঠনালী বেয়ে উঠে এসে আলজিহ্বার সাথে সখ্য গড়তে চাইল। এটা যে সিতারার গলা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রতিদিন চার পাঁচবার শুনতে শুনতে এই কণ্ঠ তাঁর মর্মে গেঁথে গেছে। কিন্তু এ কী করে সম্ভব? সিতারা তো এখন অতীত। অতীত কি ফিরে আসতে পারে? অতীত কি বর্তমানের আকৃতি পেতে পারে? অতীত কি তরল পদার্থ? নাকি টাইম ডাইমেনশনের কোন সমস্যা হয়েছে? অদ্ভুত কোন উপায়ে কি প্রকৃতি অতীতকে তাঁর সামনে হাজির করেছে? ভয়কে এড়িয়ে যেতে শেখেননি ডা. রহমান। কাজেই লম্বা একটা দম নিয়ে এক ধাক্কায় কেবিনের দরজাটা খুলে ঢুকে পড়লেন তিনি, তাঁর হাতের রিভলবারটা শিকারী কুকুরের

মত উন্মুখ।

ঘর খাঁ খাঁ করছে। কোন প্রাণীর চিহ্নও নেই। ডা. রহমান বুঝতে পারলেন তাঁর হ্যালুসিনেশন হয়েছে, অডিটরি হ্যালুসিনেশন। এককোণে আলনায় সিতারার কয়েকটি শাড়ি ঝুলছে তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। সিতারার শরীর থেকে কর্পূরের মত একরকম গন্ধ বেরোত। কেবিনের বদ্ধ হাওয়ায় সেই গন্ধটা ঘুরপাক খাচ্ছে এখনও। কেমন যেন হয়ে গেলেন ডা. রহমান। সিতারার বেডে বসে বিছানার চাদরে হাত বোলালেন তিনি। হঠাৎ কী যেন হাতে ঠেকল তাঁর। জিনিসটা হাতে নিয়ে তিনি দেখলেন, একটা বহু পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া অচল পয়সা। কোনটা হেড, কোনটা টেল এখন আর বোঝার উপায় নেই। শয়তান পূজার কোন অংশ কিনা কে জানে। জিনিসটা তিনি পকেটে ভরলেন, থাক তাঁর কাছে সিতারার একটুকরো স্মৃতি। কেন যেন তাঁর মনে হলো এই হাসপাতালে সিতারাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপন। নিতান্ত মূর্খ একজন মহিলা, যে কিনা একজন ভণ্ড সাধুর প্ররোচনায় শয়তানের পূজা করতে করতে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল। অশিক্ষিত এই গ্রাম্য নারীর অন্তরে লুকায়িত ছিল গভীর মমতা। নিজের অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর কী ভরসাই না ছিল তার! হায় অশিক্ষা! মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সিতারা তাঁকে বলেছিল, 'ডাক্তার, শয়তানের পূজা আর না। আমি মানুষ, মুসলমান, আল্লাই আমার সব। এহন থেইকা ভাল জিনিসের পূজা করুম। ক্ষমতা যেডুক পাইছি, মাইনষের উবগার করতে না পারি, ক্ষতি করুম না। তয় শয়তানে আমারে ছাড়ব কিনা জানি না। তারে ছাড়ছি জানলে সে আমারে মাইরা ফালাইবো।'

ভাবনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন ডা. রহমান। চোখের সামনে যেন এখনও সিতারার হাসিখুশি মুখটা দেখতে পাচ্ছেন।

তার হাসির সাথে তার অন্ধ চোখদুটোও হাসত। কোন কথা বলার আগে গন্ধ নিয়ে দেখে নিত কেউ আড়ি পেতে আছে কিনা। এসব ভাবতে ভাবতে ক্রমশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন ডা. রহমান। হঠাৎই যেন তাঁর কানে ভেসে এল সিতারার কণ্ঠ. 'ডাক্তার।'

ডা. রহমান সচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন কিন্তু শূন্যতা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না।

'ডাক্তার।' আবারও সেই কণ্ঠ। ডাক্তার রহমান উঠে দাঁড়ালেন। বহুদূরের অন্য কোন জগৎ থেকে যেন ইথারের মাধ্যমে ভেসে আসছে সিতারার কথা।

'কে?' ডাক্তার রহমানের গলা একটু না কেঁপে পারল না।

এবার পুরোপুরি স্পষ্ট শোনা গেল, 'পালাও ডাক্তার, পালাও।' ডা. রহমানের মনে হলো দু'হাত সামনেই বিছানায় বসে আছে সিতারা, হাত বাড়ালেই বুঝিবা স্পর্শ করা যাবে।

'পালাও ডাক্তার। সে তোমার আশপাশেই আছে। এইদিকেই আইতাছে সে। সে জানে তুমি এইখানে আছ। দৌড়াও।'

'সিতারা, কোথায় আপনি?'

'পালাও... পালাও...ডাক্তার...'

ক্ষীণ হতে হতে সিতারার কণ্ঠ আবার সেই দূর জগতে মিলিয়ে গেল। তখনি খট করে বাইরে একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো, জজ সাহেব তাঁর হাতুড়ি দিয়ে টেবিল ঠুকে 'অর্ডার' বললেন। খসখস করে একটা শব্দ হলো। তারপরই শোনা গেল কারও পায়ের শব্দ। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাঁটছে সে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। অপার্থিব এক আতঙ্কে ডা. রহমানের কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল। এমন ভয় তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে কখনও পাননি। রিভলবারটা সোজা দরজার দিকে তাক করলেন তিনি। ডান হাতের তর্জনীটা ট্রিগারে। পায়ের শব্দ যতই এগিয়ে আসছে

ট্রিগারে তর্জনীর চাপ ততই বাড়ছে। কেবিনের বদ্ধ দরজার ঠিক সামনে এসে থেমে গেল পা দুটো। লম্বা একটা শ্বাস নিল ও দুটোর মালিক। এক মুহূর্ত। নিস্তব্ধতা। তারপরই বিকট শব্দে দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল।

'আস্তে!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডা. রহমান।

সাত

'ছার, আপনে?'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ডা. রহমানের, 'দিয়েছিলে আরেকটু হলে সাবাড় করে। আমি আগে তোমাকে চিনতে পেরেছি বলে রক্ষা। নয়তো হয় আমি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতাম, নয় তুমি।' ধপাস করে বিছানায় বসে পড়লেন তিনি।

'আমি তো কথাবার্তা শুইনা ভাবছি ওই হারামজাদী।' আনোয়ারও রাইফেলটা ঘাড়ে ফেলে মেঝেতে বসে পড়ল।

ডা. রহমান অ্যাপ্রনের হাতায় মুখ মুছে বললেন, 'কথা আমিই বলছিলাম।'

আনোয়ার হাসল, 'ছার বুঝি বয়েসকালে অ্যাক্টিং করতেন?'

অবাক হয়ে তাকালেন ডা. রহমান, 'এরকম কেন মনে হলো তোমার? আমি কি যাত্রাপালার বিবেকের মত ডায়লগ দিচ্ছিলাম নাকি?'

'না ছার। যেমনে আপনে দুইজনের পার্ট একলাই করলেন...'

'মানে?'

'একবার ব্যাডা মাইনষের গলায় আরেকবার বেডির গলায় কথা কইলেন।'

'তুমিও তা হলে শুনেছ?' ডা. রহমানের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল।

'জ্বে ছার, শুনছি তো।'

মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা লাগছে ডা. রহমানের। সিতারার কণ্ঠ তা হলে হ্যালুসিনেশন ছিল না? একসঙ্গে দু'জন মানুষের কি শ্রুতিবিভ্রম হতে পারে?

'আনোয়ার।'

'জ্বে ছার।'

'আমার চেম্বারে চলো। পানি খাওয়া দরকার। তারপর ঠিক করব এখন আমরা কী করব।'

'চলেন ছার।'

চেম্বারে এসে ফ্যানটা ফুলস্পীডে ছেড়ে দিলেন ডা. রহমান। ফিল্টার থেকে ক'গ্লাস পানি খেলেন তার হিসাব করতে ক্যালকুলেটর লাগবে। আনোয়ারের অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। শরীরটা জুড়িয়ে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলে ডা. রহমান বললেন, 'দরজাটা লক করে দাও আনোয়ার।'

এই অত্যন্ত জরুরী কাজটা আনোয়ারও ভুলে গিয়েছিল। বাইরে মানসিক বিকারগ্রস্ত একটি মেয়ে গাঁইতি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ পরিস্থিতিতে দরজা খোলা রাখাটা মারাত্মক অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হবার কথা। কাজেই দ্রুত দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে এল আনোয়ার।

একটা সিগারেট ধরালেন ডা. রহমান, দীর্ঘ টান দিলেন। হুড়মুড়িয়ে একরাশ নিকোটিন ঢুকে গেল মস্তিষ্কের কোষগুলোতে। সাথে সাথে তাঁর মনে হলো, হতে পারে। দু'জন মানুষের একই

সঙ্গে হ্যালুসিনেশন হতে পারে যদি দু'জনের মানসিক অবস্থা একই স্তরে থাকে। এই মুহূর্তে রিভলভিং চেয়ারে বসে ডা. রহমান যা ভাবছেন এবং আশঙ্কা করছেন, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা আনোয়ারও তাই।

'আনোয়ার।'

'ছার।'

'চলো বেরোই।'

'কোথায় ছার?'

'ঘরে বসে থেকে লাভ কী? বাইরে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয় করে কী হবে? রিনা, সিতারা আর সাইদুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে না?'

সাইদুরের কথা বলতেই সোজা হয়ে গেল আনোয়ার, 'অবশ্যই হবে ছার। চলেন।'

'তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। আমি সামনের দিকটা সামলাব। তুমি পেছনটা কাভার করবে।'

'জ্বে ছার।'

'চলো তবে।'

দরজা জানালা বন্ধ থাকায় হাসপাতালের অভ্যন্তরে কোন হাওয়া চলাচল করছে না। বাতাস স্থির মৃত মানুষের নিঃশ্বাসের মত, চারদিকে কবরের স্তব্ধতা। সেই স্থির বাতাসে শুধু ন্যূনতম তরঙ্গ তুলছে দু'জন মানুষের নিঃশব্দ প্রায় নিঃশ্বাস। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলছে দু'জনেই। উদ্দেশ্য, পুরো হাসপাতালে চক্কর দেয়া এবং তরীর অবস্থান সনাক্ত করা।

হাঁটতে হাঁটতে আবারও সিতারার ঘরের সামনে এসে পড়ল দু'জনে। আবারও কি ডাকবে সিতারা? ডা. রহমান মনে প্রাণে

চাইলেন, ডাকুক। সত্যিই হ্যালুসিনেশন কিনা তিনি দেখতে চান। এই হাসপাতালকে ঘিরে একটা কিংবদন্তী রচনা হয়ে আশপাশের গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরুক তিনি চান না।

'ডাক্তার নি? ভেতরে আস। কথা আছে।'

আনোয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে ডা. রহমান বুঝতে পারলেন সেও ডাক শুনেছে। মাছের পেটের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। ডা. রহমান প্রায় নিঃশব্দে বললেন, 'আমি ভেতরে গিয়ে দেখছি। তুমি বাইরে নজর রেখো।'

'যাইয়েন না ছার। ওই ডাইনী হইতে পারে।'

'আমরা তো তাকেই খুঁজছি, তাই না?'

'আমিও আসি ছার আপনার সাথে। একলা যাওন ঠিক হইবো না।'

'না। সবদিকেই সমান নজর রাখা প্রয়োজন।'

ডা. রহমান খতিয়ে দেখতে চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা আসলেই হ্যালুসিনেশন কিনা। আর যদি সত্যিই সিতারা মরণের ওপার থেকে তাঁর সাথে কথা বলে থাকে, তবে হয়তো তরীর ব্যাপারে আরও কিছু জানা যাবে।

দরজা ঠেলে সিতারার কেবিনে ঢুকে পড়লেন তিনি। যথারীতি ঘর ফাঁকা। কোন কথাও আর শোনা যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটাই যে একটা হ্যালুসিনেশন ছিল, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না তাঁর। সিতারার ব্যাপারে সবারই একটা আগ্রহ ছিল। কেউ ঘরের সামনে দিয়ে বিড়াল পায়ে হেঁটে গেলেও টের পেত সে। ডাক দিত সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই এই ঘরের সামনে আসা মাত্র মনে হচ্ছে সিতারা ডাকছে। আর এই শ্রুতিবিভ্রমে ইন্ধন যোগাচ্ছে আজকের ভয়াবহ রাতটা। ছোট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডা. রহমান। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তাঁর যুক্তিবোধ নষ্ট হয়ে

যায়নি ভেবে একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করলেন।

দড়াম করে একটা শব্দ হলো পেছনে। চমকে পেছনে তাকালেন ডা. রহমান। দেখলেন কেবিনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি ঘাড় ঘোরালেন এবং সিতারার বেডের ওপাশে তরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আলুথালু চুল, সুন্দর মুখখানাতে পৈশাচিক দৃষ্টি। রূপসী পিশাচিনীর মত দেখাচ্ছে তাকে। হাতে তীক্ষ্ণধার গাঁইতিটা উঁচু করে ধরা। ধোঁকা! সিতারার কণ্ঠ নকল করে তাঁকে ডেকে এনেছে এই মেয়ে! এমন বুদ্ধিমতী মানসিক রোগী তিনি আজ অবধি দেখেননি।

'জিন্নাত আলী কই?'

একি মানুষের কণ্ঠ! শকুন যদি কথা বলতে পারত, বোধহয় এরকমই শোনাত।

'জিন্নাত আলীরে আমার বড় দরকার। নইলে আমি বাঁচুম না। শুয়োরের বাচ্চা কই?'

'তরী।' ডা. রহমান শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'শান্ত হও। নিজের কেবিনে চলো। কাল সকালে তোমার কথা শুনব।'

এরপর ডা. রহমান যা দেখলেন, তা অবিশ্বাস্য। সাড়ে তিন হাত লম্বা খাটটা একলাফে পেরিয়ে এল তরী। ডা, রহমান কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলেন মেয়েটা তাঁর দেড় হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎ গতিতে মাথার উপর গাঁইতি তুলল সে।

ডা. রহমান রিভলবার তুললেন আলোর গতিতে। মাত্র ছ'ইঞ্চি দূর থেকে ডান চোখে ভারি বুলেটের আঘাতে ছিটকে বিছানায় পড়ল তরী। তারপর উল্টে পড়ে গেল বিছানার ওপাশে।

তখনি দরজা খুলে ছুটে এল আনোয়ার, 'কী হইছে ছার? দরজা বন্ধ করছে কে?'

আয়েশি ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরালেন ডা. রহমান,

'বেডের ওপাশে তরীর লাশ পড়ে আছে। এপাশে নিয়ে এসো।'

আনোয়ারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'মরছে মাগী?' খাটের ওপাশে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল. 'কই ছার? কিছুই তো নাই।'

ঠোঁট থেকে সিগারেট পড়ে গেল ডা. রহমানের। দৌড়ে গেলেন আনোয়ারের পাশে। খাটের নীচে উঁকি দিলেন, জানালা খুলে বাইরে দেখলেন, পুরো ঘর খানাতল্লাশ করলেন। নেই। নেই তো নেই।

গাঁইতি সহ বিলকুল উবে গেছে সদ্য গুলি খেয়ে উল্টে পড়া মেয়েটা।

এই প্রথম ডা. রহমান উপলব্ধি করলেন, হাসপাতালে অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটছে। খুব কাছে থেকে যদি কারও চোখে গুলি করা হয়, চোখ গেলে দিয়ে একদলা ঘিলু সহ মাথার পেছনের অংশটা চৌচির করে বুলেটের বেরিয়ে যাবার কথা এবং এরপরে এক সেকেণ্ডও জীবিত থাকা অসম্ভব। তরী মেয়েটা শুধু বেঁচেই নেই, একফোঁটা রক্তের চিহ্ন না রেখে বিলকুল হাপিস হয়ে গেছে। সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাটার কোন জাগতিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না ডা. রহমান। জাগতিক নিয়মে যা ঘটা অসম্ভব, সেরকম কোন ঘটনা যখন অবলীলায় ঘটে যায়, তখন তাকে আর জাগতিক বলা চলে না। সেটা তখন বহির্জাগতিক, মহাজাগতিক কিংবা হয়তো, কে জানে, অজাগতিক কিছু হয়ে ওঠে।

'কী ভাবেন, ছার? আপনে কি অরে দেখছেন? গুলি করছিলেন?'

'মমম? মনে হয় ভুল দেখেছি। চলো হাসপাতালের বাকি অংশটা ঘুরে আসা যাক।'

মোটামুটি বেপরোয়া ভঙ্গিতে পুরো হাসপাতালে ঘুরে

বেড়ালেন দু'জনে। মৃত্যু যখন দেড় হাত সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন শুধু মানুষ কেন, বিড়ালের মত নিতান্ত নিরীহ কোন প্রাণীও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু নিষ্ফল। তরীর চিহ্নও আর দেখা গেল না।

'আনোয়ার।' স্টোর রুমে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন ডা. রহমান, 'কোথাও তো নেই। কোন জায়গাই তো খুঁজতে বাকি নেই।'

'আছে ছার।'

সামান্য বিস্মিত হয়ে তাকালেন ডা. রহমান, 'কোথায়?'

'লাশকাটা ঘর!!!'

আট

মর্গের দরজাটা খুলে গেল মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে।

হাসপাতালটা উদ্বোধন হবার পর থেকে আজ অবধি কোন লাশ এখানে প্রবেশ করেনি। আজই প্রথম এঘরে মৃতদেহ প্রবেশ করল, তাও একসঙ্গে তিনটি। ঘরের দেয়ালজুড়ে অসংখ্য স্টীলের ড্রয়ার। এরই মধ্যে যে কোন তিনটিতে শুয়ে আছে রিনা, সিতারা এবং সাইদুর। একসময় ডা. রহমানের মনে হত, মানসিক হাসপাতালে লাশকাটা ঘরের প্রয়োজন কী? এখানে অপঘাতে মারা যাওয়া রোগীর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, প্রয়োজন আছে। মেন্টাল হোমে খুব বেশি রোগী অপঘাতে মারা যায় না সত্যি, কিন্তু একদিনে আবার তিনজনও মারা যেতে পারে।

সবকিছুরই স্থান-কাল-পাত্র আছে, মৃত্যুর কোন স্থান-কাল-পাত্র নেই। এই যে তিনি আনোয়ারকে নিয়ে এই ঘরে ঢুকলেন, জীবিত যে বেরোতে পারবেন, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? কোন ঘুপচিতে সেই রূপসী পিশাচিনী ঘাপটি মেরে থাবা গেড়ে বসে আছে, কে বলতে পারে? যে কোন মুহূর্তে মাথায় একটি ইঁদুরের গর্ত নিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারেন টাইলস দেয়া মেঝেতে।

যেহেতু এই ঘরে খুব ঘনঘন যাতায়াতের প্রয়োজন পড়ে না, কাজেই এখানে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হালকা কমলারঙের আলোয় স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে লাশকাটা ঘরটা। তবে, দুঃস্বপ্ন অবশ্যই। ঘরে কেউ আছে কিনা বোঝার জন্য তল্লাশি চালানোর কোন প্রয়োজন নেই। এখানে ভারি কোন আসবাবপত্র নেই যে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে হবে। ঘরের মাঝখানে শুধু দুটো টেবিল আছে মৃতদেহ সুরতহাল করার জন্য। তার তলাতেও কেউ বসে নেই। একমাত্র হতে পারে শতশত লাশ সংরক্ষণের ড্রয়ারগুলোর কোন একটিতে সে গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে পারে। তবে সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিলেন ডা. রহমান। ড্রয়ারগুলোতে অত্যন্ত মজবুত তালা মারা। শেকল ভাঙা হাত দিয়ে তৈরি এই তালা ভাঙতে পারবে না। শুধু এখানে নয়, এই হাসপাতালের প্রত্যেকটি ঘরের তালাই অত্যন্ত মজবুত। দরজা ভাঙলেও ভাঙা যেতে পারে, কিন্তু তালা ভেঙে ঘরে ঢোকা অসম্ভব। আনোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের প্রত্যেকটি ঘর তন্নতন্ন করে তল্লাশি করেছেন ডা. রহমান এবং তল্লাশি শেষে সবগুলো ঘর লক করে দিয়েছেন। বন্ধ করে দিয়েছেন সাউণ্ড প্রুফ সিস্টেম। কাজেই যে কোন শব্দই এখন কানে আসবে তাঁর। ভয় একটাই, সিতারার কেবিনে ঘটে যাওয়ার ঘটনাটা থেকে তরী মেয়েটির অদৃশ্য হবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হচ্ছে।

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ডা. রহমান। সতর্ক দৃষ্টি বোলালেন চারদিকে। আনোয়ারও একই রকম সতর্ক। যারা ধূমপায়ী, অস্বস্তিকর অথবা ভীতিকর কোন পরিস্থিতিতে এলে তাদের ধূমপানের তৃষ্ণা প্রবল হয়। কাজেই একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন ডা. রহমান। লক্ষ করলেন, আনোয়ার লোভাতুর চোখে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল।

'আনোয়ার।'

'ছার।'

'খাও নাকি?'

'মাঝে মধ্যে ছার।'

ডা. রহমান একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন তার দিকে। সাথে সাথে কান মলল আনোয়ার, 'জ্বে না ছার, জ্বে না ছার? আপনের সামনে আমি...'

'আরে খাও খাও, আমি তুমি বলে কিছু নেই। এখন শুধু আমরা।'

অত্যন্ত লাজুক ভঙ্গিতে সিগারেটটা ধরাল আনোয়ার। পরিস্থিতি যখন সবার জন্য সমান বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন উঁচু নিচু বলে কিছু থাকে না। সব মানুষ তখন এক কাতারে চলে আসে। মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া মুসল্লীরা প্রত্যেকেই জানেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন। তাঁদের সবার সামনে মহাবিপদ। একদিন প্রত্যেককেই দাঁড়াতে হবে সমান ভাবে সৃষ্টিকর্তার সামনে। হিসাব দিতে হবে কৃতকর্মের। কাজেই নামাজের সময় সবাই এককাতারে চলে আসেন।

মাথার উপর টং করে একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো ধাতব কিছু দিয়ে ছাদে হালকা টোকা দিচ্ছে কেউ। ঝট করে মাথা তুললেন ডা. রহমান। চোখ ছানাবড়া করে তিনি দেখলেন,

টিকটিকির মত ছাদের সাথে লেপ্টে রয়েছে তরী। মাথাটা একশ' আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। হালকা কমলা আলোয় তার চোখ দুটো জ্বলছে বিড়ালের মত। উল্টো হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের এককোণায় সরে গেল তরী। তারপর টিকটিকির মতই মাথা নীচের দিকে দিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে এল মাটিতে। আনোয়ার রাইফেল তাক করল, ডা. রহমান তাকে নিরস্ত করলেন। একে গুলি করে ফায়দা হবে না, আগেই বোঝা গেছে।

গাঁইতি তুলল তরী, 'জিন্নাত আলী কই?'

ডা. রহমান বললেন, 'জানি না।'

'তুই জানিস। আমারে ফাঁকি দিতে পারবি না। বল সে কই।'

'বলব না। না বললে কী করবি তুই?'

পশুর মতই গরগরিয়ে গর্জন করল মেয়েটা। বাতাসে উড়ে যেন একমুহূর্তে চলে এল ডা. রহমানের সামনে। আনোয়ার রাইফেল তোলার চেষ্টা করতেই বাঁ হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিল মেয়েটা। চার হাত দূরে ছিটকে পড়ল সে। গাঁইতি তুলে কোপ বসাল তরী। হতবিহ্বল ডা. রহমান কোন বাধা দিতে পারলেন না। তাঁর মাথার তালুর ইঞ্চি খানেক উপরে এসে থেমে গেল গাঁইতিটা। ক্রুদ্ধ গর্জন করে কয়েক হাত পিছিয়ে গেল তরী। ডা. রহমান কিছুই না বুঝে তাকিয়ে রইলেন। তরী বলল, 'এক শর্তে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি।'

'কী শর্ত?'

'তোর পকেটে যা আছে সব আমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

ডা. রহমান হতভম্ব হয়ে বললেন, 'তুমি টাকা পয়সা চাও, আগে বললেই হত। তিনজন মানুষকে মেরে ফেলার কী দরকার ছিল?'

'অত কথা শুনতে চাই না। পকেটে যা আছে দে। না হলে আরও লাশ পড়বে।' আনোয়ারের মাথা বরাবর গাঁইতিটা ধরল তরী।

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডা. রহমান। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। এই নে।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ, মোবাইল ফোন, সিতারার ঘরে পাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া পয়সাটা, রিভলবারের গুলি সবই নামিয়ে রাখলেন মাটিতে। রিভলবারটা রাখার আগে একটু দ্বিধা করলেন তিনি। এটা ছাড়া তিনি অসহায়। যদি হারামজাদী আবারও হামলা করে? আবার ভাবলেন, এটা দিয়েই বা তিনি করবেন কী? এর গুলিতে তো তরীর কিছুই হয় না। হাত থেকে ফেলে দিলেন তিনি রিভলবারটা।

পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল।

তরীর চোখে পৈশাচিক আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখলেন তিনি। ক্ষুধার্ত হায়েনার মত এক লাফে ডা. রহমানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তে গাঁইতিটা তুলল। ডা. রহমান প্রস্তুত হলেন মৃত্যুর জন্য। বেকুবের মত মৃত্যু। একজন মানসিক বিকারগ্রস্তের কথায় পকেটের সব বের করে দিয়েছেন তিনি। এমন মৃত্যু, যেখানে কলমা পড়ার সময়টুকুও পাওয়া যায় না। হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলেন তিনি। দেখলেন লাশ রাখার একটা ড্রয়ার সড়াৎ করে খুলে গেল। সেখান থেকে বের হয়ে বাতাসে ভেসে সিতারার দেহটা যেন সাইক্লোনের গতিতে চলে এল তরীর পেছনে। তরীর চুলের মুঠি ধরে টেনে পেছনে নিয়ে গেল সে। একপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ঘরের এক কোণে। দেয়ালে সজোরে বাড়ি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল তরী। গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল সেখানেই। তারপর ডা.

রহমানের দিকে তাকিয়ে কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে সিতারা বলল, 'ডাক্তার নি? আছ কেমুন। দুঃখু পাও নাই তো?'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন ডা. রহমান। কিছু বলার জন্য তার মুখটা বারকয়েক খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। বহুকষ্টে তিনি বলতে পারলেন, 'আপনি মরেননি?'

'হ। মইরা গেছি তো।' ঘাড় কাত করে কিন্নর কণ্ঠে বলল সিতারা, 'মেলা কষ্ট হইছে। মাথা ফুটা হইয়া ঘিলু বাইর হইয়া গেছে। ওই হারামজাদী মারছে আমারে। পয়সাডা একটু দূরে রাখছি আর মরছি।'

'কীসের পয়সা?'

'ওমা। পয়সার জোরেই তো বাঁইচা রইছ। পয়সাডা ফালাইছ বইলাইতো তোমারে আমার আইসা বাঁচাইতে হইল।'

'তো আপনি আবার জীবিত হলেন কী করে?'

'আমি জীবিত কেডা কইছে তোমারে? আমারে তো এহনো কবর দেওনাই। কবর না দিলে আল্লার কাছে যামু কেমনে? জলদি কবর দেও ভাই।'

'যারা মারা যায়, কবর দেয়ার আগে সবাই কি ফিরে আসে?'

সিতারা হাসল, শিশুর সারল্য মাখা হাসি, 'সবাই তো আমার মত শয়তানের পূজা কইরা ক্ষমতা পায় নাই। আল্লার আছে লাখ শুকরিয়া, শয়তানের থেইকা পাওয়া ক্ষমতা শয়তানের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে পারছি।'

'কে শয়তান?'

'ও আল্লা। কয় কী? এহনো বোঝ নাই?'

'তরী?'

'হ। শয়তানের চেলা। হারামজাদী তো বাঁইচা নাই। ফিরা আসছে আমার মতই। তোমারে কইছিলাম না, লাশে লাশ

ফালাইবো?'

'মানে?'

'আর কিছু কইতে পারুম না। নিজে বুইঝা লও গা। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারুম না। শক্তি ফুরাইয়া আসছে। মইরা গেলে শক্তি বেশিক্ষণ থাকে না।' আগের মতই বাতাসে ভেসে গিয়ে ড্রয়ারে ঢুকে পড়ল সিতারা। কিছুই না বুঝে দাঁড়িয়ে রইলেন ডা. রহমান। এমন সময় চোখের কোণে আরও একটি নড়াচড়া লক্ষ করলেন তিনি। ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তরীকে গাঁইতি সহ উঠে দাঁড়াতে দেখলেন। পৈশাচিক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তরী। ঝট করে পয়সাটা তুলে নিলেন ডা. রহমান। 'লাশে লাশ ফালাইবো' কথাটার অর্থ এখন বুঝতে পারছেন তিনি। পরপারের এক অশুভ শক্তি এপারে এসে খুন খারাবি শুরু করেছে।

এমন সময় কে যেন দরজা খুলল লাশকাটা ঘরের। ডা. রহমান ফিরে তাকালেন এবং দেখতে পেলেন জিন্নাত আলী দাঁড়িয়ে আছেন। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ড্রাগনের মতই গর্জন করে উঠল তরী। বিষাক্ত সাপের মত ফোঁস করে একটা আওয়াজ করে ছুটে গেল জিন্নাত আলীর দিকে। তাঁর সুটের কলার চেপে ধরে বলল, 'কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি এতদিন?'

ডা. রহমান দেখলেন, জিন্নাত আলী কোন বাধা দেয়ার বা প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন না। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন তরীর দিকে। সেই চোখে কোন ভয় নেই, নেই বাঁচার আকুতি। আছে শুধু বিস্ময়। বহুদিন পর খুব কাছের একজন মানুষের সাথে দেখা হলে যে দৃষ্টিতে মানুষ তাকায়, সেরকম।

'কে?' কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জিন্নাত আলী, 'কে তুমি?'

'আমারে তুই চিনিস না?' জিন্নাত আলীর কলার ধরে সজোরে ঝাঁকি দিল তরী, 'চিনিস না আমারে তুই?'

জিন্নাত আলী ভয় পেলেন বলে মনে হলো না। বিস্ময়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে মানুষ ভয়ের ঊর্ধ্বে চলে যায়, 'তোমার নাম তরী?'

'তোর সন্দেহ আছে?'

'তুমি আমাকে কেন খুঁজছ?'

'জানিস না তুই?'

'প্লীজ বলো, আমাকে কেন খুঁজছ?'

'আমার মা আমারে পাঠাইছে। বলছে তোরে মাইরা যেন ঘরে ফিরি।'

'কে তোমার মা? নাম কী?'

তরী জিন্নাত আলীর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল, ডা. রহমান দূর থেকে শুনতে পেলেন না।

জিন্নাত আলীকে দেখে মনে হলো তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন। তরী তাঁর কলার ধরে না রাখলে হয়তো পড়েই যেতেন তিনি। গাঁইতিটা উঁচু করে ধরল তরী, 'আজ তোরে মেরে ঘরে ফিরব আমি। বহুদিন মারে দেখি না। তয় তোরে যন্ত্রণা দিয়া মারব। যে যন্ত্রণা তুই আমাদের দিছিলি।'

গাঁইতিটা ঘ্যাচ করে জিন্নাত আলীর উরুতে গেঁথে দিল তরী। রাতের সবটুকু নিস্তব্ধতাকে চৌচির করে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন জিন্নাত আলী। গাঁইতিটা মোচড় দিতে দিতে তরী বলল, 'কেমন মজা? অন্যরে কষ্ট দেয়ার সময় মনে থাকে না নিজের কষ্ট কেমন লাগে?'

ডা. রহমান কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অথচ কিছু একটা করা দরকার। ওই পিশাচিনীর গায়ে অসুরের শক্তি। এদিকে সিতারাও আবার ড্রয়ারে ঢুকে বসে আছে।

'ডাক্তার!'

সিতারার গলা! ড্রয়ারের ভেতর থেকে কথা বলছে সিতারা। এজন্যই বোধহয় ভোঁতা লাগছে তার কণ্ঠ, 'ডাক্তার, তোমার হাতের পয়সাটা ওই মাগীর কপালে চাইপা ধরো। এ ছাড়া কোন উপায় নাই। জলদি করো। সময় নাই।' আবারও ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল সিতারার গলা।

রেসের ঘোড়ার মত ছুটলেন ডা. রহমান। জিন্নাত আলীর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। বিদ্যুৎ গতিতে তরীর কপালে পয়সাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন তিনি। পয়েন্ট টু টু বোরের রাইফেলের গুলি খাঁওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল তরী। দৃষ্টি উপরের দিকে চলে গেল। সেই দৃষ্টিতে হঠাৎই ভর করল রাজ্যের শূন্যতা। একমুহূর্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার শরীরটা যেন মোমের মত গলে যেতে শুরু করল। 'আমারে শেষ করতে পারবি না। আমার শেষ নাই। আমি আবার আসব। আবার।' ধীরে ধীরে বসে পড়ল মেঝেতে। পয়সাটা সরালেন না ডা. রহমান। তরী শুয়ে পড়ল এবং দু'একটি খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল তার শরীরটা।

ইতোমধ্যে আনোয়ার জিন্নাত আলীর উরু থেকে গাঁইতিটা বের করে সেখানে নিজের শার্টটা বেঁধে দিয়েছে। ডা. রহমান তাঁকে ধরে বললেন, 'সার, আপনি ঠিক আছেন?'

জিন্নাত আলীর বিস্ময় এখনও কাটেনি। শূন্য শুধু আকাশ আর অঙ্ক বইয়েই থাকে না। মানুষের চোখেও মাঝেমাঝে ও বস্তু ভর করে। আকাশ আর অঙ্ক বইয়ের যাবতীয় শূন্যতা এখন জিন্নাত আলীর চোখে।

চোখ ফিরিয়ে ডা. রহমান দেখলেন তরীর শরীরটা আবারও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নয়

পরদিন সকাল।

জিন্নাত আলী উরুতে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বসে আছেন ডা. রহমানের ঘরে। হাসপাতালের অন্যান্য ডাক্তাররাও উপস্থিত। তাঁরা ডা. রহমানকে অভিযোগ করছেন, এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল গতরাতে, অথচ তাঁদেরকে কেন কোন খবর দেয়া হলো না। ডা. রহমান সাফাই গাইছেন, তিনি অন্য কাউকে বিপদে ফেলতে চাননি। তিনিই ওই মেয়েকে হাসপাতালে এনেছেন, এজন্য অন্যরা কেন প্রাণ দেবে?

প্রাথমিক আলোচনা শেষে ডা. রহমান জিন্নাত আলীর দিকে তাকালেন, 'জিন্নাত আলী সাহেব, আমরা সত্যি কথাটা জানতে চাই।'

জিন্নাত আলী তাকালেন, 'মানে?'

'কাল রাতে যা হয়ে গেল, এর পেছনে কোন না কোন ভাবে আপনি জড়িত। নইলে ওই মেয়ে আপনাকে চিনল কী করে? আমার মনে আছে, প্রথম দিন আমার মুখে ওই মেয়ের নাম শুনেই চমকে উঠেছিলেন আপনি। ঘটনাটা আমাদের খুলে বলুন। এটা হালকা কোন ঘটনা নয়। তিনজন মানুষের প্রাণ গেছে। আরও যেতে পারত। আমি মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসক। আপনার মুখ দেখে অনেক কিছুই বুঝতে পারছি। বলুন, নইলে আমরা একযোগে ইস্তফা দেব।'

জিন্নাত আলী কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন, 'আমি যা বলতে যাচ্ছি, এরপর ইচ্ছে করলে আপনারা আমাকে ফাঁসির কাঠগড়ায় পৌঁছে দিতে পারেন। তবুও আজ আমি বলব। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। আমার পাপ আমাকে আজও ছাড়েনি।

'আপনারা হয়তো জানেন, আমার স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় মারা যায়। আজকাল ডাক্তাররা আগে থেকেই ডায়াগনসিস করে বলে দিতে পারে সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে। আমার স্ত্রী আগে থেকেই জানত, তার সন্তানটি মেয়ে হবে। সে তার অনাগত সন্তানের নাম রেখেছিল তরী।'

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল ঘরে।

'আপনারা এটা জানেন যে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং ওই অবস্থাতেই সে আত্মহত্যা করে। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। সে আত্মহত্যা করেনি। তাকে আমি ধাক্কা দিয়ে বাইশ তলা থেকে ফেলে দিয়েছিলাম।'

গুঞ্জনটা আরেকটু জোরালো হলো।

ডা. রহমানই শুধু অস্থির হলেন না। তিনি জানেন, পৃথিবী হচ্ছে এমন একটা গ্রহ, যেখানে কিছুই অসম্ভব নয়। যা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে, তাকে আমরা বলতে পারি আছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় কিছু একটা না থাকা মানেই এই নয় যে, সেটা নেই। হয়তো আছে, আমরা জানি না। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'কারণটা বলুন। আপনি নিঃসন্তান ছিলেন, অবশেষে আপনি বাবা হতে যাচ্ছিলেন। এতে আপনার অতিশয় আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। আনন্দ সহ্য করতে পারেননি বলে নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্ত্রীকে মেরে ফেলেননি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জিন্নাত আলী, 'ওই সন্তান আমার ছিল না। ডাক্তার অনেক আগেই আমাকে বলে দিয়েছিল, আমি কখনও সন্তান জন্ম দিতে পারব না। আমি সেই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলাম। মানতে পারেনি আমার স্ত্রী। সে একটি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকারকে সে বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে রাজি করিয়েছিল তাকে একটি সন্তান দেবার জন্য। টাকার লোভে সে রাজি হলো। ওই সন্তান সেই কেয়ারটেকারের। আমি মানতে পারিনি ব্যাপারটা। সবই জানতে পেরেছিলাম আমি। স্ত্রীকে চাপ দিচ্ছিলাম সন্তানটা নষ্ট করার জন্য। আর যাই হোক, টাকার বিনিময়ে ধারণ করা সন্তান আমার চাই না। কিন্তু ও রাজি হচ্ছিল না। সংসারে অশান্তি শুরু হলো। আমি হয়তো বেশিই চাপ প্রয়োগ করে ফেলেছিলাম। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। বলতে শুরু করল, সবাইকে বলে দেব কে সন্তানের বাবা। তোমার মত বাপ আমার মেয়ের দরকার নেই। ওর সত্যিকারের বাপের পরিচয়েই ও পরিচিত হবে।' আমারও কেমন জানি মাথা খারাপের মত হয়ে গেল। হাজার হোক, মান সম্মানের ব্যাপার। এই ঘটনা জানাজানি হলে পত্রিকায় রিপোর্ট হবে, সাংবাদিক আসবে। কাজেই একদিন গভীর রাতে তাকে আমি ফেলে দিলাম। কাল রাতে তরীকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। হুবহু আমার স্ত্রীর চেহারা। এ কী করে সম্ভব?'

ঘরে এখন পিনপতন নীরবতা। সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে এই ঘটনা শুনে। ডা. রহমান মোটামুটি বুঝতে পারলেন, তরী জিন্নাত আলীরই মৃত মেয়ে। একটা বিষয়ই শুধু পরিষ্কার হচ্ছে না। মা মারা গেলে তাঁর গর্ভের সন্তানও মারা যায়। তরী কীভাবে ফিরে এল? ও যেভাবে ওর বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিল, তা আসলেই

কবরের কথা ছিল? কবর থেকে উঠে এসেছে মেয়েটি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও তিনি অভিজ্ঞতাবাদেরই আশ্রয় নিলেন। যা তাঁর অভিজ্ঞতায় আগে ছিল না, তাকে তিনি বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটাই করেননি। এখন তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাজেই তিনি বুঝতে পারছেন, জগতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার পার্থিব ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

মৃদু গুঞ্জন শুনে ডা. রহমান দেখলেন, জিন্নাত আলী অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অবতরণিকা

মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে জিন্নাত আলীর।

কারও সাথে কথা বলেন না। শুধু একা একা বিড়বিড় করেন। মনোযোগ দিয়ে শুনলে কিছু অর্থহীন শব্দ শোনা যায় তার মুখ থেকে—নারা রিকা রাসা বিও; নারা রিকা রাসা বিও। ডা. রহমানের ধারণা, অলৌকিক এই ঘটনার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে জিন্নাত আলী মেণ্টালি ডিজঅর্ডারড হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। স্ত্রীকে হত্যার অনুতাপের ফসল এই হাসপাতাল। তাঁর দেয়া শর্ত মেনে আর দশটা রোগীর মতই অত্যন্ত যত্ন করে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাঁকে। ডা. রহমানই তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করছে আরেকজন।

হাসপাতালে সম্প্রতি একজন নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার নাম খেয়া। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সী একটি মেয়ে। অত্যন্ত ভদ্র এবং কাজের প্রতি আন্তরিক। সে এই হাসপাতালের খুব সুখ্যাতি শুনেছে এবং এরকম একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সে খুবই আগ্রহী। নার্সিং-এর উপর তার ট্রেনিং নেয়া আছে। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কিছুদিন কাজ

করার অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু জিন্নাত আলী কেন যেন এই নার্সটিকে দেখলেই আতঙ্কে নীল হয়ে যান। এই আতঙ্কের কথা তিনি কাউকে বলেননি। বলেননি যে, তাঁর ধারণা, তরী মেয়েটিই খেয়া হয়ে ফিরে এসেছে। খেয়া তো তরীরই সমার্থক শব্দ। মেয়েটি যখনি তাঁকে ওষুধ খাওয়াতে আসে, তিনি আতঙ্কে নীল হয়ে যান। তাঁর এই আতঙ্ক দেখে মেয়েটিও কেমন যেন রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে, অশুভ হাসি। যেন নিঃশব্দে বলে, 'দাঁড়া, দুদিন অপেক্ষা কর, তোকে না নিয়ে ঘরে ফিরব না। আমি, আমার মা আর তুই একসাথেই থাকবি। আমাকে স্বীকৃতি দিতে চাসনি তুই; স্বীকৃতি দিতেই হবে।' কাউকেই বলেননি তিনি এসব কথা। পাগলের কথা কে বিশ্বাস করবে!

ভয় করে, বড় ভয় করে জিন্নাত আলীর।

ইমরান খান

ভয়

এক

অপরাধটা গুরুতর।

শুধু নাসরিন জাহানের দৃষ্টিতে নয়, বাড়ির সবার দৃষ্টিতেই। তবে রাগটা তার অন্যদের চাইতে বেশি হয় অনেক গুণ। ইচ্ছা হয় কষে একটা চড় বসাতে মেয়েটার গালে।

এই কাজের মেয়েদের জাতটাই আসলে খারাপ। আঠারো/উনিশ বছরের জোয়ান মেয়ে, গোসল করছে বাথরূমের দরজাটা হাঁ করে খুলে দিয়ে। বাড়ির পুরুষ লোকদের আকর্ষণ করার সস্তা কৌশল ছাড়া আর কী? এই বয়সেই এইসব শিখে গেছে, ভবিষ্যতে আরও না জানি কী করবে।

'এই সবের মানে কী, হ্যাঁ? মানে কী?' ভীষণ রাগে চিৎকার করতে থাকেন নাসরিন জাহান। 'ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে বাথরূমের দরজা খুলে গোসল করা হয়! এই বয়সেই পুরুষমানুষকে শরীর না দেখালে চলে না, আর একটু বয়স হলে কী করবি? বাসা ভরা পুরুষ লোক, আর উনি দরজা খুলে গোসল করে নায়িকাদের মতন...'

একটানা বর্ষে যেতেই থাকেন নাসরিন বেগম, আর টপাটপ চোখের পানি ফেলে হাসিনা। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই

ভাল মতই জানে সে। সে ভেবেছিল বেগম সাহেবা ঘুমাচ্ছে। এভাবে ধরা পড়তে হবে চিন্তাও করেনি একবার। এই মহিলার সব দিকে সাংঘাতিক চোখ। কীভাবে কীভাবে জানি টের পেয়ে যায় সবকিছু।

'এই জন্যেই তো স্বামীতে দেখতে পারে না,' ভাবে হাসিনা। 'ঘরের বউ এই রকম আজরাইলের মতন হইলে কোন পুরুষলোকের ভাল লাগে? মাইয়া লোক তো না, একটা বিরাট হাতি যেন।'

নাসরিন বেগম তখনও চিৎকার করছেন নিজের মনেই।

'...এখন কাঁদা হচ্ছে কেন, হ্যাঁ? এখন কেন কাঁদা হচ্ছে? দরজা খুলে নায়িকা হওয়ার সময় মনে ছিল না যে গালি শুনতে হবে?'

'আপনি যেই রকম ভাবতেছেন, ওইরকম না, খালাম্মা...' কাঁদতেই থাকে হাসিনা। 'আল্লার কসম খাল্লামা, ওইরকম কিছু না।'

'আমাকে হাই কোর্ট চেনাস তুই? হাই কোর্ট চেনাস? তোর মত কত ছেমড়ি আসল-গেল এই বাড়িতে...'

'না খালাম্মা, ওই রকম কিছু না!'

'তা হলে কী রকম কিছু? কী কারণে দরজা খোলা রেখে গোসল করছিলি?...কী কারণে?'

অনেকটা সময় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে হাসিনা। চোখ দিয়ে আর পানি বেরোয় না, তাই ফোঁপায় শুধু। এবং ফলশ্রুতিতে আরও কয়েকটা ধমক দেন নাসরিন বেগম।

'আসলে খালাম্মা...বাথরুমে একলা একলা ভয় করে!'

'ভয় করে? এতবড় ধিরিঙ্গি মেয়ের বাথরুমে ভয় করে?'

'বাথরুমের পুকাগুলিরে ভয় করে। দরজা আটকাইলেই...'

কথা শেষও করতে দেন না, আকাশ থেকে পড়েন নাসরিন বেগম। 'পোকা ভয় করে? পোকা?... ঢঙের একটা সীমা থাকা উচিত, বুঝলি? ফকিরনীর মেয়ে, সারা জীবন বড় হইছিস বস্তিতে। পোকা-মাকড়ে তোর ভয় করবে কেন?...ফের একবার এইসব ঢঙের কথা বললে চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিব।...যত্তসব! গরিব মানুষের মেয়েদেরই এইসব ঢং বেশি থাকে...'

গজরাতে গজরাতে চলে যান নাসরিন বেগম, তাঁর পাঁচ বছরের একমাত্র মেয়ে ঘরে একা শুয়ে আছে। যাওয়ার আগে অবশ্য বাথরুমে একবার উঁকি দিতে ভুলেন না।

কীসের পোকা!! কীসের কী!!

কোনও জীবিত প্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই বাথরুমে।

দুই

নির্বিকার চেহারায় আবার বাথরুমে এসে ঢোকে হাসিনা। এবং বালতিতে ভেজানো কাপড়গুলো ধুতে শুরু করে দরজা খোলা রেখেই। পরনের কাপড় ভিজে আঁটসাঁট হয়ে চেপে বসেছে শরীরের ওপর। এই জন্যেই হয়তো আরও বেশি করে ভেজায় নিজেকে। সাহেব বসে আছে ড্রইংরুমে টিভি দেখার ভান করে, কিন্তু চোখ সোজা এই দিকে আটকানো। মাঝে মাঝে জিব দিয়ে চাটছে নিজের ঠোঁট।

ইচ্ছা করেই বুকের ওড়না সরিয়ে দেয় হাসিনা। এতক্ষণে বেগম সাহেবা ঘুমে কাদা। সাহেবের সাথে একটু মজা করার

জন্যে এর চাইতে ভাল সময় হতে পারে না। সাহেবের মা অবশ্য জেগে আছে। কিন্তু তাতে কী? ওই বুড়ি তো বিছানা ছেড়েই উঠতে পারে না।

বেগম সাহেবা আসবে না, নিশ্চিত জানে হাসিনা। দুপুরের ভাতের পর উনি এক কাপ চা খান। আজ সেই চায়ের মাঝে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছে সে। সপ্তাহে এই এক দিনই তো সাহেব বাসায় থাকে!!

সাহেব তাকে চায়-চোখ দেখেই বোঝে হাসিনা। উঠতি বয়সের মেয়ে সে। একবার বিয়ে হয়েছিল, ছয় মাসের মাথায় স্বামী তালাক দিয়ে দিয়েছে। এখন যদি সাহেবের মতন একটা নাগর ধরা যায়, তা হলে জীবনের সব চিন্তা দূর। বেগম সাহেবার মতন হাতির চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী সে, জানে হাসিনা। সুন্দরী বলেই তো সাহেব এইরকম ছুটে ছুটে আসছে...

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে হাসিনা...

কাজের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বাথরুমের দরজা আটকে দেন নাসরিন বেগমের স্বামী শওকত হাসান সাহেব।

শরীর ডলে ডলে ভাল মতন গোসল করে হাসিনা। সাহেব কঠিন সিগারেট খোর, গায়ে যদি এক ফোঁটাও গন্ধ থেকে যায় তা হলে বিরাট সমস্যা। বেগম সাহেবার নাক কুকুরের মতন।

গোসল করতে করতেই হাসিনার চোখ পড়ে পোকাগুলোর দিকে। এবং ঘেন্নায় নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসতে চায়। হাজার চেষ্টা করেও চোখ সরে না পোকাগুলোর ওপর থেকে।

পোকাগুলোকে দেখলে কেন জানি সবসময়েই এমন হয় তার। এক মাস হতে চলল কাজে এসেছে সে। আসার পর থেকেই লক্ষ করছে এগুলোকে।

বাথরুমের ছাদের এক কোণে অনেকগুলো পোকা...কালো কালো, একদম গুটিগুটি। সাদা ছাদটার একদম কোণে জড় হয়ে আছে। কোনও কোনওটা হাঁটছে দেয়াল বেয়ে, কোনও কোনওটা আবার লাফ দিচ্ছে ছোট ছোট।

ঘেন্নায় রীতিমত বমি পেতে থাকে হাসিনার। কিন্তু আসলে কিছু করার নেই। বেগম সাহেবা একরকম ঠিকই বলেছে। গরীব মানুষের মেয়ের অত ভয়-ডর থাকলে চলে না। অত ঘেন্না-টেন্না থাকলেও চলে না। কিন্তু শুধু যে ঘেন্না লাগে, তাই নয়। কেমন যেন ভয়   ভয়ও লাগে।

এই বাড়িটা অনেক পুরানো, হাসিনা শুনেছে এটা নাকি বেগম সাহেবার শ্বশুর সাহেবের বাড়ি। তিরিশ বছরের পুরানো তো হবেই কমপক্ষে। বাইরের দিকটা কেমন ময়লা হয়ে গেছে, শ্যাওলা ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেখলেই কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে।

তারওপরে একতলা বাড়ি আর চারধারে সব উঁচু উঁচু বিল্ডিং। এই কারণে বাড়ির ভেতরেও সবসময় অন্ধকার থাকে। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। সব সময়ই কেমন যেন একটা ভুতুড়ে পরিবেশ...

সার বেঁধে এবার চলতে শুরু করেছে পোকাগুলো। জানে না কেন হাসিনার মনে হয় পোকাগুলো আসছে তার দিকেই। তাকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে সার বেঁধে পোকাগুলো...এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

অদ্ভুত একরকম ভয়ে শরীরে জড়তা নামে হাসিনার। গোসল শেষ না করেই তড়িঘড়ি বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে যায় সে।

তিন

নাহ, মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে—মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন নাসরিন বেগম। জানালা দিয়ে বাইরে হাসিনাকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি, আর দেখতে পাচ্ছেন বারান্দায় বসা নিজের স্বামীকেও। কলপাড়ে বসে বাসন মাজছে হাসিনা, আর হাঁ করে তাকিয়ে আছে জয়ার আব্বু। চোখেচোখে কথা বলছে দুজনে। হাসিনা এমন সব ভঙ্গি করছে যাতে শরীর আরও বেশি করে দেখানো যায়, আরও বেশি আকর্ষণীয় করা যায় নিজেকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নাসরিন বেগম। এসে বসেন শাশুড়ির মাথার কাছে। এরকম একটা কাজের মেয়ে যে একটা সংসার টুকরো টুকরো করে দিতে পারে, সে খবর তার চাইতে ভাল আর কে জানে?

জয়ার দাদাও তো তাই করেছিলেন। শেষ বয়সে এক কাজের মেয়েকে বিয়ে করে সে কী কেলেঙ্কারি! সমাজ থেকে আলাদা হলেন, সন্তান থেকে আলাদা হলেন, পঞ্চাশ বছর পাশে থাকা স্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়। এরপর যতদিন বেঁচে ছিলেন, সেই কাজের মহিলাকে নিয়েই। এই বাড়িতে, এই একই ছাদের নীচে। ভাবা যায়?

তার ছেলেও যে বাপের মত চরিত্র পাবে, এতে অবাক হবার কী আছে! মায়ের দুঃখ জয়ার বাবা বুঝতে চেষ্টা করেনি কখনও।

সব ভাবনা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ির দিকে মনোযোগ দেন নাসরিন বেগম। বেশির ভাগ সময়েই চোখ বন্ধ করে মরার মত পড়ে থাকেন বিছানায়, কিছু বলেন না কিংবা বোঝেনও না। তবে আজ বুঝি ভাল আছেন একটু। সুস্থ মানুষের মতন তাকাচ্ছেন বেশ।

'আম্মা, কিছু খাবেন? কমলার রস করে দিবো?'

জবাবে অপ্রকৃতিস্থের মত হাসতে শুরু করেন বৃদ্ধা। 'পুকা পইড়ে মরবো। ব্যাকটি পুকা পইড়ে মরবো...পুকা পড়বো শইলে। পুকা!!!... পুকায় একটু একটু কইরে খাইবো ব্যাকটিরে...একটু একটু কইরে খাইবো।... আমি অভিশাপ দিছি...আমি অভিশাপ দিছি!'

বৃদ্ধার কষ্টে চোখে পানি চলে আসে নাসরিন বেগমের। স্বামীর সেই কাণ্ডের পর থেকে মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে তাঁর। যতদিন কথা বলতে পারতেন, দিন-রাত শুধু শাপ-শাপান্তই করতেন স্বামী আর সতীনকে। আর সত্যি কথা বলতে কী কেন যেন নাসরিন বেগমের মনে হয় সেই অভিশাপ ফলে গেছে। সত্যি সত্যি ফলে গেছে।

শ্বশুর সাহেব মারা গেছেন এই বাড়িতেই। আক্ষরিক অর্থেই গায়ে পোকা পড়ে মরেছেন। বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে পুরো শরীরে বেডসোর হয়েছিল তাঁর। নাসরিন বেগম নিজের চোখে শরীরের সেই ঘায়ে পোকা ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। কালো কালো, গুটিগুটি একরকম পোকা।

সেই কাজের মহিলারও বোধহয় একই রকম কিছু হয়েছিল। কেননা এই বাড়ি তার নামে হওয়া সত্ত্বেও একদিন রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে সে। এবং আর ফিরে আসেনি কোনও দিন।

...মন ভরে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন শাশুড়ি অদৃশ্য কাউকে লক্ষ্য করে। বাধা দেন না নাসরিন বেগম। বহুদিন পর বৃদ্ধা কথা বলছেন যখন, বলতে থাকুন। শাপ-শাপান্ত করে যদি তাঁর মন ঠাণ্ডা হয় তো হোক।

চার

সারাদিন গোসল করা হয়নি, তাই সন্ধ্যা হলেও বাথরুমে ঢুকে পড়ে হাসিনা। আর এমনই কপাল যে ঢুকতে না ঢুকতেই চলে যায় কারেন্ট। অবশ্য পাত্তা দেয় না সে। একটু পরেই অফিস থেকে বাসায় ফিরবে সাহেব, সময়ের চাইতে আগেই ফিরবে। আর বেগম সাহেবা গেছে মেয়ের বান্ধবীর জন্মদিনে। এমন সুযোগ আর আসবে না। সুতরাং...

সব আগে থেকে প্ল্যান করা। সাহেব ওয়াদা করেছে আজ তাকে একটা সোনার আঙটি এনে দেবে। গত দুই সপ্তাহে দুইটা দামি শাড়ি দিয়েছে, সাজগোজ করার এই এত্তগুলি জিনিস। আর সবচাইতে বড় কথা বেগম সাহেবাকে মারধরও করেছে। সে বলাতেই করেছে। আর ওয়াদা করেছে ওই হাতির মতন মহিলাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করবে। খুব জলদিই করবে।

বিয়ে যে করবে তাতে শতভাগ নিশ্চিত হাসিনা। পুরুষ মানুষ দেখলেই বোঝা যায় কে কোন পদের। সত্যি কথা বলতে কী, সাহেবকে কিন্তু তার মোটেও পছন্দ না। মধ্যবয়সী লোক, মাথা

ভরা টাক। কেমন জানি চাঁড়াল চাঁড়াল একটা ভাব আছে চেহারায়, সারাক্ষণ শরীরের জন্যে অস্থির।

তার তো মনে ধরেছিল বেগম সাহেবার ছোট ভাই তানিমকে। কিন্তু এমনই ছেলে যে তার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখে না কখনও। একদিন বেগম সাহেবার অনুপস্থিতিতে দরজা খুলে গোসলও করেছে সে, প্রায় নগ্ন হয়েই করেছে। ফল হয়েছে উল্টো। তারপর থেকে ছেলে আর এই বাসাতেই আসে না একবারে...

এটা কী?...কী এটা?

চাপা একটা চিৎকার করে ওঠে হাসিনা। কেন যেন মনে হলো তার গোড়ালি স্পর্শ করে ছুটে গেল কিছু একটা। পিচ্ছিল, অদ্ভুত কোনও কিছু।

কেমন যেন গা গুলিয়ে আসতে থাকে। তড়িঘড়ি গায়ে পানি ঢালতে গিয়েও থমকে যেতে হয়। মনে হয় কী যেন একটা সরসর করে ছুটে গেল বাথরূমের এপাশ থেকে ওপাশ। ভাল করে তাকিয়ে একটা আকৃতি চোখেও পড়ে। ছায়াময়, ছোট্ট একটা আকৃতি।

ভয়ে বরফের মতন জমে যায় হাসিনা...

এইটা কী ঢুকেছে বাথরূমের মাঝে? সাপ? কিন্তু ছায়া দেখে তো মনে হয় না যে সাপ।...তা হলে কী? কী চায় এটা?

কেন যেন হাসিনার মনে হয় তার দেখা পরিচিত কোনও প্রাণী নয় এটা। জানে না কেন এমনটা মনে হয়, কিন্তু মনে হয় ভীষণ ভাবে!

শরীরে তোয়ালে পেঁচিয়েই বাথরূম থেকে বের হয়ে আসে সে। এবং অবাক হয় আরেক দফা। কেননা বাইরে বাতি জ্বলছে,

কেবল জ্বলছে না বাথরুমের ভেতরেই।

'কী হয়েছে? বাল্‌ব্ ফিউজ হয়ে গেছে?'

সুইচটা বন্ধ করে আবার জ্বালে হাসিনা, সাথে সাথে আলোকিত হয়ে ওঠে বাথরুম। তার মানে বালবেও কিছু হয়নি...

মানে কী এইসবের? তার বাথরুমের আলো কে নেভাতে যাবে? বিছানায় পড়ে থাকা ওই বুড়ি তো নড়তেই পারে না একচুল, তা ছাড়া সুইচও তো বন্ধ করা ছিল না...তা হলে?

ভয়ে মাথা খারাপের মতন হয়ে যায় হাসিনার। চট জলদি কাপড় পরে নেয় সে। এতবড় বাড়িতে একা একা এখন আর থাকতে পারবে না সে। যতক্ষণ সাহেব না আসে, বুড়ির ঘরেই বসে থাকবে। হোক না ঘাটের মরা, তবু মানুষ তো!!

পাঁচ

বুড়ি আজকে ভালই সুস্থ। ঘরের মাঝে টিভি ছাড়া, চোখ পিটপিট করে টিভিও দেখছে বুড়ি।

হাসিনাকে দেখেই হাসে। জীবনে প্রথমবারের মতন। জানে না কেন, সেই হাসি দেখেও অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসতে থাকে হাসিনার।

'এইদিকে আয়, মাগী। এই দিকে আয়!'

ঘটনা কী বুড়ির? কাছে ডাকে কেন?

'আরে ডরাস ক্যান? কয়দিন পর আমার ছেলের বউ হইবি, তখন তো আমার সেবা তোরই করন লাগব...ডরাইস না। কাছে আয়।'

বুড়ি তা হলে সব জানে? তা হলে বেগম সাহেবাকে বলে নাই কেন? তারমানে ছেলে তাকে বিয়ে করলে বুড়ির কোনও সমস্যা নাই?

কাছে এগিয়ে যায় হাসিনা। ভাল মানুষের মতন একটু হাসার চেষ্টা করে। বুড়িকে খাওয়াবার জন্যে ফলের রস ঢালে গ্লাসে।

'আমার পোলায় কেমন?' চোখ টিপে অশ্লীল একটা ভঙ্গি করে বুড়ি। 'সামলাইতে পারিস আমার পোলারে?...তুই জোয়ান মাগী, না পারার তো কথা না। দেখিস মন জুগায় চলিস আমার পোলার। না হইলে...'

এরপর কুৎসিত কুৎসিত সব কথা বলতে থাকে বুড়ি। জঘন্য, অশ্লীল সব কথা। কিন্তু আগ্রহ ভরেই শোনে হাসিনা। তার প্রথম স্বামী সালাউদ্দিন এইরকম কথাবার্তা বলত।

'নেন, আম্মা। এটু জুস খান।' আম্মা ডাকতে পেরে ভারী তৃপ্তি বোধ করে সে। নিজেকে বেগম সাহেবার সমকক্ষ মনে হয়।

কিন্তু ভুল ভাঙে পরক্ষণেই...

কী থেকে কী হয়ে যায় নিজেই বুঝতে পারে না। এক হাতে বুড়িকে একটু উঁচু করে ধরেছিল সে। অপর হাতে জুসের গ্লাস ধরেছিল সামনে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বুড়ি কামড়ে ধরেছে তার কব্জি...

তীক্ষ্ণ ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে হাসিনা। বুড়িকে চড়-থাপ্পড়-কিল-ঘুসি সবই বসায়, কিন্তু লাভ নেই

কোনও। বুড়ি তো না, যেন অসুর। দাঁতগুলো যেন বাঘের মতন ধারালো। যত টানাহেঁচড়া করে, মাংসের আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকে।

গায়ের জোরে হাতটাকে ছোটাতে চেষ্টা করে হাসিনা, আর চিৎকার করে পাগলের মতন। এক পর্যায়ে ছোটাতে পারে ঠিকই, কিন্তু না পারলেই বোধহয় ভাল হত...

তার হাতের এক খাবলা মাংস-চামড়া রয়ে গেছে বুড়ির মুখে। রক্তে মাখামাখি সবকিছু—বুড়ির মুখ, তার শরীর। ব্যথা ভুলে জান বাঁচাতে পালাতে থাকে হাসিনা। শুনতে পায় পেছনে চিৎকার করছে বুড়ি...

'পুকা পইড়ে মরবি তোরা। ব্যাকটি পুকা পইড়ে মরবি... পুকা পড়বো শইলে। পুকা!!!...পুকায় একটু একটু কইরে খাইব ব্যাকটিরে...একটু একটু কইরে খাইব।...আমি অভিশাপ দিছি...আমি অভিশাপ দিছি!'

জানে না কেন হাসিনার মনে হয় অকারণে অভিশাপ দিচ্ছে না বুড়ি। অহেতুক অভিশাপ দিচ্ছে না। সে যেমন বলছে, আসলে ঠিক সেইরকমই হতে যাচ্ছে তার সাথে!

ছয়

কী হলো? কারেন্ট চলে গেল?

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেছে পুরো এলাকা। হাত-পা কাঁপছে হাসিনার, সে অবস্থাতেই মোমবাতি খুঁজে বের করার

চেষ্টা করতে থাকে সে। এতটাই ভয় পেয়েছে যে হারিয়ে গেছে ব্যথার অনুভব পর্যন্ত। কেবল অস্পষ্ট একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে গলা থেকে। হাসিনার তখনও জানা নেই যে তার জীবনের দুঃস্বপ্নময় ভয়াবহতম অধ্যায়টি শুরু হলো মাত্র...

গোড়ালি ছুঁয়ে ছুটে যায় কী যেন একটা, এক খণ্ড ছায়ার মত দলা পাকিয়ে থাকে ঘরের এক কোণে। সাথে ভয়ানক একরকমের শব্দও আসে।

হিসসসস...হিসসসসসস...যেন ভয়ানক রাগে ফুঁসছে হিংস্র কোনও প্রাণী!! প্রস্তুতি নিচ্ছে আরও একবার ছুটে আসার।

ভয়ে হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে আসতে থাকে হাসিনার। তবু জীবন বাঁচাবার চরম তাগিদে একটু একটু করে পিছায় সে। মোমবাতির খোঁজে রান্নাঘরের দিকে এগোতে চেষ্টা করে।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একবার ছুটে আসে ঘরের কোণ থেকে সেই প্রাণীটা...ছায়াছায়া, অস্পষ্ট সেই প্রাণীর অবয়বটা।

গলা চিরে এত জোরে চিৎকার আসে যে পানি গড়ায় চোখ বেয়ে। কামড় দিয়েছে প্রাণীটা তাকে, তীক্ষ্ণ অনেকগুলো দাঁত বসিয়ে দিয়েছে গোড়ালিতে।

এবার গায়ের জোরে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ায় হাসিনা। আলো...কেবলমাত্র আলোই এখন তাকে বাঁচাতে পারে। আলোতে দূর হয়ে যায় সকল ভয়...ভয়ের সকল উপাদান...

থালাবাটির সাথেই রাখা আছে মোমবাতি। কিন্তু ম্যাচ কোথায়? ম্যাচ? একটা কাঠি...মাত্র একটা কাঠি প্রয়োজন তার...

প্রাণীটা এখানেও পৌঁছে গেছে। রান্নাঘরের অন্ধকারতম কোণটা থেকে আসছে হিসসসসসসস...হিসসসসসস....

আলো?

আলো কোথায় পাবে? একটুখানি আগুন....

চুলায় বসানো পানি ভরা বিশাল ডেকচি। খাবার পানি ফোটাতে বসিয়েছিল। নীচে চুলায় আগুন তো জ্বলছে, কিন্তু এতবড় ডেকচির নীচ থেকে আগুনের নাগাল পাওয়া অসম্ভব....

কিন্তু যদি...

কোনওভাবে যদি একটু সরানো যেত...

যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও মুহূর্তে আবার ছুটে আসবে অন্ধকার অবয়বটা...ক্রমশ বাড়ছে হিস হিসহিসানি তার... বাড়ছে... ক্রমশ...

একটু আলো...একটু আগুন চাই...

একটু আগুন...

মোমবাতি হাতে একটু একটু করে পানির ডেকচিটার দিকে এগোতে থাকে হাসিনা। ভয়ে নিরুপায় হয়ে এগোতে থাকে...

এবং তীব্র গতিতে ছুটে আসে অস্পষ্ট, ছায়াময় অবয়বটা!

হাসিনার করুণ আর্তনাদে বাসায় ছুটে আসেন আশপাশের সকল প্রতিবেশী। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয় বাধ্য হয়েই।

আর তাঁরা দেখতে পান তাঁদের দেখা ভয়ংকরতম দৃশ্যটি।

রান্নাঘরে পড়ে আছে হাসিনা। ফুটন্ত গরম পানি ভরা বিশাল ডেকচিটা উল্টে পড়ে গেছে তার শরীরের ওপর!!

পরিশিষ্ট

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নাসরিন বেগম।

কী থেকে কী হয়ে গেল? সেদিন বাসায় ফিরে তো আকাশ

ভেঙে পড়েছিল তাঁর মাথার ওপর।

আজ দুই মাস হতে চলল হাসিনা মেডিকেলে। খরচা-পাতি তো তাঁরা দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু ডাক্তারেরা কোনও আশা দেননি। ৬০% বার্ন নিয়ে যে মানুষ বাঁচে না, তা কিন্তু নয়। কিন্তু হাসিনার শরীরে নাকি একরকম জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে। গুটিগুটি একরকম পোকায় ছেয়ে গেছে শরীর।

নাসরিন বেগম নিজের চোখে দেখে এসেছেন...

ঠিক যে রকম পোকা তাঁর শ্বশুর সাহেবের শরীরে দেখেছেন, অবিকল একই রকম। অবিকল! তাঁর শ্বশুর সাহেবের মতই তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যাচ্ছে হাসিনা। ঠিক একই পদ্ধতিতে।

আজকাল তো মেয়েটা কেবল নিজের মৃত্যু কামনা করে...

'এই দেখো তো, কী হলো আমার পিঠে...ভাল করে একটু পাউডার দিয়ে দাও। ঘামাচির যন্ত্রণায় আর টেকা যাচ্ছে না!'

জয়ার বাবা। মাত্র গোসলখানা থেকে বেরিয়েছে। পরনে লুঙ্গি, গলায় ঝোলানো ভেজা তোয়ালে। চোখে-মুখে চরম বিরক্তির ছাপ। ঘামাচির ওপরেই সম্ভবত।

পাউডারের কৌটাটা হাতে স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়ান নাসরিন বেগম। এবং আতঙ্কে জমে যান সাথে সাথেই...

জয়ার বাবার পিঠ জুড়ে ছোট ছোট ঘামাচির মতন। আর সেগুলো ভরা কালো কালো গুটিগুটি সেই পোকা। এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছে পিঠের চামড়া, যেভাবে জোঁক আঁকড়ে ধরে থাকে।

তাঁর চিনতে ভুল হয় না। তিনি নিশ্চিত জানেন...

এগুলো সেই পোকাই!!

কালো কালো গুটিগুটি। মানুষের শরীর আঁকড়ে বেঁচে থাকা...শ্বশুর সাহেব আর তাঁর স্ত্রীকে ধরেছিল যে পোকা। হাসিনাকে ধরেছে যে পোকা...

এগুলো সেই পোকাই।

নিঃসন্দেহে!!!

রুমানা বৈশাখী

বহুরূপী

এক

হায়দার সাহেব, তাঁর বাসার ছাদে, সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে বিশাল ভুঁড়িটা বাগিয়ে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর পরনে শুধু একটা সাদা হাফ প্যান্ট। শীতের সিজনে তাঁর প্রতিদিনকার রুটিন হচ্ছে—সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে ঘণ্টাখানেক রোদে বসে থাকা। এই বসা অবস্থায়ই খবরের কাগজ পড়া আর দুই টুকরো দারুচিনি, একটি এলাচি, দুটি তেজপাতা, দুটি লবঙ্গ আর আদা দিয়ে জ্বাল দেয়া এক মগ ধূমায়িত চা খাওয়া।

হায়দার সাহেবের কোল্ড অ্যালার্জি আছে। শীতের সিজন এলেই সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, টনসিল ফুলে ওঠা বিভিন্ন ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা লেগেই থাকে। এই সব সমস্যার জন্য তিনি অ্যালোপ্যাথির, হোমিওপ্যাথির অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত নামকরা এক কবিরাজের শরণাপন্ন হন তিনি। কবিরাজের নাম ভবেশ কর। অত্যন্ত গুণী কবিরাজ। কবিরাজ ভবেশ করই তাঁকে রোজ ঘণ্টাখানেক রোদে বসে থেকে, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাতা... দিয়ে জ্বাল দেওয়া চা খেতে বলেছেন। এই চিকিৎসার নাম রোদ চিকিৎসা।

গত তিন বছর ধরে শীত এলেই হায়দার সাহেব কবিরাজের পরামর্শ মত রোদ চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। রোদ চিকিৎসায় তাঁর শরীরের অনেক উন্নতি হয়েছে; এখন আর আগের মত ঠাণ্ডা, সর্দি-কাশি তাঁকে কাবু করতে পারে না।

হায়দায় সাহেব, কবিরাজ ভবেশ করের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতাবোধের কারণে তিনি প্রায়ই কবিরাজ ভবেশ করের সাথে দেখা করতে যান। আর প্রতিবারই কবিরাজ ভবেশ কর তাঁকে এক বোতল শক্তিরাজ সালসা ধরিয়ে দেন। শক্তিরাজ সালসা না-কি খুবই বলকারক আর রক্তবর্ধক। দাম মাত্র ষাট টাকা। বলকারক আর রক্তবর্ধক শক্তিরাজ সালসা খাওয়ার পরে প্রতিবারই হায়দার সাহেবের প্রচণ্ড পেট খারাপ করে। টয়লেটে যেতে যেতে তাঁর অবস্থা এমন হয় যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হামা দিয়ে চলা ফেরা করতে হয়।

কবিরাজ ভবেশ করের আবিষ্কৃত আরও অনেক ওষুধ রয়েছে—কুত্ততে জোয়ানী বটিকা, রতি বিলাস বটিকা, স্ত্রী বশীকরণ বটিকা, কামেশ্বর, আশ্চর্য মালিশ তেলায় মর্দ্দামী...সবই দুর্বল পুরুষের পুরুষত্ব বৃদ্ধির উপাদান। এর মধ্যে রতি বিলাস বটিকা হচ্ছে যে সমস্ত পুরুষের তিন-চারজন স্ত্রী তাদের জন্য।

কবিরাজ ভবেশ কর শুধুই যে পুরুষত্ব বৃদ্ধির ওষুধ তৈরি করেন তা নয়, তিনি হাঁপানী সেট, আমাশার যম, টাকের দুশমন, ডায়াবেটিক কিওর... এ ধরনের বিভিন্ন ওষুধও তৈরি করেন।

কবিরাজ ভবেশ কর, হায়দার সাহেবকে স্ত্রী বশীকরণ বটিকা, কামেশ্বর, আশ্চর্য মালিশ তেলায় মর্দ্দামী এ ধরনের ওষুধ নেয়ার জন্য অনেক সেধেছেন।

হায়দার সাহেব রাজি হননি। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন,

'এই আটান্ন বছর বয়সে স্ত্রী বশ করে কী লাভ!'

কবিরাজ ভবেশ কর উৎসাহিত গলায় বলেছেন, 'আরে দাদা, আপনার মত বয়সের লোকদের জন্যই তো এই সব ওষুধ তৈরি করি। জোয়ান ছেলে ছোকরাদের তো এমনিতেই স্ত্রী বশ করার ক্ষমতা থাকে। তবে এ কথা ঠিক বয়স্ক লোকদের চেয়ে এ ধরনের ওষুধ জোয়ান ছোকরারাই বেশি নেয়। তা হলে আপনি এক ফাইল জোয়ানি বৃদ্ধিকরণ বটিকা নিয়ে যান।'

হায়দার সাহেব বিরস মুখে বলেন, 'নারে ভাই, জোয়ানি বৃদ্ধির কোনও ইচ্ছেই আমার নেই।'

শেষ পর্যন্ত কবিরাজের মন রক্ষার্থে হায়দার সাহেবকে এক ফাইল শক্তিরাজ সালস, নিয়ে ফিরতে হয়। ও খেলেই ফলাফল ডায়েরিয়া!

রোদের মধ্যে হায়দার সাহেব প্রায় পৌনে এক ঘন্টা খবরের কাগজের খুঁটিনাটি পাত্র চাই-পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনগুলোও পড়লেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁর চা দেওয়া হয়নি। রোদের তেজ বেড়েছে—গা চিড়বিড় করছে, চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি দেওয়া বিশেষ চা'টা আবার রোদের ভিতর বসেই খাওয়ার নিয়ম। তিনি বসা অবস্থায়ই চিলেকোঠার দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। না, কেউ আসছে না, সিঁড়ি বেয়ে কারও ওঠার পদশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ির সব কী এক সাথে মরল নাকি! প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হচ্ছে তাঁর। বাড়িতে চার জন মেয়ে মানুষ—হায়দার সাহেবের স্ত্রী লতিফা বেগম, দুই মেয়ে লিলি, লাবনি, কাজের মেয়ে সকিনা। কারও কোনও খেয়ালই নেই, বাড়ির কর্তা লোকটা যে রোদের ভিতরে বসে বসে পুড়ছে।

হায়দার সাহেবের স্ত্রী লতিফা বেগমের বয়স পঞ্চাশ। কিছুটা

বোকাসোকা টাইপের মহিলা। মোটাসোটা থলথলে শরীর। মাথার দু-পাশের চুলে পাক ধরেছে। ভোঁতা নাক। গরুর মত বেমানান বড়বড় দুটি চোখ। গায়ের রং শ্যামলা। যেমন মোটা তেমন লম্বা, যাকে বলে হস্তিনী টাইপের মেয়ে লোক। অথচ এই লতিফাকেই বিয়ের আগে যখন হায়দার সাহেব দেখতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল নায়িকা শাবানা।

হায়দার সাহেবের বড় মেয়ের নাম লিলি। মাস্টার্স কমপ্লিট করে ঘরে বসে আছে। বিয়েও হচ্ছে না, চাকরিও হচ্ছে না। বিয়ে হবেই বা কী করে, মায়ের চেহারা, আকৃতি, গুণ সবই পেয়েছে। দিনে-দিনে মায়ের ডুপ্লিকেট কপি হয়ে উঠছে। পাত্রপক্ষ দেখতে এসে, কয়েক প্রকারের মিষ্টান্ন, ফল, পিঠা, চা-নাস্তা ধ্বংস করে চলে যাবার সময় গম্ভীর মুখে বলে যায়, সিদ্ধান্ত পরে জানাবে। সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় বেশ কিছু দিন কেটে যায় কিন্তু পাত্রপক্ষের সিদ্ধান্ত আর জানা হয় না। আবার নতুন কোনও পাত্রপক্ষ আসে। আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আজকাল তো হায়দার সাহেবের মত বলদ পাত্র নেই যে হস্তিনী দেখে নায়িকা ঐশ্বরিয়া ভাববে।

হায়দার সাহেবের মাঝে-মাঝে সন্দেহ তাঁর এই হাবাগোবা মেয়ে কী করে মাস্টার্স পাশ করেছে! নিশ্চয়ই পাশের ছাত্রীর খাতা দেখে লিখে। তা না হলে এ ধরনের হাবাগোবা মেয়ের পাশ করার কথা নয়। বর পক্ষ যখন জিজ্ঞেস করেন, 'মা তুমি কী কী রাঁধতে পারো?' তখন মেয়ে শুরু করে তার কী-কী খেতে ভাল লাগে সেই ফিরিস্তি। খাসির রেজালা তার খুব প্রিয়, সে এক বৈঠকে বড় বাটির তিন বাটি রেজালা খেতে পারে। ইলিশ মাছও খুব প্রিয়, ইচ্ছে করলে সে বড় একটা ইলিশ মাছ একাই খেয়ে উঠতে পারে। তার গরম জিলাপি খুব প্রিয়, সে এক বৈঠকে দুই-

আড়াই কেজি জিলাপি খেয়ে ফেলতে পারে...

বর পক্ষ মেয়ের ওই সব রাক্ষসিনী টাইপের খাওয়ার কথা জেনে তখনই চোখ বড়-বড় করে উঠে পড়ে। কী বেহায়া মেয়ে! বর পক্ষ চলে যেতে না যেতেই, বর পক্ষের সামনে দেয়া মিষ্টান্ন, পিঠা, ফল গপগপ করে গিলতে শুরু করে।

হায়দার সাহেবের ছোট মেয়ের নাম লাবনি। এই মেয়েটাকে হায়দার সাহেব খুব পছন্দ করেন। যেমন বুদ্ধিমতি তেমন সুন্দর চেহারা। একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে। এই মেয়েটা চেহারা পেয়েছে হায়দার সাহেবের মায়ের। হায়দার সাহেবের মা সেই কবে মারা গেছেন! ছোট মেয়েটাকে দেখলেই তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে। মায়ের মত টানাটানা মায়াকাড়া চোখ, মাথা ভর্তি রেশমি কালো কোমল চুল, উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং...যেন মা আবার মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে।

হায়দার সাহেবের ছোট মেয়ে লাবনি এবারে অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রী। খুবই মেধাবী। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি উভয় পরীক্ষারই রেজাল্ট এ প্লাস। লাবনিকে নিয়ে হায়দার সাহেবের অনেক আশা।

রোদে পুড়তে-পুড়তে হায়দার সাহেবের মেজাজ যখন পুরোপুরি বিগড়ে গেল তখন তাঁর স্ত্রী লতিফা বেগম চা হাতে ছাদে এসে উপস্থিত হলেন।

লতিফা বেগমের সারা মুখে হলুদ আঠালো কী যেন মাখা। উপটান বোধ হয়। এই বয়সেও রূপচর্চা! হায়দার সাহেবের মেজাজ আরও এক ডিগ্রি চড়ল। তাঁকে রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে উনি ঘরের ভিতরে বসে রূপ সাধনা করছেন! মনে-মনে তিনি আরও একটা কুৎসিত কথা বললেন, যে না চেহারা কুত্তায়

দেয় পাহারা।

চায়ের মগে চুমুক দিয়ে হায়দার সাহেবের মেজাজ আরও এক ডিগ্রি খারাপ হলো। চা যেমন ঠাণ্ডা তেমন মিষ্টি। মনে হচ্ছে—তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি দেওয়া খেজুরের রসের পায়েসের ঝোল খাচ্ছেন।

হায়দার সাহেব যতটা সম্ভব নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'চা দিতে এত দেরি হলো কেন? তুমি জানো না রোদে বসার আধা ঘণ্টার মধ্যে আমার চা খাওয়ার নিয়ম?'

লতিফা বেগম কিশোরীদের মত আহ্লাদি গলায় বলে উঠলেন, 'চা তো তোমার সেই আধা ঘণ্টা আগেই বানানো হয়েছে। ঝামেলা বাধাল তো লিলি। আমরা সব সময় উপটান দিই ঠাণ্ডা পানি বা গরুর দুধ দিয়ে লেই বানিয়ে। কিন্তু আজ লিলি বলল, উপটান মাখবে গরম চা দিয়ে লেই বানিয়ে। তাই তোমার চা থেকে সামান্য একটু চা নিয়ে উপটানের লেই বানানো হলো। গরম-গরম মুখে মাখলাম। বেশ আরাম লেগেছে। শীতের দিনে উপটান মাখার এটি খুবই উৎকৃষ্ট পন্থা। মনে হয় কাজও হবে ডাবল।'

হায়দার সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে রেখে বললেন, 'তা উপটানের জন্য চা রাখার পরে সাথে সাথেই তো চা'টা দিয়ে যেতে পারতে বা সকিনাকে দিয়েও পাঠাতে পারতে।'

'আরে উপটানের লেই বানানোই তো শেষ নয়, সঙ্গে-সঙ্গে মুখেও লাগাতে হবে। তা না হলে শুকিয়ে যাবে। আর সকিনা! সকিনাও তো উপটান মেখেছে। উপটান মাখা অবস্থায় সে তোমার কাছে আসতে লজ্জা পায়।'

হায়দার সাহেব ভাবছেন, তাঁর স্ত্রী লতিফা বেগম আর বড় মেয়ে লিলিকে যদি সকাল বিকেল দুই বেলা প্রতিদিন থাবড়ানো

যেত, তা হলে তিনি বেশ শান্তি পেতেন। কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে উপটান মাখামাখি! যত সব বেআক্কেল, ব্রেইন লেস।

হায়দার সাহেব মনের ভাবনাগুলো মনেই পুঁতে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'গিজার অন করে পানি গরম করা হয়েছে? আমি এখন গোসল করতে যাব।'

'হ্যাঁ, হয়েছে, জলদি যাও গোসল সেরে এসো।'

হায়দার সাহেব গিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। কল ছেড়ে দেখেন পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। গিজার অন করে পানি গরম করা হয়নি।

দুই

হায়দার সাহেবের দোতলা বাড়ি।

বাড়ির দোতলায় হায়দার সাহেবরা থাকেন আর একতলা ভাড়া দেওয়া হয়। গত তিন-চার মাস ধরে একতলা খালি পড়ে ছিল, ভাল ভাড়াটিয়া পাওয়া যাচ্ছিল না। শহরতলির বাড়ি বলে ভাল ভাড়াটিয়া পেতে বেশ সমস্যাই হয়। হায়দার সাহেব আবার যাকে তাকে বাড়ি ভাড়া দেন না। ভাল লোক, ভাল ফ্যামিলি দেখে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়াদের অবিবাহিত ইয়ং ছেলে থাকলেও ভাড়া দেন না। কারণ তাঁর ঘরে অবিবাহিত দুটি মেয়ে আছে।

বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়েই যে তাঁকে চলতে হবে এমন নয়। তিনি একটা সরকারি ব্যাংকের ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার

করেছিলেন। রিটায়ার করার পর জি.পি ফাণ্ড, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সব মিলিয়ে বেশ ভাল একটা অ্যামাউন্ট পান তিনি। সব টাকা ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন। কিছু ফিক্সড ডিপোজিট করে, কিছু সঞ্চয়পত্র করে। নিয়মিত ফিক্সড ডিপোজিট ও সঞ্চয়পত্রের মুনাফা পান। এ ছাড়া প্রতি মাসের পেনশনের টাকা তো আছেই। তাই বাড়ি ভাড়া দেবার জন্য তিনি তেমন মরিয়া নন।

শেষ পর্যন্ত হায়দার সাহেব এক ভাল ভাড়াটিয়া পেয়েছেন। নব দম্পতি। ভাড়াটিয়া ছেলেটির নাম জাহিদ। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী চেহারা। মার্জিত ব্যবহার। কী একটা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করে। শুধু স্বামী-স্ত্রী দু'জনই থাকবে।

বাসা দেখতে জাহিদ একাই এসেছিল, সঙ্গে স্ত্রীকে আনেনি। বাসা দেখে খুব পছন্দ করে। শহরতলির এমন নিরিবিলি বাসাই সে মনে-মনে খুঁজছিল।

জাহিদের বাসা পছন্দ হবার পরেও হায়দার সাহেবের মনে খুঁত-খুঁতানি ছিল—স্ত্রীকে সঙ্গে আনেনি, আবার একদিন স্ত্রীকে নিয়ে বাসা দেখতে আসবে, স্ত্রী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাসার বিভিন্ন সমস্যা খুঁজে বের করবে—বাথরুমটা ছোট, এই কলটা দিয়ে সারাক্ষণ টপ-টপ করে পানি পড়ে, রান্নাঘরটায় কেমন গুমোট ভাব, বেড রুমটা পূর্ব পাশে, সকাল হতে না হতেই চোখে রোদ পড়বে, বারান্দাটা পশ্চিম পাশে, বিকেলে বারান্দায় বসা যাবে না—আরও কত কী! খুঁত ধরতে তো মেয়েদের জুড়ি নেই।

জাহিদ, হায়দার সাহেবকে অবাক করে দিয়ে বাড়ি ভাড়ার এক বছরের টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করে। আজকাল যেখানে ভাড়াটিয়ারা তিন মাসের অগ্রিম দিতে চায় না, সেখানে এক বছরের অগ্রিম!

হায়দার সাহেব ভাড়ার টাকা গুনতে গুনতে ইতস্তত গলায় বলেছেন, 'ভাড়া পেমেন্ট করার আগে তোমার স্ত্রীকে এনে একবার দেখালে হতো না।'

জাহিদ হাসি মুখে উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছে, 'আংকেল কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যে বাসা পছন্দ করব স্ত্রীও সে বাসা পছন্দ করবে। আমি যদি তাকে কুঁড়ে-ঘরে নিয়ে উঠাই সে তাও হাসি মুখে মেনে নেবে।'

জানুয়ারি মাসের এক তারিখে জাহিদরা বাসায় উঠবে।

জাহিদ ছেলেটাকে হায়দার সাহেবের খুবই পছন্দ হয়েছে। প্রথম দেখাতেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, খুবই ভাল ছেলে। যেমন ভদ্র-বিনয়ী তেমন সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা। গায়ের রংটাও বেশ ফর্সা। উঁচু নাক। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ। ভরাট বনেদি মুখমণ্ডল। ভারি পুরুষালি গলার স্বর। সব মিলিয়ে চমৎকার একটা ছেলে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হায়দার সাহেব ভাবেন, তাঁর ছোট মেয়েটার যদি এমন একটা ছেলের সাথে বিয়ে হত কী মানাত! সুদর্শন-সুদর্শনা এক জোড়া কপোত-কপোতি! জাহিদ ছেলেটার স্ত্রী দেখতে কেমন কে জানে? আজকাল তো আবার সুদর্শন ছেলেগুলোর কপালে জোটে পেত্নীর মত বউ আর সুন্দরী মেয়েদের কপালে জোটে ইয়া মোটা কুস্তিগীরের মত বর, নয়তো মুখপোড়া বান্দরের মত বর।

জানুয়ারি মাসের এক তারিখ।

নতুন ভাড়াটিয়া জাহিদের স্ত্রী রুনু একটা পিকআপ ভ্যানে করে তাদের সমস্ত আসবাবপত্র আর মালামাল নিয়ে এসে হায়দার সাহেবদের বাসায় ওঠে। জাহিদ আসেনি। জাহিদ নাকি তার অফিসে খুবই ব্যস্ত। বেসরকারি কোম্পানির চাকরি, সারা

দিন-রাত নাকি খাটায়। এমনকী শুক্রবার দিনও অফিস খোলা থাকে।

জাহিদের স্ত্রী রুনু কুলিদের দিয়ে পিকআপ ভ্যান থেকে মালামাল বাসার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। গোছগাছ করতে তেমন কোনও সমস্যাই হয় না তার। ঘর গোছানোর কাজে রুনুকে বাড়িওয়ালার স্ত্রী লতিফা বেগম এবং লতিফা বেগমের কাজের মেয়ে সকিনা অনেক সাহায্য করেছে। অবশ্য রুনুদের মালামাল বলতে তেমন কিছু নেই। একটা ডাবল খাট, একটা আলনা, একটা ফ্রিজ আর ডাইনিং টেবিল-চেয়ার। কোনও হাঁড়ি-পাতিল নেই দেখে লতিফা বেগম অবাক হয়ে বলেছেন, 'এ-কী, তোমাদের হাঁড়ি-পাতিল কোথায়? রান্না করবে কীসে?'

রুনু হেসে বলে, 'নতুন সংসার তো, এখন পর্যন্ত কেনা হয়নি। আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ও কিনে আনবে। এতদিন তো আমি ওর সাথে ছিলাম না, গতকালই মাত্র আমি বাপের বাড়ি থেকে এসেছি।'

ঘরদোর ঝাড়-পোঁছ দিয়ে সম্পূর্ণ গোছগাছ করতে রুনুর বেলা দুইটা বেজে গেল।

বাড়িওয়ালী লতিফা বেগমের সাথে রুনুর এরই মধ্যে বেশ খাতির জমে উঠেছে। রুনু, লতিফা বেগমকে খালাম্মা বলে ডাকে। লতিফা বেগমও তাকে রুনু মা বলে ডাকেন।

লতিফা বেগম রুনুকে দুপুরের খাওয়ার জন্য অনেক সেধেছেন। রুনু রাজি হয়নি। লতিফা বেগম কপট রাগের সাথে বলেছেন, 'হাঁড়ি-পাতিল তো কিছুই নেই, দুপুরে খাবে কী?'

রুনু হাসি মুখে বলেছে, 'খালাম্মা, আমার সাথে এক প্যাকেট বিরিয়ানী আছে, গোসল সেরে সেটাই খাব। আর রাতে তো ও বাজার-সদাই হাঁড়ি-পাতিল নিয়েই আসবে।'

নতুন ভাড়াটিয়া জাহিদের স্ত্রী রুনুকে দেখে হায়দার সাহেব একেবারে হতবাক হয়ে যান। কোনও বাঙালি মেয়ে যে এতটা সুন্দরী হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। মেয়েটা বেশ লম্বা—কিছুটা পাকিস্তানি মেয়েদের মত। গায়ের রং দুধে-আলতা। টানাটানা আয়ত চোখ। দীর্ঘ আঁখি পল্লব। পাতলা চিকন ভুরু। উঁচু টিকালো নাক। প্রশস্ত কপাল। ঢেউ খেলানো দীর্ঘ চুল। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট।

হায়দার সাহেব রোদ চিকিৎসা গ্রহণ শেষে গোসল সেরে, একতলায় এসে রুনুর সাথে পরিচিত হন। রুনু খুবই সাবলীল ভাবে হায়দার সাহেবকে খালুজান সম্বোধন করে সালাম দেয়। মেয়েটার গলার স্বরও বেশ মিষ্টি।

হায়দার সাহেব রুনুর সাথে সাধারণ সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তা সেরে সঙ্গে-সঙ্গেই দোতলায় ফিরে যান। রুনুর সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর মনের ভিতর খটকা লেগে যায়। মেয়েটা কেমন অস্বাভাবিক রকমের সুন্দর! কিছু কিছু সৌন্দর্য আছে ঠিক মেনে নেয়া যায় না, মনে হয় কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা। রুনু মেয়েটার সৌন্দর্যও মেনে নেয়া যাচ্ছে না। অস্বাভাবিক লাগছে। মানুষ কী করে এত সুন্দর হতে পারে!

বিকেলে হায়দার সাহেবের দুই মেয়ে লিলি আর লাবনি তাদের নতুন ভাড়াটিয়া রুনুর সাথে পরিচিত হয়।

রুনু খুবই আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করে বাড়িওয়ালার দুই মেয়েকে ঘরে নিয়ে বসায়।

রুনুর সৌন্দর্য দেখে দুই বোনই বেশ অবাক হয়। মেয়েটা এতই সুন্দর যে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয়—তার গা

থেকে যেন উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

কাজের মেয়ে সকিনা আগেই বলেছিল, 'আফা, নতুন ভাড়াটিয়া আফা যে কী সোন্দর তা ভাবতেই পারবেন না।' তখন লিলি ও লাবনি ভেবেছে সকিনা বাড়িয়ে বলছে। এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েটা সকিনার বর্ণনার চেয়েও সুন্দরী।

সহজ-সরল টাইপের লিলি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, 'রুনু আপা, আপনি এত সুন্দর হলেন কী করে? এত সুন্দর মেয়ে এর আগে আমি আর দেখিনি!'

রুনু সলজ্জ হেসে বলল, 'সুন্দর কী কেউ নিজে-নিজে হতে পারে, সৃষ্টিকর্তা যাকে যেমন বানায়।'

লিলি কপট রাগের সাথে বলল, 'সৃষ্টিকর্তা শুধু আপনার বেলায়ই এত উদার হলো, আমাদের ক্ষেত্রে এত কৃপণতা কেন?'

লিলির কথা শুনে রুনু সুন্দর করে হাসল। তার ঝকঝকে মুক্তোর মত দাঁত দেখা গেল।

সারা বিকেলটা কাটল রুনু, লিলি আর লাবনি তিনজনের আড্ডায়। হাসি-ঠাট্টা, তামাশায় ছিল পরিপূর্ণ। রুনুর সাথে লিলির সম্পর্কও বেশ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তবে চুপচাপ স্বভাবের লাবনি তেমন স্বাভাবিক হতে পারল না। সে সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে গভীর মনোযোগের সাথে রূপবতী রুনুকে পর্যবেক্ষণ করছে। রুনুর সৌন্দর্যে সেও বেশ অবাক হয়েছে। তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছে রুনুর চেহারায় সৌন্দর্যের আড়ালে এক ধরনের কাঠিন্য দেখে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে, রূপবতী রুনুর গা থেকে কাঠ পোড়া ঝাঁজালো গন্ধের সাথে টক দৈ-এর গন্ধ মেশালে যেমন গন্ধ হবে, সে ধরনের উৎকট ঝাঁজালো একটা গন্ধ পাওয়া যায়। কাছে গেলে গন্ধটা তীব্র হয়।

অথচ সে গায়ে পারফিউমও মেখেছে। পারফিউমের গন্ধকেও হার মানিয়ে উৎকট ঝাঁজালো গন্ধটা পাওয়া যায়।

তিন

অনেক রাত। সবাই গভীর ঘুমে।

হায়দার সাহেবদের কাজের মেয়ে সকিনার থাকার ব্যবস্থা রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট কামরায়।

সকিনা তার কামরায় মেঝেতে তোষক বিছিয়ে ঘুমানো। লেপ গায়ে। শুধু সকিনার মুখটা লেপের বাইরে। অন্ধকার কামরা। হঠাৎ অদ্ভুত অস্বস্তিবোধে সকিনার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তার মুখের উপরে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। নিঃশ্বাসে বোটকা গন্ধ। এ ছাড়া ঝাঁজালো উৎকট আরও একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সকিনা ঘুম ভেঙে 'ও মাগো' বলে চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে ঘরের আলো জ্বালল। এত দিনের পরিচিত ছোট্ট কামরার সুইচবোর্ড খুঁজে পেতে তার বেগ পেতে হলো না। ঘর আলোকিত হতেই সকিনা দেখল, মিশমিশে কালো, মোটাসোটা একটা বিড়াল ঘরের ভিতরে। বিড়ালটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। বিড়ালটার চেহারা যেমন নাদুস-নুদুস তাতে মনে হচ্ছে ওটা হুলো বিড়াল। সকিনা হাত উঁচিয়ে 'হুস-হুস' শব্দ করল। বিড়ালটা একচুলও নড়ল না, হিংস্র বুনো দৃষ্টিতে সকিনার দিকে তাকিয়ে ঘড়-ঘড় করে এক ধরনের শব্দ করতে লাগল। সকিনা, 'হায়...হুস...' করতে-করতে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেল। হঠাৎ বিড়ালটা লাফ

দিয়ে যেন উড়ে এসে সকিনার মুখের উপর খামচে ধরল। 'ও মাগোরে...ও বাবারে...' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল সকিনা।

চিৎকারের শব্দে ওপাশের কামরা থেকে হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম ঘুম ভেঙে ছুটে এলেন। ততক্ষণে খোলা জানালা দিয়ে বিড়াল পালিয়ে গেল। বিড়ালটা আঁচড়ে-খামচে সকিনার মুখ-গলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। রক্তাক্ত মুখমণ্ডল। হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম সকিনার অবস্থা দেখে হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা কী করবেন ভেবে পেলেন না।

সকিনা রক্তাক্ত মুখে হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগমের দিকে তাকিয়ে 'আম্মাগো, মোরে বিলই হাঁরামজাদা মাইরা ফালান ধরছেলে' বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

হায়দার সাহেব গলা উঁচিয়ে লতিফা বেগমকে বললেন, 'জলদি স্যাভলন আর তুলা নিয়ে এসো।'

লতিফা বেগম তুলা আর স্যাভলন আনতে তাঁদের বেড রুমের দিকে ছুটে গেলেন।

সকিনার কান্না আর হায়দার সাহেব ও লতিফা বেগমের চিৎকার চেঁচামেচিতে লিলি ও লাবনিও ঘুম থেকে উঠে এল।

ভোরবেলা সকিনার গায়ে উথালপাথাল জ্বর উঠল। জ্বরের ঘোরে বিভিন্ন প্রলাপ বকতে থাকে সকিনা, 'বিলই... কালা বিলই...ওরে মোরে কামর দিবে...যাঃ...যাঃ...হায়...হুস...'

একটু বেলা হওয়ার পরে হায়দার সাহেব গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন।

ডাক্তার সাহেব সকিনাকে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, জ্বরের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ আর ক্ষত শুকানোর ওষুধ প্রেসক্রাইব

করে চলে যান। ডাক্তার সাহেব বলে যান—ভয়ের কিছু নেই, জ্বর আজ দিনের মধ্যেই কমে যাবে, আর ক্ষত শুকানোর যে ওষুধ লিখে দিয়েছেন তা নিয়মিত খেলে তিন-চার দিনের মধ্যে ক্ষতও শুকিয়ে যাবে। অন্যথা হলে আবার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

সকিনা অসুস্থ বলে ঘরের বিভিন্ন কাজ—ঘর ঝাড়-পোঁচ করা, তরকারি কাটা, রান্না করা, কাপড়-চোপড় ধোয়া... সব লতিফা বেগম, লিলি আর লাবনি ভাগ করে নিয়েছে। রান্না-বান্নার দায়িত্ব পড়েছে লিলি আর লাবনির উপর। লতিফা বেগমের হাই ব্লাড প্রেসার বলে তিনি চুলার পাশে যান না। আগুনের আঁচে তাঁর ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।

রান্নাঘরে লিলি-লাবনি দুবোন রান্না করছে। লাবনি তার স্বভাবসুলভ চুপচাপ কাজ করছে আর লিলিও তার স্বভাবসুলভ বকবক করছে। নানান প্রসঙ্গ টেনে এনে বকবক করছে। প্রসঙ্গক্রমে সকিনার কথা উঠলে রসিকতা করছে, 'সকিনার ঘরে হুলো বিড়ালটা এসেছিল কেন জানিস?' হি...হি...করে হাসতে-হাসতে বলছে, 'হুলো বিড়ালটা ওকে একটা মেনি বিড়াল ভেবেছিল...'

'আপা থামবি।' রাগী গলায় ধমক দেয় লাবনি।

লিলি হাসি চেপে রেখে বিভিন্ন কুৎসিত আর অশ্লীল মন্তব্য করতেই থাকে।

লাবনি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এত দিন জানতাম তোর বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, এখন দেখছি তোর মায়া-মমতাও কম। দেখেছিস সকিনার কী অবস্থা হয়েছে? মেয়েটা কী কষ্ট পাচ্ছে! মুখটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।'

ছোট বোনের ধমক খেয়ে লিলি কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যায়। একটু পরেই আবার আগের মত বকবক শুরু করে।

দুপুরের পরে সকিনার জ্বর কমতে শুরু করে।

লতিফা বেগম সকিনার মাথায় পানি দিয়ে, মুখের, গলার ক্ষতগুলো হেক্সিসলে তুলা ভিজিয়ে মুছে দেন।

সকিনাকে এখন অনেকটাই সুস্থ দেখাচ্ছে। মুখের ফোলাও অনেক কমেছে।

লতিফা বেগম নিজের হাতে ভাত মাখিয়ে সকিনাকে জোর করে কয়েক নলা ভাত খাইয়ে দেন। ভাত খাওয়ানো শেষে ওষুধ খেতে দেন। ওষুধ খাওয়া শেষে সকিনাকে আবার শুয়ে পড়তে বলেন।

সকিনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে লতিফা বেগম বললেন, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, নারে?'

সকিনার মুখের ও গলার ক্ষতগুলোতে বেশ জ্বালা-যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু সকিনা মুখে বলল, 'না, আম্মা, এট্টুও কষ্ট হইতেছে না। মুই ঠিক হইয়া গেছি। আমনে নিজের ঘরে গিয়া আরাম করেন।'

লতিফা বেগম চলে গেলেন। যাওয়ার আগে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন আর বললেন, 'কোনও দরকার হলেই আমাকে ডাকবি।'

সকিনার চোখ ভিজে উঠল।

জন্মের সময়ই সকিনার মা মারা যায়। ঘরে আসে সৎ মা। সকিনার এক খালার কোলে সকিনা বড় হয়। খালার অবস্থা তেমন ভাল নয়—নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা। একটু বড় হওয়ার পর সকিনার খালা সকিনাকে তার বাপের কাছে ফিরিয়ে দেয়। রিকশা চালক বাপের ঘরে সৎ মায়ের জ্বালায় সকিনা অস্থির হয়ে ওঠে। সকিনাদের একই গ্রামে লতিফা বেগমদের বাড়ি। সেবার লতিফা বেগম যান তাঁর বাপের বাড়ি বেড়াতে। বেড়াতে গিয়ে সৎ

মায়ের ঘরে সকিনার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে সকিনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তখন সকিনার বয়স সাত-আট বছর। সেই থেকেই সকিনা এই বাড়িতে।

সকিনা খুবই পছন্দ করে লতিফা বেগমকে। সে মুখে লতিফা বেগমকে আম্মা ডাকে কিন্তু মনে মনে ডাকে মা। এতদিন পর্যন্ত এই বাড়িতে কিন্তু কোনও দিন লতিফা বেগম তার গায়ে হাত তোলেননি, এমনকী কড়া ভাষায় কখনও ধমকও দেননি। কোনও ভুল করলে বা কাপ-পিরিচ, গ্লাস ভাঙলেও তিনি একটুও ধমকা-ধমকি করেন না। অথচ সকিনা শুনেছে অন্যান্য বাড়িতে কাজের মেয়েদের উপর কী অত্যাচার-নির্যাতন চলে। অত্যাচার নির্যাতন দূরে থাক, অসুখ-বিসুখ করলে লতিফা বেগম মায়ের মত নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দেন, ওষুধ খাইয়ে দেন, সেবা-যত্ন করেন।

বিকেলে একতলার ভাড়াটিয়া রুনু আপা সকিনাকে দেখতে আসে। আজ সে গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। কপালে ছোট্ট একটা টিপ। খোলা চুল। কী যে সুন্দর লাগছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না!

রুনু আপার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে লিলি যেন কী বলছে আর ফিকফিক করে হাসছে। রুনু আপার ঠোঁটেও হাসির রেখা। মনে হয় লিলি বলছে, সকিনার ঘরে হুলো বিড়াল কেন এসেছিল, সেই ব্যাখ্যা।

রুনু আপা লিলিকে সঙ্গে নিয়ে সকিনার কামরায় ঢোকে। সকিনার কপালে হাত রেখে জ্বর দেখে। সকিনা ঘুমন্ত ছিল। হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে ভীত চোখে রুনু আপার দিকে তাকিয়ে থাকে সকিনা। ওর চমকানোর কারণ, গতরাতে বিড়ালের গা থেকে সে যে ঝাঁজালো গন্ধটা পেয়েছে সেই একই গন্ধ সে এখন আবার

তীব্র ভাবে পাচ্ছে।

রাতে সকিনাকে এক গ্লাস দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়ানো গেল না। লতিফা বেগম নিজ হাতেই সকিনাকে দুধ খাওয়ান। দুধ খাওয়া শেষে ওষুধ।

সকিনাকে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। তার পরেও লতিফা বেগম সকিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ রাতে কি আমি তোর কাছে শোব? একা ঘুমাতে তুই ভয় পাবি না তো?'

সকিনা সুস্থ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'না, আম্মা, কোনও দরকার নেই। আইজও যদি বিলাইডা আয় তয় পিডাইয়াই ওডারে মাইরা ফালামু।'

রাত বারোটার দিকে যে যার কামরায় ঘুমাতে চলে যায়। সকিনাও নিজের কামরায় ঘুমিয়ে পড়ে।

খুব ভোরে লতিফা বেগমের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠেই তিনি সকিনার খোঁজ নিতে আসেন। সকিনার বিছানা খালি, সকিনা বিছানায় নেই। লতিফা বেগম ভাবেন, সকিনা বুঝি টয়লেটে গিয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি সকিনার খোঁজে টয়লেটের সামনে গিয়ে দেখেন, সকিনা টয়লেটে যায়নি। তা হলে গেল কোথায় অসুস্থ মেয়েটা! নীচে গেল? নীচে যাওয়ার উদ্দেশে লতিফা বেগম এগিয়ে দেখেন ঘরের সদর দরজা ভিতর থেকে আটকানো। তা হলে সকিনা কোথায়? তিনি সমস্ত ঘরে, ছাদে সকিনাকে খোঁজেন। না, কোথাও সকিনা নেই!

লতিফা বেগম ডেকে-ডেকে ঘরের সবাইকে ঘুম থেকে জাগান। সবাইকে একত্রিত করে সকিনাকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তা জানান। অথচ ঘরের সদর দরজা ভিতর থেকে আটকানো।

হায়দার সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'সকিনা হয়তো

রাতেই সবার অগোচরে বাইরে গিয়েছিল, তার পরে কেউ হয়তো দরজা আটকিয়ে দিয়েছে।'

লতিফা বেগম চিন্তিত গলায় বললেন, 'তা হলে মেয়েটা সারা রাত ধরে কোথায়?'

'দেখ, আশপাশে খোঁজ-খবর করে। একতলায় জাহিদদের ঘরেও থাকতে পারে।'

সকিনাকে আশপাশে সব জায়গায় খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

হায়দার সাহেব ভেবে বের করলেন, সকিনা তার দেশের বাড়ি তার খালার কাছেও যেতে পারে। খোঁজ নিতে সেখানেও লোক পাঠানো হলো।

রাত দশটা পর্যন্ত সকিনার কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। রাত সাড়ে দশটার দিকে সকিনার দেশের বাড়িতে খোঁজ নিতে যাওয়া লোকটা ফিরে এল। সকিনা সেখানেও যায়নি।

হায়দার সাহেব গভীর ভাবনায় পড়লেন। এখন তিনি কী করবেন? কোথায় খোঁজ করবেন সকিনার? ভেবে-ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন, স্থানীয় থানায় জানাবেন।

রাত বারোটা বেজেছে। এত রাতে একা-একা থানায় যেতে হায়দার সাহেব অস্বস্তি বোধ করেন। ভাবেন, একতলার ভাড়াটিয়া জাহিদ ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। জাহিদের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, জাহিদ এখনও বাসায় ফেরেনি। জাহিদের স্ত্রী রুনু জানায়, 'খালুজান, একটু অপেক্ষা করুন ও এখনই ফিরে আসবে।'

হায়দার সাহেব দোতলায় ফিরে এসে ঝিম মেরে বসে জাহিদের ফেরার অপেক্ষা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহিদ এসে উপস্থিত হয়।

থানার ওসি সাহেব মিসিং ডায়েরী করে রেখে যেতে বলেন। সকিনার কোনও ছবি থাকলে কাল এসে থানায় জমা দিতে বলেন। এ ছাড়া ওসি সাহেব আরও অনেক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নও করেন।

'মেয়েটার বয়স কত?'

'এই একুশ-বাইশ বছর।'

'আই সি, যুবতী মেয়ে! তা আপনি ছাড়া বাড়িতে আর কোনও ইয়ং ছেলে-টেলে আছে?'

'না, নেই।'

'কারও সাথে প্রেম-ট্রেম করত নাকি?'

'আমার জানা নেই।'

'বাড়িতে কোনও ইয়ং ছেলের আসা-যাওয়া আছে?'

'না, নেই।'

কত বছর ধরে বাড়িতে আছে? চেহারা কেমন? দেশের বাড়ি কোথায়? কেমন স্বভাবের?...আরও অনেক প্রশ্ন।

জাহিদকেও কিছু প্রশ্ন করেন ওসি সাহেব। কবে থেকে হায়দার সাহেবদের বাড়িতে ভাড়া থাকছে? কয়জন সদস্যের পরিবার? আগে কোথায় ছিল? কী করে?

থানা থেকে বেরুতে রাত দুইটা বেজে যায়। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। বেশ কুয়াশা। শীতটাও যেন জাঁকিয়ে পড়েছে। কোনও খালি রিকশা পাওয়া গেল না। হায়দার সাহেব আর জাহিদ হেঁটে-হেঁটে বাড়িতে ফিরতে লাগলেন। চুপচাপ দু'জনে হেঁটে চলছেন।

হায়দার সাহেবের মনটা খুব খারাপ। একে সকিনাকে খুঁজে না পাওয়ার দুশ্চিন্তা তার উপর ওসি সাহেবের কথার ধরন-ধারণও ভাল লাগেনি। বাড়ির কাজের মেয়ে নিখোঁজ হলে আজকাল বেশ

ঝামেলায় পড়তে হয়। পুলিশ প্রথমেই সন্দেহ করে বাড়ির লোকজনদের।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হায়দার সাহেব কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। পাশে-পাশে হাঁটছে জাহিদ। হঠাৎ হায়দার সাহেব লক্ষ করলেন, জাহিদের গা থেকে ভুরভুর করে টকটক ঝাঁজালো একটা উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। তিনি বেশ অবাক হন। এমন সুদর্শন একটা ছেলের গায়ে এরকম বিচ্ছিরি গন্ধ! আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে তিনি অবাক হন, এই প্রচণ্ড শীতের মাঝেও জাহিদের গায়ে পাতলা একটা শার্ট! আরও একটা ব্যাপার তিনি দেখেও দেখেননি বলে ধরে নেন, স্ট্রিট লাইটের আলোতে তাঁর একার ছায়া পড়ছে, জাহিদের কোনও ছায়া পড়ছে না। দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে হয়তো ভুল দেখছেন তিনি। মাথাটা কেমন ভার-ভার লাগছে, জ্বর আসছে নাকি কে জানে।

চার

একটা মাস চলে গেল। সকিনার কোনও খোঁজই মিলল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মেয়েটা। পুলিশকে জানিয়ে লাভের লাভ কিছুই হলো না। উল্টো হায়দার সাহেবদের অহেতুক পুলিশী হয়রানির শিকার হতে হলো। প্রতিনিয়ত পুলিশের বিভিন্ন উল্টা-পাল্টা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। পুলিশ আশপাশের বাড়ির লোকজনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করল। সকিনা মেয়েটা কেমন ছিল? হায়দার সাহেবরা সকিনার সাথে কেমন ব্যবহার করতেন? মারধর

করতেন কি? হ্যান-ত্যান অনেক প্রশ্ন, কাজের কাজ কিছুই না।

কারও জন্য সময় বসে থাকে না। সকিনার অপেক্ষায় হায়দার সাহেবদের সংসার থেমে রইল না। কিছুদিন দুশ্চিন্তার পর আবার সহজ-স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের জীবন চলতে শুরু করল। তাঁরা আর একটা কাজের মেয়ের খোঁজ শুরু করলেন।

সকিনা হারিয়ে যাবার প্রথম দিকে হায়দার সাহেব বেশ দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে কী করে কে জানে? টাকা খাওয়ার মতলবে হয়তো তিল থেকে তাল বানাবে। হয়তো সংবাদপত্রে নিউজ হবে 'গৃহপরিচারিকাকে খুন করে লাশ গুম'। কাজের মেয়েকে খুনের অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হবেন। তাঁকে রিমাণ্ডে নেয়া হবে। সকাল-বিকেল পাছায় গরম ডিম ঢুকানো হবে। রিমাণ্ডের অত্যাচারে এক সময় তিনি মিথ্যে বলবেন, 'হ্যাঁ, তিনিই খুন করেছেন। লাশ ফেলেছেন নদীতে।' এধরনের উল্টা-পাল্টা টেনশনে রাতে তিনি দু'চোখ এক করতে পারতেন না।

কয়েকটা রাত নির্ঘুম কাটার পর তিনি শরণাপন্ন হন বিখ্যাত কবিরাজ ভবেশ করের। তাঁর সমস্যা শুনে কবিরাজ ভবেশ কর তাঁকে এক বোতল 'দুশ্চিন্তারোধক সুনিদ্রা বটিকা' দিয়ে দেন। দাম মাত্র দুইশ' টাকা।

দুশ্চিন্তারোধক সুনিদ্রা বটিকা খাওয়ার পরে হায়দার সাহেবের পেট এতই খারাপ করে যে তিনি সারাক্ষণ টয়লেটে যেতেই ব্যস্ত থাকেন, দুশ্চিন্তা করার সময় পান না। আর সারাদিন ধরে টয়লেটে ছুটতে-ছুটতে ক্লান্ত হয়ে রাতে খুব ভাল ঘুম হয়।

পাঁচ

ভাড়াটিয়া রুনু আপার সাথে লিলির এখন গলায়-গলায় ভাব। প্রতিদিন বিকেলে লিলি রুনু আপাকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠে আড্ডা দেয়। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত তাদের আড্ডা চলে। মাঝে-মাঝে এই আড্ডায় লতিফা বেগমও যোগ দেন। কিন্তু লাবনি কখনও এই আড্ডায় আসে না। কী কারণে যেন লাবনি রুনু আপাকে একটুও পছন্দ করে না। হয়তো রুনু আপা তার চেয়েও অনেক রূপবতী তাই। এক রূপবতী তো আবার অন্য রূপবতীকে সহ্য করতে পারে না। লাবনি নিজেও বুঝতে পারছে না, সে কেন রুনু আপাকে পছন্দ করে না। রুনু আপার শান্ত দীঘির মত ঘন কালো চোখে চোখ পড়লেই অহেতুক তার বুকটা ধকধক করে ওঠে। মনে হয়—ও চোখের মাঝে অশুভ কিছু খেলা করছে।

বিকেলে ছাদে যখন লিলি আর রুনু আপার আড্ডা চলে তখন লাবনি ঘরে বসে টিভি দেখে। এ ছাড়া বিকেলে এক দিন পর-পর তার প্রাইভেট পড়া থাকে। প্রাইভেট পড়া শেষ করে ফেরে সন্ধ্যা নাগাদ।

পড়ন্ত বিকেল। ছাদে লিলি একা। আজ তার সাথে রুনু আপা নেই। দু'দিন আগে রুনু আপা জাহিদ ভাইকে রেখে একাই বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। আজ শুধু যে রুনু আপা নেই তাই নয়, সারা বাড়িতে এই মুহূর্তে লিলি ছাড়া আর কেউ নেই। লাবনি গেছে প্রাইভেট পড়তে। লতিফা বেগমকে নিয়ে হায়দার

সাহেব গেছেন ডাক্তারের কাছে। আর জাহিদ ভাইয়ের তো এই মুহূর্তে বাড়িতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সে অফিস থেকে ফিরবে অনেক রাতে।

কিছুদিন ধরে লতিফা বেগমের ব্লাড প্রেসার বেড়েছে খুব। ব্লাড প্রেসার বাড়ার কারণেই তিনি ডাক্তারের কাছে গেছেন। প্রেসার বাড়বেই না কেন, আজকাল তাঁকেই চুলার পাশে বসে রান্না করতে হয়। সকিনা হারিয়ে যাবার পর আর নতুন কাজের মেয়ে পাওয়া যায়নি। সকিনা হারিয়ে যাবার পর প্রথম দিকে লিলি-লাবনি বেশ উৎসাহ নিয়ে রান্না-বান্না করত। তাদের উৎসাহ দিনে দিনে মিইয়ে গেছে, এখন আর তারা রান্না-বান্নার ধারে কাছেও যায় না। এ ছাড়া লাবনির সামনে পরীক্ষা, সে সারাদিন পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। আর লিলি তো কোনও কাজই ঠিক ভাবে করতে পারে না। ভাত রাঁধলে ভর্তা করে ফেলে নয়তো ভাত শক্ত থাকে। মাছ-তরকারি রাঁধলে লবণ আর ঝালে মুখে দেয়া যায় না। লতিফা বেগম তাই মুখ বুজে একা-একাই রান্না করেন, মেয়েদের ডাকেন না।

লিলি একা একা ছাদে হাঁটাহাঁটি করছে আর গুনগুন করে বিভিন্ন গানের প্রথম দু-এক লাইন গাইছে। ফুরফুরে বাতাস বইছে। শীতের প্রভাব কমে গেছে, প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনী ছোঁয়া। সূর্যটা লাল হয়ে পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়েছে। নীরব নিস্তব্ধ চারদিক।

মনোরম পরিবেশে লিলির মনটা রোমাণ্টিক হয়ে উঠল। ইস, এমন মুহূর্তে তার পাশে যদি একজন সুদর্শন প্রেমিক পুরুষ থাকত! ঠিক রুনু আপার স্বামী জাহিদ ভাইয়ের মত! রুনু আপার ভাগ্যটা খুব ভাল। নিজে যেমন সুন্দরী, তেমন সুদর্শন স্বামী পেয়েছেন...

ভাবনার অতল থেকে জেগে উঠে লিলি দেখল, ছাদে কাপড় শুকাতে দেওয়া হয় যে তারে, সেই তারের উপরে একটা বড়সড় বাজপাখি বসে আছে। বাজপাখিটা কেমন বুনো দৃষ্টিতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখছে।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাজপাখিটা উড়ে এসে লিলির মুখের উপর ছোঁ মারল। লিলি চিৎকার করে এক ঝটকায় পিছনে সরে গেল। বাজপাখি লিলির পাশ ঘেঁষে উড়ে গেল, ছোঁ লাগল না। পাখিটা ঘুরে আবার লিলির দিকে আসতে লাগল। দৌড় দিয়ে সরে যাবার উদ্দেশে পা বাড়ানোর আগেই বাজপাখিটা লিলির মুখের উপর হামলে পড়ল। বাজপাখিটা তীক্ষ্ণ নখ আর ঠোঁটের আঁচড়ে মুহূর্তে লিলির মুখমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল। লিলি চিৎকার করতে করতে দু'হাত দিয়ে ঝটকা মেরে কোনক্রমে বাজপাখিটাকে মুখের উপর থেকে সরাল। পাখিটা তৎক্ষণাৎ ঘুরে উড়ে এসে আবার লিলির মুখের উপর ছোঁ মারার জন্য উদ্যত হলো। লিলি চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পিছনে সরতে লাগল। পিছনে সরতে সরতে এক সময় লিলি ছাদ থেকে পড়ে গেল। পড়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে লিলি বাজপাখিটার গা থেকে একটা ঝাঁজালো গন্ধ পেল। গন্ধটা তার খুব পরিচিত মনে হলো।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে, হায়দার সাহেব ও লতিফা বেগম ফিরে এলেন। প্রায় একই সময়ে লাবনিও ফিরে এল।

সমস্ত বাড়িটা কেমন পোড়ো বাড়ির মত অন্ধকারে ডুবে আছে। দোতলা-একতলার কোনও কামরায়ই আলো জ্বলছে না। তা হলে কি ইলেকট্রিসিটি নেই? আশপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখা গেল ইলেকট্রিসিটি আছে। তা হলে!

'লিলিকে নিয়ে আর পারা গেল না! মনে হয় বিকেল থেকেই

ঘুমুচ্ছে,' বিরক্ত গলায় বললেন লতিফা বেগম।

হায়দার সাহেব রাগী গলায় বললেন, 'ঘুমুবে না, আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে যা বানিয়েছ! অলস, অকর্মার ঢেঁকি।'

লতিফা বেগম বেশ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। বড় মেয়েটা বোকাসোকা সহজ-সরল টাইপের হয়েছে বলে তাঁকেই সব সময় দোষারোপ করা হয়। সমস্ত দোষ যেন তাঁর!

'লিলি...লিলি...এই লিলি...' নীচে দাঁড়িয়েই কিছুটা তেজী গলায় ডাকতে লাগলেন লতিফা বেগম।

কোনও সাড়াশব্দ নেই।

হায়দার সাহেব টিপ্পনি কাটার ভঙ্গিতে বললেন, 'এত দূর থেকে ডাকার শব্দেই তোমার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে, তাই ভাবছ! কানের পাশে গিয়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে হবে।'

লাবনি গলায় সন্দেহ আর বিরক্তি নিয়ে বলল, 'দেখ, বাবা, তুমি অহেতুক আপার নামে বদনাম কোরো না। আপা এই অসময়ে কখনও ঘুমায় না। আপার কী হলো সেটা ভাব।'

সিঁড়ি বেয়ে তিনজনই দোতলায় উঠে গেল। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। লাবনি কলিং বেলের সুইচ টিপল। পরপর সাত-আটবার। ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

এবারে হায়দার সাহেবকে চিন্তিত মনে হলো। তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'কী হলো মেয়েটার?'

লতিফা বেগম দরজার উপরে হাত দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে করতে, 'লিলি...লিলি...এই লিলি...' বলে ডাকতে লাগলেন।

লাবনিও, 'আপা...আপা...এই আপা...' বলে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল।

অবস্থা তথৈবচ। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

হায়দায় সাহেব, লতিফা বেগম, লাবনি তিনজনই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কী হলো লিলি? এত ডাকাডাকির পরও কোনও মানুষ ঘুমিয়ে থাকতে প্যারে? নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা! এখন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা উচিত, কিন্তু তাদের পক্ষে দরজা ভাঙা সম্ভব নয়। লোকজন ডাকতে হবে।

হায়দার সাহেব আশপাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন লোক ডেকে আনলেন। দেখতে দেখতে অনেক লোকের জটলা হয়ে গেল।

সবাই মিলে দরজাটা ভেঙে ফেলল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভিতরে লিলি নেই! সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও লিলিকে পাওয়া গেল না।

লাবনির খেয়াল হলো, আপা তো বিকেলে ছাদে যায়। তা হলে আপা এখনও ছাদে নাকি?

লাবনি ছুটে ছাদে উঠে গেল। না, ছাদেও লিলি নেই। তবে ছাদের এক পাশে লিলির স্যাণ্ডেল জোড়া এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে।

লতিফা বেগম ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। লাবনির চোখও ভিজে উঠছে। হায়দার সাহেব গভীর উদ্বেগের সাথে ভাবতে লাগলেন, মেয়েটা গেল কোথায়?

পাড়া-পড়শিরা বিভিন্ন মন্তব্য করতে লাগল। কেউ বলছে, 'এখন আগে পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত...' কেউ বলছে, 'পুলিশের কাছে গিয়ে কী লাভ? কাজের মেয়েটার মত লিলিও হয়তো কোনও ছেলের হাত ধরে পালিয়েছে...'

আড়ালে-আবডালে কেউ কেউ আবার হাসাহাসি করছে এই বলে, 'কাজের মেয়ে, বাড়ির মেয়ে সবই বাড়ি থেকে পালিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। হায়দার সাহেব বিয়ে দেয়ার ঝামেলা থেকে বড় বাঁচা

বেঁচে যাচ্ছেন। এখন ছোট মেয়েটা পালালেই একেবারে ঝাড়া হাত-পা। হি...হি...'

এত লোকজনের জটলার মাঝেও একটা লোকের মন্তব্য হায়দার সাহেব কান খাড়া করে শুনলেন। লোকটা বলছে, 'কী এক ভাড়াটিয়া রেখেছে, সারাদিন ঘরের ভিতরেই বসে থাকে। রাস্তাঘাটে দেখাই যায় না। জাহিদ না শাহিদ কী নাম যেন লোকটার। লোকটাকে মোটেই সুবিধের মনে হয় না। দেখ গিয়ে লোকটা কোনও দুই নম্বর কাজের সাথে জড়িত কিনা। আমার তো মনে হয়, ওই ব্যাটা নারী পাচারকারীদের সাথে জড়িত।'

এত অস্থিরতার মাঝেও হায়দার সাহেব লোকটার মন্তব্য শুনে ভাবলেন, জাহিদকে রাস্তাঘাটে কী করে দেখবে? জাহিদ তো সেই ভোরে অফিসে যায় আর ফেরে অনেক রাত করে। জাহিদের সম্পর্কে কী ফালতু কথাই না বলছে লোকটা! এখনও তো জাহিদ বাসায় নেই। ফিরবে আরও তিন-চার ঘণ্টা পরে। এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেও লিলির খোঁজ না মিললে, জাহিদ ফেরার পরে, জাহিদকে সঙ্গে নিয়েই থানায় যাবেন জি.ডি. করাতে।

ছয়

দুই মাস পরেও লিলির খোঁজ মিলল না।

সকিনা হারিয়ে যাবার পর পুলিশ যেমন অহেতুক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নে-প্রশ্নে হায়দার সাহেবদের জর্জরিত করেছিল, এবারও ঠিক

তেমনটা করল। কাজের কাজ কিছুই হলো না। লিলির কোনও খোঁজই বের করতে পারল না পুলিশ। এক সময় পুলিশের তদন্ত মন্থর হয়ে এল।

হায়দার সাহেব লিলির খোঁজ পাওয়ার সব ধরনের চেষ্টাই করলেন। দূরে-কাছের সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করলেন। নিখোঁজ সংবাদের মাইকিং করালেন। দেশের সবকটা দৈনিক পত্রিকায় টানা এক মাস লিলির ছবি সহ নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি দিলেন। এমনকী কবিরাজ ভবেশ করের পরামর্শে এক ওঝার কাছেও গেলেন। সেই ওঝা ধ্যানে বসে হারানো মানুষের সন্ধান দিতে পারেন। তাঁর হাদিয়া এক হাজার এক টাকা। তিনি আবার ধ্যানে বসেন রাত বারোটার পরে।

হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম রাত বারোটার সময় বস্তির ভিতরে ওঝার ছোট্ট ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। ঘরের ভিতরে ধূপ-ধুনো আর আগর বাতির মিশ্রিত এক ধরনের কটু গন্ধ। সমস্ত ঘর জুড়ে টিমটিম করে জ্বলছে একটা প্রদীপ। যে প্রদীপের আলো ঘরকে আলোকিত করার চেয়ে অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তুলছে। প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে ঘি আর করঞ্জা তেলের মিশ্রণ দিয়ে। ঘি আর করঞ্জা তেল পোড়া কটু গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত ঘরে কেমন ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে।

ওঝা পদ্মাসন ভঙ্গিতে চোখ বুজে ঘরের মেঝেতে বিছানো মাদুরের উপরে বসে আছেন। সত্তরোর্ধ্ব এক লোক। ধবধবে সাদা লম্বা চুল-দাড়ি। ভুরুও পেকে সাদা হয়ে গেছে। লম্বাটে মুখমণ্ডল। সমস্ত চেহারায় ঋষি-ঋষি ভাব। গায়ে সাদা আলখাল্লার মত পোশাক।

হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম ঘরের ভিতরে ঢোকার পরই, লোকটা চোখ বন্ধ অবস্থায়ই গম্ভীর গমগমে স্বরে বললেন,

'আম্মাজি আর আব্বাজির কে হারিয়েছে?'

লতিফা বেগম কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'আমাদের বড় মেয়েটাকে গত দুই মাস ধরে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আম্মাজি, ধৈর্য ধরেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা আমার সামনে বসেন।'

হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম হাঁটু গেড়ে ওঝা লোকটার সামনে বসলেন।

ওঝা চোখ বন্ধ অবস্থায়ই লম্বা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ের নাম কী?'

'লিলি।'

'বয়স?'

'এই জুন মাসে ত্রিশ হবে।'

'বিবাহিতা?'

'না।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে ওঝা চোখ বন্ধ অবস্থায়ই হাঁক দিলেন, 'ওই সুরুইজ্যা।'

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দশ-বারো বছরের একটা রোগা-পাতলা ছেলে ছুটে এল। ছেলেটার হাতে জ্বলন্ত গাঁজার কলকে। কলকে থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ছেলেটা বিনয়ী ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে কলকেটা ওঝার হাতে দিল। ওঝা চোখ বন্ধ অবস্থায়ই কলকেটায় কষে কয়েকবার দম দিলেন। গাঁজার বিচ্ছিরি গন্ধে ভরে গেল সমস্ত ঘর। গন্ধে লতিফা বেগমের দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা। এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করে বসে রইলেন। কারণ ওঝা তাঁকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন।

কলকেতে দম দেওয়া শেষে কলকেটা আবার ছেলেটার হাতে দিয়ে হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন। ছেলেটা চলে গেল।

ওঝা এবার একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেলেন। কোনও নড়াচড়া নেই। এখন তাঁকে দেখে যে কেউ ধারণা করতে পারে, লোকটা বসা অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অনেকক্ষণ পরে ওঝা মুখ খুললেন। হাত-পা শরীরের কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই, শুধু ঠোঁট দুটি নড়ছে। আর চোখ দুটো তো প্রথম থেকেই বোজানো অবস্থায়।

'আপনাদের মেয়ে এখন সমুদ্রের পাশের বিশাল এক অট্টালিকায়। সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। তার সাথে তার স্বামী। তারা পালিয়ে বিয়ে করেছে। অনেক দিন ধরে তাদের প্রেম ছিল। আপনারা কেউ...'

ওঝার কাছ থেকে ফিরে আসার সময় হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম বেখেয়ালে ওঝার টাকা না দিয়েই উঠে পড়েছিলেন। ওঝা লোকটা তাঁর ধবধবে সাদা লম্বা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে চোখ বন্ধ অবস্থায়ই বললেন, 'আমার হাদিয়াটা?'

পরের দিনই হায়দার সাহেব গেলেন কক্সবাজারে। কারণ ওঝার দেওয়া তথ্য মতে সমুদ্রের পাশের বিশাল অট্টালিকা বলতে বুঝিয়েছে কক্সবাজারের হোটেলগুলোকে।

কক্সবাজারের সমস্ত হোটেলগুলোতে হায়দার সাহেব লিলির ছবি দেখিয়ে লিলির খোঁজ করলেন। সমস্ত শহরে মাইকিং করালেন। কিন্তু লিলির কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

সাত

লিলি হারিয়ে যাবার পর থেকে হায়দার সাহেবদের বাড়ির পরিবেশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। কারও মুখে কোনও হাসি নেই, কথা নেই, উৎসাহ নেই...সবাই গোমড়া মুখ করে সারাক্ষণ যে যার কামরায় পড়ে থাকেন। এমনকী রান্না-বান্না, খাওয়া-নাওয়াও ঠিক মত হয় না।

গত তিন মাসে যেন হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগমের বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। দু'জনকেই আজকাল অসম্ভব বুড়োটে দেখায়।

হায়দায় সাহেবের মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, যা তিন মাস আগেও অতটা পাকা ছিল না। নিয়মিত শেভ করেন না বলে মুখে সাদা সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি দেখা যায়। মুখের বলি রেখাগুলোও যেন আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লতিফা বেগমেরও প্রায় একই অবস্থা। সমস্ত মাথা কাঁচা-পাকা চুলে ছেয়ে গেছে। তিন মাস আগে যেখানে পাকা চুল ছিল শুধু মাথার দু'পাশের সামান্য কিছু অংশ জুড়ে। চেহারায় রোগাটে বিষণ্ন দুঃখী-দুঃখী ভাব। সারাক্ষণ কাঁদেন বলে চোখ দুটো থাকে অসম্ভব রকম লাল আর ফোলা।

লাবনিরও পড়াশোনায় মন নেই। সবসময় ঝিম ধরে বসে বসে লিলির কথা ভাবে। কোথায় গেল তার বোনটা? মাঝে মাঝে নিঃশব্দে কাঁদে। রাতে ঘুম হয় না। কত রাত যে নির্ঘুম কেটেছে

তার কোনও ইয়ত্তা নেই। চোখের নীচে কালসিটে পড়ে গেছে। চেহারা হারিয়েছে লাবণ্য। চুলগুলো হয়েছে উস্কোখুস্কো। তিন মাস আগের লাবনির সাথে যেন এই লাবনির কোনও মিলই নেই। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে লাবনির সেই লাবণ্যমাখা মুখখানা।

ভাড়াটিয়া জাহিদ আগের মতই খুব ভোরে অফিসে চলে যায় আর ফেরে অনেক রাত করে।

জাহিদের স্ত্রী অধিকাংশ সময় কাটায় হায়দার সাহেবদের সাথে। সবাইকে সান্ত্বনা আর ভরসা দেয়।

রুনুর সান্ত্বনা আর ভরসা দেওয়া কথাগুলো শুনতে হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগমের ভালই লাগে। তাঁদের অন্ধকার মনের মাঝে একটু হলেও আলো জ্বলে ওঠে।

রুনুর মতে, ওঝার দেওয়া তথ্য সঠিক। সত্যিই লিলির কোনও ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই ছেলের সাথেই লিলি পালিয়েছে। পালিয়ে তারা বিয়ে করেছে। রুনু আগেই কিছুটা টের পেয়েছিল লিলি যে এমন কাণ্ড করবে। লিলি এখন ভালই আছে। স্বামী সংসার নিয়ে সুখেই আছে। কতদিন মা-বাবাকে না দেখে থাকবে, একদিন লিলি অবশ্যই ফিরে আসবে...রুনুর এই সব কথা শুনে হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগম কিছুটা হলেও ভরসা পান। তাঁদের মেয়ে বেঁচে আছে, সুখে আছে, একদিন ফিরে আসবে। মেয়ে পালিয়ে গিয়ে সমাজের কাছে তাঁদের অপমানিত করেছে তাও তুচ্ছ মনে হয়।

রুনু লাবনির সাথেও ভাব জমানোর চেষ্টা করে, কিন্তু লাবনি মোটেও পাত্তা দেয় না।

কী কারণে যেন লাবনি রুনুকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। লাবনির কাছে রুনুর সব কিছু মেকি মনে হয়। রুনুর আচার-আচরণে কোথায় যেন সে অস্বাভাবিকতা খুঁজে পায়। শুধু যে

রুনুকে তার অস্বাভাবিক মনে হয় তা নয়, রুনুর স্বামী জাহিদকেও তার অস্বাভাবিক লাগে।

আজকাল প্রায় রাতই লাবনির নির্ঘুম কাটে। সারা রাত ধরে সকাল পর্যন্ত লাবনি তার রুমের জানালা দিয়ে তাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে—এই বুঝি তার বোন লিলি এসে বাড়িতে ঢুকল। দিন যায়, রাত যায়, কেউ আসে না। বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই লাবনির নজর থাকে গেটের দিকে। গেটের দিকে খেয়াল রাখতে রাখতে সে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। তাদের ভাড়াটিয়া জাহিদ ভাইকে কখনোই বাড়ি থেকে বের হতে বা আসতে দেখা যায় না। অথচ সকালে রুনু আপা এলে তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কি জাহিদ ভাই অফিসে যাননি?' রুনু আপা অবাক হয়ে বলেন, 'কী বলো! সে তো খুব ভোরেই অফিসে চলে গেছে।'

লাবনি অবাক হয়। তা হলে সে যে রাত থেকে সকাল নয়টা-সাড়ে নয়টা পর্যন্ত গেটের দিকেই তাকিয়ে ছিল, এর মধ্যে তো জাহিদ ভাইকে যেতে দেখেনি! গেল কখন? সে কি তা হলে জাহিদ ভাইয়ের যাওয়া লক্ষ করেনি!

আর এক দিন রাতেও এই একই ঘটনা ঘটে। লাবনির বাবা হায়দার সাহেব রুনু আপাকে বলে দিয়েছিলেন, রাতে জাহিদ ভাই ফেরার পরে তাঁর সাথে যেন দেখা করে। লাবনি সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত জানালার পাশে বসে গেটের দিকে তাকিয়ে ছিল, এই সময়ের মধ্যে বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেখেনি। অথচ রাত সোয়া বারোটার দিকে জাহিদ ভাই এসে লাবনির বাবা হায়দার সাহেবের সাথে দেখা করল।

যতই দিন যাচ্ছে লাবনির কাছে জাহিদ ভাই আর রুনু আপা ততই রহস্যময় হয়ে উঠছে। জাহিদ ভাই আর রুনু আপাকে

কখনও এক সাথে দেখা যায় না, যে কোনও একজনের দেখা পাওয়া যায়। জাহিদ ভাইকে কখনও বাজার করতে দেখা যায় না। রুনু আপাকেও কখনও রান্না করতে দেখা যায় না বা তাদের ঘর থেকে কিছু রান্নার গন্ধও আসে না। লাবনির মনে আছে রুনু আপাদের আগের ভাড়াটিয়ারা থাকতে তাদের ভাজা-পোড়ার গন্ধে দোতলায় বসে লাবনিদের অস্থির হয়ে উঠতে হত। সেই ভাড়াটিয়ারা যা-ই রান্না করত লাবনিরা দোতলায় বসে গন্ধ পেত। গন্ধ বোধহয় ঊর্ধ্বমুখী।

লাবনির খুবই সন্দেহ হয় জাহিদ ভাই আর রুনু আপাকে। তাদের দু'জনার চেহারার মাঝেও কোথায় যেন সামান্য মিল খুঁজে পায় সে। মিলটা ঠিক কোথায় ধরতে পারছে না। তাদের দু'জনের গা থেকেও একই রকমের ঝাঁজালো উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, দু'জনই হয়তো একজন।

অনেক ভেবে ভেবে লাবনি তাদের দু'জনের চেহারায় যে মিলটা তা খুঁজে বের করেছে। মিলটা হচ্ছে চোখে। দু'জনার চোখের আকার-আকৃতি, রং একই। একই হিমশীতল অন্তর্ভেদী চাহনি। দু'জনার চোখের মাঝেই খুব গোপনে অশুভ কিছু খেলা করে।

আট

রাত সাড়ে দশটা।

হায়দার সাহেবদের বাসার সবাই খাবার টেবিলে। হাত ধুয়ে মাত্র খাওয়া শুরু করলেন, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল।

পরপর দুইবার। হায়দার সাহেব, লতিফা বেগম, লাবনি একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। তিনজনই অবাক হয়ে ভাবছেন, এই অসময়ে কে এল! ভাড়াটিয়া জাহিদ আর রুনু গতকাল খুব ভোরে তাদের দেশের বাড়ি বেড়াতে গেছে। (অবশ্য চলে যাবার মুহূর্তে তাদের কেউ দেখেনি) ফিরবে পাঁচ দিন পর। জাহিদ অফিস থেকে পাঁচ দিনের ছুটি নিয়েছে। জাহিদ বা রুনু আসেনি, তা হলে কে?

লাবনি উঠে দরজা খুলতে গেল।

দরজা খোলার পর লাবনির মনে হলো, সে স্বপ্ন দেখছে। এটা সত্যি দৃশ্য নয়! নিশ্চয়ই কোনও সুন্দর স্বপ্ন!

দরজার সামনে লিলি দাঁড়িয়ে আছে! তার মুখ হাসি হাসি। গায়ে লাল সালোয়ার-কামিজ। আগের চেয়ে তাকে দেখতে অনেক সুন্দরী লাগছে।

লাবনি নিজেকে ধাতস্থ করে কাঁপা গলায় বলল, 'আপা তুই!'

লিলি দু-হাত বাড়িয়ে ধরল।

লাবনি চিৎকার করে, 'ও মা দেখে যাও কে এসেছে!' বলে লিলিকে জড়িয়ে ধরল।

লতিফা বেগম, হায়দার সাহেব খাবার ফেলে রেখে ছুটে এলেন। লিলিকে দেখে আনন্দে তাঁদের চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল।

লতিফা বেগম আনন্দ অশ্রু ফেলতে ফেলতে লিলিকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'মা, তুই এতদিন কোথায় ছিলি? আমাদের না বলে তুই কোথায় ছিলি? কত খোঁজাই না খুঁজেছি তোকে। মা, তুই ভাল আছিস তো?'

বহুদিন পর হায়দার সাহেবদের সবার বিক্ষিপ্ত মনে যেন শান্তির বারিধারা বইছে। লিলি ফিরে এসেছে। লিলি বড় ধরনের

একটা অন্যায় করেছে। ওঝার কথাই সত্যি, সে পালিয়ে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে। ভয়ে স্বামীকে সঙ্গে আনেনি।

হায়দার সাহেব আর লতিফা বেগমের পা ধরে ক্ষমা চেয়েছে লিলি। লতিফা বেগমের মায়ের মন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করে দিয়েছেন। হায়দার সাহেব কিছুই বলেননি, তিনি গম্ভীর হয়ে থেকেছেন। মনে মনে তিনিও ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু উপরে উপরে অভিমান দেখাচ্ছেন। মেয়ে এত বড় একটা অন্যায় করেছে এর শাস্তি তাকে পেতে হবে। হায়দার সাহেব ভেবে রেখেছেন, তিনি বেশ কিছু দিন লিলির সাথে কথা বলবেন না। পালিয়ে বিয়ে করার কী দরকার ছিল? লিলি যদি তার পছন্দের কথা জানাত তা হলে কি তিনি রাজি হতেন না? তিনি তেমন বাবা নন যে ছেলে-মেয়ের পছন্দকে স্বীকৃতি দেবেন না।

হায়দার সাহেব বসার ঘরে বসে টিভি দেখছেন আর পা নাচাচ্ছেন। টিভি দেখার কোনও আগ্রহই নেই তাঁর, তবুও সাউণ্ড কমিয়ে টিভি ছেড়ে রেখেছেন। তাঁর সমস্ত আগ্রহ লতিফা বেগমের শোবার ঘরে।

লতিফা বেগমের শোবার ঘরে এখন লতিফা বেগম, লিলি, লাবনি তিন জনে আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে গল্প করছে। তাদের কথাবার্তা বসার ঘরে বসে কিছু-কিছু শোনা যাচ্ছে। হায়দার সাহেব কান খাড়া করে সেই সব কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছেন। তাঁরও খুব ইচ্ছা লতিফা বেগমের শোবার ঘরের আড্ডায় যোগ দিতে। কিন্তু তিনি তা পারছেন না। মা-মেয়েদের আড্ডায় গিয়ে বাবা ঢুকতে পারে না। মেয়েরা মায়ের কাছে দ্বিধাহীন অনেক গোপন কথাও বলে। সে সব কথা শোনার অধিকার বাবার নেই।

হায়দার সাহেব বসার ঘরে বসে রাত বারোটা পর্যন্ত লতিফা

বেগমের শোবার ঘরের আড্ডার কথাবার্তা শোনার ব্যর্থ চেষ্টা করে ঘুমুতে চলে যান। তিনি মাঝে মাঝে হাসির শব্দ ছাড়া তেমন কিছুই শুনতে পাননি। লতিফা বেগমরা গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা বলছে গলার স্বর নিচু করে।

হায়দার সাহেবের মনটা আজ খুব প্রফুল্ল। মেয়ে ফিরে এসেছে! এত দিন পরে তিনি দুশ্চিন্তার শিকল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অনেক দিন পর আজ বিছানায় শোবার সাথে সাথেই তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

রাত একটা পর্যন্ত লতিফা বেগমের শোবার ঘরে আড্ডা চলেছে। আড্ডার প্রধান বিষয়ই ছিল লিলি। লিলি এত দিন কোথায়, কীভাবে কাটিয়েছে? লিলি যে ছেলেটাকে বিয়ে করেছে, সেই ছেলেটার চেহারা কেমন? কী করে? তাদের সংসার জীবন কেমন চলছে? আরও নানা ধরনের কথাবার্তা। কথা যেন ফুরাতেই চায় না।

রাত একটার দিকে তাদের ঘুমাবার কথা খেয়াল হয়। ঘুমাবার কথা উঠতেই দেখা গেল আজ লিলির সাথে লতিফা বেগমও ঘুমাতে চাইছেন, লাবনিও ঘুমাতে চাইছে। এত দিন পরে লিলি ফিরে এসেছে বলে লিলির সঙ্গ কেউই ছাড়তে চাইছে না। আবার তিনজনের এক সাথে এক বিছানায় ঘুমানোও সম্ভব নয়। এক বিছানায় তিনজনের জায়গা হবে না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, আজ লিলির সাথে লতিফা বেগম ঘুমাবেন, কাল লাবনি। লিলির অবশ্য ইচ্ছে ছিল আজই লাবনি ঘুমাক কিন্তু লতিফা বেগমের ইচ্ছের কাছে দু-বোনকে হার মানতে হয়।

রাত সোয়া একটার দিকে লতিফা বেগমের শোবার ঘরেই লতিফা বেগম আর লিলি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। লাবনি

নিজের কামরায় ঘুমাতে যায়।

আনন্দ আর উত্তেজনায় লাবনির ঘুম আসছে না। তার খুব খুশি-খুশি লাগছে। এত দিন পরে তার বোনটা ফিরে এসেছে। কী যে আনন্দ লাগছে!

লিলির কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় লাবনি সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। লিলির মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, সেটা সে ধরতে পারছে না। লিলি আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে। কথাবার্তায় অনেক সংযত হয়েছে। সুন্দর করে হাসতে শিখেছে। এর বাইরেও বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন হয়েছে যেটা লাবনি এই মুহূর্তে ধরতে পারছে না।

লিলির আর একটা ব্যাপার মনে পড়ায় লাবনির অস্বস্তি বোধটা আরও বেড়ে যায়। লাবনি যখন লিলিকে জড়িয়ে ধরেছিল তখন লিলির গা থেকে দামী পারফিউমের মিষ্টি গন্ধের আড়ালে ঝাঁজালো উৎকট একটা গন্ধ পায় সে। এমন গন্ধ তো আগে কখনও লিলির গা থেকে পাওয়া যায়নি!

ভাবতে-ভাবতে এক সময় লাবনি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমাবার আগে লাবনি ভেবে ভেবে লিলির মাঝে যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা হয়েছে সেটাই বের করতে পারল না। লিলির চোখ দুটো আর আগের মত নেই। আগের চেয়ে চোখ দুটো টানাটানা আর সুন্দর হয়েছে। চোখ সুন্দর হয়েছে বলেই লিলিকে আগের চেয়ে সুন্দরী মনে হয়েছে। কারণ মানুষের চেহারার সৌন্দর্যের প্রথম এবং প্রধান দিকই হচ্ছে চোখ।

লাবনি যদি লিলির চোখ দুটিকে খুব ভাল ভাবে লক্ষ করত, তা হলে দেখতে পেত—লিলির সুন্দর মায়াকাড়া চোখ দুটির মাঝে কী ভয়ংকর হিমশীতল গভীর অন্ধকার আর নিষ্ঠুরতা খেলা করছে।

নয়

সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙে হায়দার সাহেবের। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তিনি দেখেন, বাসার আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি।

সদর দরজার নীচ দিয়ে হকার খবরের কাগজ রেখে গেছে। হায়দার সাহেব খবরের কাগজটা তুলে এনে বসার ঘরে বসে পড়া শুরু করেন। আজ রাতে তাঁর খুব ভাল ঘুম হয়েছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি হালকা গলায় গানও গাইছেন, 'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...'

কিছুক্ষণের মধ্যে লাবনি ঘুম থেকে উঠল।

লাবনি ঘুম থেকে উঠে হায়দার সাহেবকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে বলল, 'বাবা, তুমি একা একা বসে আছ! মা, লিলি আপু ঘুম থেকে ওঠেনি?'

হায়দার সাহেব খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'তোর মা আজ এত জলদি ঘুম থেকে উঠবে? তার আদরের মেয়ে ফিরে এসেছে, সেই আনন্দে আজ কয়টা পর্যন্ত ঘুমায়, তাই দেখ।'

লাবনি বাবার কথা শুনে মুচকি হাসি দিল।

হায়দার সাহেব আবার বললেন, 'দেখ তো মা, আমাকে এক কাপ চা দিতে পারিস কি-না।'

'দিচ্ছি বাবা,' বলে লাবনি রান্নাঘরের দিকে গেল।

লাবনি চা বানিয়ে এনে হায়দার সাহেবের সামনে রেখে, লতিফা বেগমের শোবার ঘরের দিকে গেল। লতিফা বেগম আর লিলিকে ঘুম থেকে জাগাবে।

লতিফা বেগমের শোবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ নয়, শুধু ভেজানো। লাবনি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে বিকট শব্দে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

লাবনির চিৎকারের শব্দে হায়দার সাহেবের হাত থেকে চায়ের কাপ উল্টে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে গেলেন লতিফা বেগমের শোবার ঘরে। লতিফা বেগমের শোবার ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলে নিলেন।

লতিফা বেগমের সমস্ত ঘর জুড়ে ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ। বিছানার উপরে থকথকে টাটকা রক্তের আস্তরণ। রক্তের আস্তরণের উপরে লম্বালম্বি পড়ে আছে লতিফা বেগমের দেহবিহীন মুণ্ডু সহ শিরদাঁড়াটা। শিরদাঁড়ার সাথে সংযুক্ত লতিফা বেগমের মুণ্ডু কোনও হিংস্র জন্তুর নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। ঘরের মেঝের জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে লতিফা বেগমের দেহের বিভিন্ন মাংসবিহীন হাড়। নরমাংস লোভী কোনও হিংস্র জন্তু লতিফা বেগমের শরীরের সমস্ত মাংস খেয়ে ফেলেছে। কোনও এক অদ্ভুত কারণে হয়তো শিরদাঁড়ার সাথে সংযুক্ত মুণ্ডুটা ফেলে গেছে।

লিলিকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

পুলিশ আর অনেক লোকজনে ভরে গেল সমস্ত বাড়ি।

লাবনি একটু পরপর জ্ঞান হারাচ্ছে। হায়দার সাহেব কেমন নিষ্পলক ঘোরের মাঝে। দেখে মনে হচ্ছে তিনি বোধহয় সাময়িক ভাবে বোধ শক্তি হারিয়েছেন।

পুলিশের লোকজন বেশ অবাক হলেন। এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটল? মানুষের পক্ষে যে এমনটা করা সম্ভব নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তা হলে হিংস্র কোনও জন্তু? কিন্তু সেই জন্তু এল কোত্থেকে? সবার মনেই নানান প্রশ্ন।

লতিফা বেগমের দেহের অংশ বিশেষ যা পাওয়া গেছে, পুলিশ তা ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

দুপুরের পরে হায়দার সাহেব এবং লাবনি কিছুটা সংবিৎ ফিরে পেল।

হায়দার সাহেব এবং লাবনি দু'জনে মিলে কাঁদো-কাঁদো কাঁপা গলায় ভাঙা-ভাঙা ভাবে কোনওক্রমে গতকাল রাত থেকে যা-যা ঘটেছে সব জানাল পুলিশকে। কাল রাত থেকে যা ঘটেছে এর বাইরেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল লাবনি।

লাবনির মতে, কালকে রাতে যখন তার বোন লিলি ফিরে আসে তখনই তার কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল। কারণ লিলিকে ঠিক আগের মত লাগছিল না। মনে হচ্ছিল যে অন্য কেউ লিলির রূপ ধরে এসেছে...আর সমস্ত ঘটনার পিছনে তার প্রধান সন্দেহ তাদের ভাড়াটিয়া জাহিদ আর জাহিদের স্ত্রী রুনুকে। কারণ জাহিদ আর রুনু এ বাড়িতে...

জাহিদ আর জাহিদের স্ত্রী রুনুর মাঝে যে সব ব্যতিক্রম লাবনির চোখে ধরা পড়েছিল তা সবই লাবনি পুলিশকে বলল।

পুলিশ লাবনির সন্দেহকে গুরুত্ব দিয়ে ভাড়াটিয়া জাহিদের বাসায় তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকল।

জাহিদের ঘরের অবস্থা দেখে মনে হয় এই ঘরে অনেক দিন

ধরে কোনও লোকজন ছিল না। কেমন ভ্যাপসা গন্ধ। সারা ঘর ভর্তি ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। আসবাবের উপরে ধুলোর আস্তরণ।

পুলিশ এক এক করে সব কিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। গত ছয় মাসেও এই ঘরে কোনও মানুষ বাস করেছে এমন কোনও চিহ্ন নেই।

খাবার ঘরে ঢুকে পুলিশের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ঘরের মেঝেতে শুকনো কালসিটে রক্তের আস্তরণ। এক কোনায় স্তূপ করে রাখা মানুষের শরীরের বিভিন্ন হাড়।

খাবার ঘরের এক পাশে একটা বড় ফ্রিজ। ফ্রিজটা চালু। পুলিশের এক লোক ফ্রিজটা খুলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। ফ্রিজের ভিতরে দুটি বরফ আচ্ছাদিত মানুষের ছিন্ন মুণ্ড। ছিন্ন মুণ্ড দুটির একটি অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া হায়দার সাহেবদের কাজের মেয়ে সকিনার, অন্যটি গত রাতে ফিরে আসা লিলির।

ছিন্ন মুণ্ড দুটি পুলিশ ফরেনসিক ল্যাবে পাঠাল।

লাবনির সাথে পুলিশও এখন একমত হলো। সমস্ত ঘটনার সাথে ভাড়াটিয়া জাহিদ এবং তার স্ত্রী রুনু জড়িত। তাদেরকে খুঁজে পেলেই রহস্যের সমাধান হবে।

পুলিশ জাহিদের সমস্ত ঘরে আঁতিপাঁতি করে তল্লাশি চালাল, যদি এমন কোনও তথ্য বা ক্লু পাওয়া যায়, যা ধরে জাহিদদের খুঁজে বের করা যায়। কোনও কিছুই পাওয়া গেল না। এক সময় পুলিশ চলে গেল।

পুলিশ যখন জাহিদদের সমস্ত ঘরে তল্লাশি চালায় তখন যদি তারা একটু ভাল ভাবে লক্ষ করত, তা হলে দেখতে পেত, ফ্রিজের পিছনের দেয়ালে একটা বড়সড় টিকটিকি। এই টিকটিকিটা অন্য সব সাধারণ টিকটিকির মত নয়। সাধারণ

টিকটিকির চেয়ে এটা আকারে কিছুটা বড়। গায়ের রং বাদামি আর চোখ দুটো টকটকে লাল। গায়ে কেমন ঝাঁজালো একটা গন্ধ।

এই টিকটিকিটা বহুরূপী। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কখনও সে জাহিদের মত সুদর্শন যুবকের রূপ নেয়, কখনও রুনুর মত সুন্দরী তরুণীর, কখনওবা কালো বিড়াল, আবার কখনও বাজপাখি, কখনও টিকটিকি...সে যেমন খুশি তেমন রূপ ধারণ করতে পারে। সে এসেছে অন্ধকার জগৎ থেকে। নরমাংসের লোভে সে অন্ধকার জগৎ থেকে লোকালয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

বহুরূপী আজ গভীর রাতে বাদুড়ের রূপ ধারণ করে দূরে কোথাও চলে যাবে। হায়দার সাহেবদের বাড়িতে আর নয়। অনেক দিন ধরেই তো এখানে জাহিদ আর রুনুর ভেক ধরে থেকেছে। এবার অন্য কোথাও, অন্য কোনও বাড়িতে, অন্য কোনও নতুন রূপে হাজির হবে।

আফজাল হোসেন

মরণবার্তা

দ্য মিউজিয়াম সোসাইটি লণ্ডন
২০ এপ্রিল, ১৯০০
মি. কার্সওয়েল,

আঠারো তারিখে আপনার চিঠি আমার হাতে এসেছে। মিউজিয়াম সোসাইটি আপনার জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বইটির বিষয়ে আগ্রহী নয়। আগেও কয়েকটি চিঠিতে সে কথা জানানো হয়েছে আপনাকে। এ ব্যাপারে আর চিঠি না লেখার জন্যে আপনাকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতে আমার পক্ষে আর উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

আপনার বিশ্বস্ত
মি. ডানিং (সেক্রেটারি)

মি. ডানিং চিঠিটা লেখা শেষ করে সই করলেন। কার্সওয়েলের জাদুবিদ্যার ওপর লেখা বইটি লাইব্রেরীতে ঠাঁই দেবেন না তিনি। ওটা আবর্জনা মনে হয়েছে তাঁর কাছে। ও বইয়ের জায়গা দিলে সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর মান থাকবে না।

দু'দিন বাদে ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ডানিং। ভয়ানক ক্লান্ত তিনি। ট্রামে সাঁটানো কাগজগুলোয় চোখ বুলাচ্ছিলেন—সাবান, চকোলেট, বিস্কুট, কত কিছুরই না বিজ্ঞাপন সাঁটিয়েছে লোকে। উল্টোদিকে সাঁটিয়ে রাখা অদ্ভুত এক বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টি কাড়ল

তাঁর। নীল কালিতে বড় বড় করে লেখা হয়েছে।

জন হ্যারিংটনের স্মৃতির উদ্দেশে
মৃত্যু ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। বেঁচে
থাকার জন্যে তিন মাস সময়
দেয়া হয়েছিল তাকে।

ডানিং স্পর্শ করলেন ওটা। জানালার কাঁচের ভিতর দিকে লাগানো রয়েছে কাগজটা। ডানিং চাইলেন আবারও। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড। পরমুহূর্তে বিজ্ঞপ্তিটা উধাও।

পরদিন, পিকাডিলিতে হাঁটছিলেন তিনি। এক লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এসে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিল। ডানিং সহসা মেরুদণ্ডে শিরশিরে এক অনুভূতি টের পেলেন। কাগজটায় চোখ বুলালেন তিনি। ওতে প্রথমে একটা নাম লেখা। বড় বড় করে নীল কালিতে লেখা:

হ্যারিংটন

এর বেশি পড়ার আর সময় পেলেন না ডানিং। লোকটা তাঁর হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। মিশে গেল জনতার ভিড়ে। ডানিং তো হতবাক। এর মানে কী!

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে গিয়ে এক ডেস্কে বসলেন তিনি। ব্রিফকেস থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে পড়তে লাগলেন।

গোলমুখো, দীর্ঘদেহী এক লোক এসময় তাঁর ডেস্কের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। তার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ডানিঙের কাগজগুলো পড়ে গেল ডেস্ক থেকে।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' বলে লোকটা তুলে নিল কাগজগুলো। তারপর ডানিঙের হাতে ওগুলো দিয়ে বলল, 'এগুলো আপনার নিশ্চয়ই?'

ডানিং রেগে গেছেন। 'জ্বী, ধন্যবাদ, স্যর,' বলে গ্রহণ করলেন কাগজ ক'টা। আচমকা হিম এক স্রোত বয়ে গেল তাঁর সর্বাঙ্গে।

গোলমুখো অশুভ হাসি হেসে ত্বরিত রিডিং রুম ত্যাগ করল। শরীরটা কেমন করে উঠল ডানিঙের, বাড়ি ফিরে যাবেন ঠিক করলেন।

মি. ফেরার, ডার্নিঙের এক বন্ধু, কামরার ওদিক থেকে এগিয়ে এলেন।

'তোমার কি শরীর খারাপ করছে?' জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, হঠাৎ করেই,' জবাবে বললেন ডানিং।

'ওই লোকটা কী বলল তোমাকে?' ফেরার জানতে চান। 'তুমি ওকে চেনো নাকি?'

'না, চিনি না।'

'ওর নাম কার্সওয়েল,' বললেন ফেরার। 'খারাপ লোক।'

ডানিং বিস্মিত হয়ে গেলেন।

'এ কথা বললে কেন?'

'সে অনেক কথা,' বললেন ফেরার। 'চলো, আজ এক সাথে লাঞ্চ খাব।'

ব্রিফকেসে কাগজগুলো তুলে রাখলেন ডানিং। তারপর দু'বন্ধু রিডিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। শীঘ্রিই সুস্থবোধ করতে শুরু করলেন ডানিং।

লাঞ্চ খেতে বসে, ফেরার কার্সওয়েলের কথা বন্ধুকে জানালেন।

'আমি কার্সওয়েলের বাড়ির কাছাকাছি থাকি,' বললেন তিনি। 'পার্কসহ বিশাল এক বাড়ির মালিক লোকটা। লাফোর্ড অ্যাবে বাড়িটার নাম। পাড়ার বাচ্চারা ওর পার্কে গিয়ে খেলাধুলা করত।

'কার্সওয়েলের কাছে সেটা ভাল লাগত না। অনেকবার সে বাচ্চাদের খেদিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ওরা খেলতে আসে। কার্সওয়েল একদিন সকল বাচ্চাকে দাওয়াত দিল। ওদের স্কুলমাস্টার তো অবাক। স্কুল ছুটির পর লাফোর্ড অ্যাবেতে সবাইকে নিয়ে যান তিনি। কার্সওয়েল তাদেরকে ফিল্ম শো দেখায়।

'প্রথম ছবিতে হিংস্র এক নেকড়ের ছবি দেখানো হয়। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কার্সওয়েল ভয়ঙ্কর সব শব্দ করতে থাকে, ফলে ছোট বাচ্চারা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে।

'তারপর দেখায় পার্কে আসা ছোট এক ছেলের ছবি। ওর লাফোর্ড অ্যাবের পার্ক—বাচ্চারা যেখানে খেলতে আসে। ভয়ঙ্কর এক সাদা মূর্তি ধাওয়া দেয় ছেলেটিকে। ছেলেটি পালাতে পারে না, সাদা মূর্তির খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়। বাচ্চারা এতে ভীষণ ভয় পায়।

'ওদের গার্জেনরা স্কুলমাস্টার আর কার্সওয়েল দু'জনের ওপরই রেগে আগুন হয়ে যায়,' ফেরার বলে যাচ্ছেন। 'কিন্তু কার্সওয়েলের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। লাফোর্ড অ্যাবে পার্কে তারপর থেকে আর কেউ খেলতে যায় না।'

'কী ভয়ানক কথা!' বলে ওঠেন ডানিং। তারপর ধীর কণ্ঠে জানতে চান, 'আচ্ছা, তুমি কি মি. জন হ্যারিংটনকে চেনো কিংবা চিনতে?'

'মানে যে লোক গত বছর মারা গেছে?' ফেরার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' বললেন ডানিং। 'কীভাবে মারা গেল জানো কিছু?'

'গাছ থেকে পড়ে।'

'গাছ থেকে পড়ে? অদ্ভুত তো। গাছে উঠে কী করছিল সে?'

'কেউ জানে না,' বললেন ফেরার। 'গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সে রাতের বেলা। পুলিস বলেছে দৌড়চ্ছিল নাকি। এক পর্যায়ে হ্যাট ফেলে একটা গাছে উঠে পড়ে। তারপর ওখান থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরে।'

'তুমি এত সব জানলে কী করে?'

'ওর ভাই হেনরীর কাছে শুনেছি,' বললেন ফেরার। 'ওর কথা মনে নেই? তোমরা একসাথে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে। দেখলেই চিনবে। ও কাছেই থাকে—পিকাডিলিতে।'

লাঞ্চ সেরে সোজা বাসায় ফিরলেন ডানিং। ফিরতে না ফিরতেই বাড়ির দরজায় একখানা কাগজ পড়ে পেলেন। তাঁর ডাক্তার পাঠিয়েছেন। ওটা পড়ে জানা গেল, তাঁর দু'জন কাজের লোকই অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। সম্ভবত বাসি মাছ খাওয়া তাদের কাল হয়েছে। এখন তারা হাসপাতালে ভর্তি।

ডানিং ডক্টর ম্যালোসের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। ডাক্তার তাঁকে সব কথা ভেঙে বললেন।

'রাস্তায় এক লোক মাছ বিক্রি করছিল,' বললেন ডাক্তার। 'তার মাছ খেয়ে ওদের এ দশা। পাড়ার আরও অনেকে ওর কাছ থেকে মাছ কিনেছে। কিন্তু কারও কোন অভিযোগ নেই। অবাক কাণ্ডই বটে।'

সন্ধেটা ডাক্তারের সাথে কাটালেন ডানিং। বাড়ি ফিরলেন প্রায় মাঝরাতে। বাসায় আজ একা তিনি। বিছানায় গেলেন, কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। নানা ধরনের শব্দ শুনছেন—টুকটাক শব্দ—ঘড়ির টিকটিক, দরজার ক্যাঁচকোঁচ এমনি ধরনের। সিঁড়িতে কি পায়ের আওয়াজ হলো? কেউ কি উঠে আসছে ওপরে?

বিছানা ছেড়ে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুই

শোনা গেল না।

এবার দরজা খুললেন। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে চেয়ে রইলেন আঁধারে। উষ্ণ এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল। বেড়ালের মত পায়ে ঝাপ্টা মেরে চলে গেল যেন গরম বাতাস।

আলোর সুইচ জ্বাললেন তিনি। আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎ নেই।

বিছানার পাশে মোমবাতি আর বালিশের নীচে দিয়াশলাইয়ের বাক্স রাখেন ডানিং। বিছানার কাছে এসে হাত ঢোকালেন বালিশের তলায়। ম্যাচ নয়, লোমশ আর ক্ষুরধার একটা মুখের স্পর্শ পেল তাঁর হাত।

ভয়তাড়িত ডানিং এক ছুটে ঘর ত্যাগ করলেন। আরেক কামরায় দরজা লাগিয়ে সারাটা রাত পার করলেন কোনমতে। বলাবাহুল্য, এক তিল ঘুম হয়নি তাঁর।

সকাল হলে, সাবধানে দরজাটা খুললেন। বেরিয়ে এসে, নিজের বেড্রুমে গিয়ে সতর্ক দৃষ্টি বুলালেন। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু তবু ভয় কাটল না তাঁর। এ বাড়িতে একা একা থাকবেন না সিদ্ধান্ত নিলেন। ঝটপট তৈরি হয়ে, সুটকেস গুছিয়ে, পিকাডিলির এক হোটেলে এসে উঠলেন।

এখান থেকে মি. হেনরী হ্যারিংটনের উদ্দেশে এক বার্তা পাঠালেন। সন্ধে নাগাদ হোটেলে এসে পৌঁছলেন মি. হ্যারিংটন। একসাথে ডিনার সারলেন তাঁরা।

ডানিং গত রাতের অভিজ্ঞতা হেনরী হ্যারিংটনকে জানিয়ে, তাঁর ভাই জন হ্যারিংটনের কথা জানতে চাইলেন।

'আমার ভাই,' আরম্ভ করলেন হেনরী হ্যারিংটন, 'দু'মাস খুবই অস্বাভাবিক আচরণ করে। তার ধারণা হয়, কেউ একজন তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করছে। কী সব জাদু-টাদুর কথা বলত।'

'জাদু!' ডানিং বলে ওঠেন বিস্ময়মাখা কণ্ঠে। 'কেন বলত কোন ধারণা আছে তোমার?'

'জাদুবিদ্যার ওপর জনের প্রচুর পড়াশোনা ছিল,' বললেন হেনরী। 'অস্থিরতা শুরু হওয়ার আগে, খবরের কাগজে একটা জাদুবিদ্যার বইয়ের সমালোচনা করে সে। লেখে বইটা যাচ্ছেতাই। বইয়ের লেখক ওটা পড়ে ভীষণ খেপে যায়। কার্সওয়েল তার নাম।'

'কার্সওয়েল!'

'তুমি চেনো নাকি তাকে?'

'চিনি,' বললেন ডানিং। 'মিউজিয়াম সোসাইটিতে একটা বই দিতে চায় সে। আমি নিইনি। এক্কেবারে ফালতু লেখা।'

'তারমানে তোমার ওপরও ওর কুদৃষ্টি পড়েছে,' বললেন হেনরী। 'আমার বিশ্বাস কার্সওয়েল তার অশুভ জাদু দিয়ে আমার ভাইটাকে খুন করেছে। তোমাকে সবই বলব আমি।'

খাওয়া সারলেন তাঁরা। এবার ব্র্যাণ্ডি ও ধূমপানের পালা।

'জন বইটার বদনাম করাতে কার্সওয়েল খুব রেগে যায়,' কথার খেই ধরেন হেনরী হ্যারিংটন। 'তারপর এক সন্ধ্যায় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। কনসার্ট শুনতে যায় জন। ওর হাত থেকে প্রোগ্রামটা পড়ে গেলে এক লোক সেটা তুলে দেয়।

'বাড়ি ফিরে প্রোগ্রামটা খোলে জন। এক টুকরো কাগজ ছিল ভেতরে। লাল-কালো কালিতে লেখা। জন ওটা দেখায় আমাকে।

'এটা গত জুনের কথা,' হেনরী হ্যারিংটন বলেন। 'সেদিন এত ঠাণ্ডা ছিল যে আগুন জ্বালতে হয়। কাগজটার দিকে চেয়ে রয়েছি, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। আর গরম এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল ঘরের ভেতর। কাগজটা বাতাসে উড়ে গিয়ে আগুনে পড়ল। মুহূর্তে পুড়ে ছাই।'

'প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে গরম হাওয়া?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে,' বললেন হেনরী। 'মনে হলো কিছু একটা বুঝি ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সে রাত থেকে আজব সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করে জন। তার মনে হতে থাকে কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। বাড়ির বাইরে যেতে চাইত না। ঘুমানোর সময় ও আলো জ্বেলে রাখত। আর একা তো থাকতেই চাইত না।'

'কে পিছু নিচ্ছিল দেখেছ তুমি?'

'না। কিন্তু আমি অন্য আরেকটা অস্বাভাবিক জিনিস লক্ষ করি। একটা ক্যালেণ্ডার। বাই পোস্ট আসে ওটা। আঠারোই সেপ্টেম্বরের পরের সবকটা তারিখ কলম দিয়ে কাটা।'

'কনসার্টটা কবে ছিল মনে আছে?' ডানিং প্রশ্ন করেন।

'আঠারোই জুন—ভাই মারা যাওয়ার তিন মাস আগে,' বলেন হেনরী।

'আর তোমার ভাই মারা যান আঠারোই সেপ্টেম্বর?'

'হ্যাঁ,' জানালেন হেনরী। 'সে রাতে কীসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যেন পালাচ্ছিল ও। পুলিস বলে গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস মারা পড়েছে ভয়ে।'

'কিন্তু তুমি না বললে বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পেতেন উনি,' বললেন ডানিং। 'রাতের বেলা গাঁয়ের পথে হাঁটছিলেন কেন?'

'কারণ সে মারা যাওয়ার দিন দশেক আগে থেকে সমস্যাটা আর ছিল না,' বললেন হেনরী। 'জন মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে, অশুভ জিনিসটা তার পিছু নেয়া বন্ধ করাতে। সে ছুটি কাটাতে গাঁয়ে যাবে ঠিক করে।'

'ও, তাই বলো,' বললেন ডানিং। 'তোমার ভাই কি কার্সওয়েলকে সন্দেহ করতেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন হেনরী। 'কার্সওয়েলের জাদুবিদ্যার বইটার

কথা মাথায় ছিল ওর। শত্রু নিধনের উপায় লেখা ছিল ওতে। কায়দাটা হলো, জাদুকর একটা কাগজে কিছু কথা লিখে শত্রুকে দেবে। তারপর অশুভ এক আত্মা তাকে অনুসরণ করতে থাকবে এবং একসময় খুন করবে।'

'কিন্তু তার কি বাঁচার কোন উপায়ই নেই?'

'আছে,' বললেন হেনরী। 'কাগজটা যদি সে জাদুকরকে ফেরত দিতে পারে। আমার ভাই পারেনি, তার কারণ কাগজটা পুড়ে যায়। কাজেই খুব সাবধান। কার্সওয়েলের কাছ থেকে কিছু নিয়ো না যেন।'

'নিয়ে তো ফেলেইছি!' থমথমে গলায় বলে, উঠে দাঁড়ান ডানিং। 'জাদুঘরে আমার কাগজপত্র আমার হাতে তুলে দেয় ও!'

'তা হলে তো এক্ষুণি ওগুলো একবার দেখতে হচ্ছে।' বললেন হেনরী।

ডানিঙের শূন্য বাড়িতে দ্রুত চলে এলেন দু'জনে। কাজের লোকেরা এখনও অসুস্থ। ইলেকট্রিসিটি কাজ করছে না। গোটা বাড়ি অন্ধকারে ঢাকা। ডানিং মোম জ্বাললেন।

আতঙ্কবোধ করছেন তিনি। তাঁর মন বলছে কেউ একজন আছে বাড়িতে। ওত পেতে রয়েছে তাঁর জন্যে।

ব্রিফকেস খুলে সব কটা পেপার বের করলেন তিনি। সেদিন জাদুঘর থেকে চলে আসার পর এগুলোতে আর নজর বোলাননি।

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎই নড়ে উঠল কী যেন। লক্ষ করলেন এক টুকরো কাগজ বাতাসে লাফিয়ে উঠে, ভেসে যাচ্ছে মোমবাতি লক্ষ্য করে।

হেনরী হ্যারিংটনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো, আগুন ধরার আগেই খপ করে চেপে ধরলেন কাগজটা। তারপর মোমের শিখায় লক্ষ করলেন অদ্ভুত ধরনের লাল-কালো কালি দিয়ে লেখা

হয়েছে।

'লেখাটা ভাল করে দেখো,' ডানিংকে বললেন তিনি। 'আমার ভাইকেও ঠিক একই জিনিস দেয়া হয়।'

'এখন কী করা যায়?' ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন ডানিং।

'কাগজটা যেভাবে হোক কার্সওয়েলকে ফিরিয়ে দিতে হবে,' বললেন হেনরী। 'কবে পেয়েছ এটা?'

'গতকাল। তেইশে এপ্রিল।'

'তারমানে আমাদের হাতে তিন মাস সময়।' বললেন হেনরী। 'তেইশে জুলাই পর্যন্ত।'

কার্সওয়েলের ওপর নজর রাখার জন্য গোয়েন্দা ভাড়া করা হলো। কিন্তু লোকটা লাফোর্ড অ্যাবে থেকে কখনোই বেরোয় না। মুশকিল হলো, ওখানে ঢোকারও কোন কায়দা নেই।

কার্সওয়েলকে বের করে আনার নানা চেষ্টা করলেন ওঁরা। তাকে দাওয়াত দেয়া হলো। অন্য লোকের নাম ভাঁড়িয়ে সভা-সমিতিতে, ডিনারে আমন্ত্রণ জানানো হলো। কিন্তু কার্সওয়েল কারও আমন্ত্রণ রক্ষা করল না। যেমন ছিল, লাফোর্ড অ্যাবেতে গ্যাঁট মেরে বসে রইল।

এপ্রিল গেল, জুলাইয়েরও বেশিরভাগটা উড়ে গেল। বিশে জুলাই, ডানিং টের পেলেন তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। আর মাত্র তিনদিন। বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় জানিয়ে চিঠি-পত্র লিখলেন এবং উইলও তৈরি করলেন।

সেদিন সন্ধেয়, গোয়েন্দাদের তরফ থেকে টেলিগ্রাম এল।

কার্সওয়েল ভিক্টোরিয়া স্টেশন ত্যাগ করছে
বোট-ট্রেনে চেপে ফ্রান্সের উদ্দেশে
বৃহস্পতিবার রাতে, ২২ জুলাই।

'ব্যাটাকে কাগজটা ফেরত দেয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে,' হেনরী বললেন ডানিংকে। 'আমরা ট্রেনে উঠে ওর কাছাকাছি কোথাও বসতে পারি।'

'কিন্তু কাগজটা তো আমার নিজের হাতে ফেরত দিতে হবে,' বললেন ডানিং। 'ও আমাকে চেনে। দেব কীভাবে?'

'শোনো,' বললেন হেনরী। 'একটা বুদ্ধি এসেছে। তুমি নকল দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরবে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ট্রেনে উঠব আমি। কার্সওয়েলকে খুঁজে নিয়ে তার কাছে বসে থাকব।

'ক্রয়ডনে থামে বোট-ট্রেনটা। ক্রয়ডনে ট্রেনে উঠবে তুমি, আমার পাশে গিয়ে বসবে। কার্সওয়েলকে কাগজটা ফিরিয়ে দেয়ার একটা না একটা ছুতো বের করে ফেলা যাবে।'

নির্দিষ্ট দিনে ডানিং ক্রয়ডন স্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভয়ানক উদ্বিগ্ন বোধ করছেন তিনি। বোট-ট্রেন আজ লেট করছে। ট্রেন আসতে, দেখা গেল হেনরী জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছেন।

ট্রেনে উঠে পড়লেন ডানিং। কার্সওয়েলের সঙ্গে একই বগিতে বসে হেনরী। কামরায় লোকজন নেই বললেই চলে। ডানিং বসে পড়ে একটা বই খুললেন। কাগজটা আছে বইয়ের প্রচ্ছদের ভিতরে।

হেনরীর দিকে তাকাচ্ছেন না ডানিং। কিন্তু কার্সওয়েলের সতর্ক দৃষ্টি তাঁদের দু'জনের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড এক হ্যাট ও নকল দাড়ি পরেছেন ডানিং।

একসময় সটান উঠে দাঁড়াল কার্সওয়েল। আসনের ওপর কোটটা ছেড়ে, চুরুট টানতে করিডরের দিকে গেল।

ডানিং কোটটা তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কী ভেবে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কার্সওয়েল। সাবধানী দৃষ্টিতে ডানিংকে খুঁটিয়ে লক্ষ

করে আসনে এসে বসে পড়ল।

সময় পার হচ্ছে। ডোভারের দিকে ক্রমেই কাছিয়ে আসছে ট্রেন। ডানিং ভীতি বোধ করছেন, গরমে ঘেমে নেয়ে অস্থির। শয়তানটাকে কাগজটা ফেরত দেবেন কীভাবে?

টিকেট কালেক্টর এসময় হেঁটে এল করিডর ধরে। ডানিঙের টিকেট পরীক্ষা করে দেখল। ওয়ালেট বের করে টিকেট দেখাল কার্সওয়েল। তারপর কোটের ওপর রেখে দিল ওয়ালেট।

হেনরী হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলেন কার্সওয়েলের কোটটা। কোটের সঙ্গে ওয়ালেটটাও পড়ল।

'ওহ হো, সরি,' বলে হেনরী তুলে নিলেন কোটটা। এবং একই সঙ্গে লাথি মেরে ওয়ালেটটা পাস করে দিলেন কাছে বসা ডানিঙের উদ্দেশে। এবার কার্সওয়েলের দিকে কোটটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই নিন।'

নিল না কার্সওয়েল। ঘৃণা ভরে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেনরীর দিকে। এই সুযোগে মেঝে থেকে ওয়ালেটটা আলগোছে তুলে নিলেন ডানিং।

কার্সওয়েলের পাশে, আসনের ওপর কোট নামিয়ে রাখলেন হেনরী। তারপর টিকেট কালেক্টরকে টিকেট দেখালেন।

টিকেট কালেক্টর অন্যদিকে সরে গেলে, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করিডরের দিকে পা বাড়াল কার্সওয়েল। এবার বোধহয় সত্যিই ধূমপান করবে।

'আচ্ছা,' কালেক্টরের উদ্দেশে বলল, 'ডোভারে কি কুলি পাওয়া যাবে জাহাজে মাল তোলার জন্যে?'

'নিশ্চয়ই, স্যার,' গলা চড়িয়ে বলল কালেক্টর। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ডোভার পৌঁছে যাব।'

কার্সওয়েল করিডরে গেছে, এই ফাঁকে ডানিং কাগজটা গুঁজে

দিলেন জাদুকরের ওয়ালেটে। তারপর ওটা টুপ করে ফেলে দিলেন মেঝেতে।

একটু পরে, কার্সওয়েল ফিরে এল বগিতে।

'এটা আপনার নাকি, স্যর?' ওয়ালেটটা তুলে দেখালেন ডানিং।

কার্সওয়েল ওটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

'ধন্যবাদ,' বলে নিল জিনিসটা। কোটটা যেমন ছিল পড়ে রইল আসনের একপাশে।

ইতোমধ্যে গতি কমে এসেছে ট্রেনের। আঁধার ঘনিয়েছে বগির ভিতর। হঠাৎ এক ঝলক উষ্ণ বাতাসের হলকা বয়ে গেল। ট্রেন থেমে দাঁড়াল ডোভার স্টেশনে। কার্সওয়েল দেরি না করে নেমে গেল।

'কুলি!' গর্জাল সে। ছুটে এল কুলি। তার কাছে লটবহর গছিয়ে দিল কার্সওয়েল।

এবার কাঁধের ওপর দিয়ে হেনরীর দিকে চেয়ে ক্রূর হাসি হাসল। তারপর হাঁটা দিল জাহাজের উদ্দেশে।

ডানিং আর হেনরী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছেন। কুলি কার্সওয়েলের মোটঘাট তুলে দিল জাহাজে। এক অফিসারকে তাঁরা বলতে শুনলেন, 'সরি, স্যর, জাহাজে জন্তু-জানোয়ার নেয়া নিষেধ।'

তারপর মুহূর্ত বাদে শোনা গেল: 'সরি, স্যর। আপনার কোটটাকে আমি বেড়াল ভেবেছিলাম।'

ফ্রান্সগামী জাহাজে উঠে পড়ল কার্সওয়েল। এদিকে ডানিং আর হেনরী লণ্ডনের ফিরতি ট্রেন ধরলেন।

দু'দিন বাদে, দ্য টাইমস পত্রিকায় একটা খবর বেরোল।

দ্য টাইমস

দুর্ঘটনা

অ্যাবেভিল, ফ্রান্স

২৩ জুলাই

সেণ্ট উলফ্রামের গির্জায় আজ এক
মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গির্জার
টাওয়ার থেকে এক ইংরেজ পর্যটক
পড়ে যান। ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে
তাঁর। পর্যটকের নাম
মি. কার্সওয়েল, ভদ্রলোক লাফোর্ড
অ্যাবের মালিক।

মূলঃ এম. আর. জেমস
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

প্রেতিনী

সাম্প্রতিক একটা মামলার বিষয়ে আমরা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলাপ করছিলাম। এক পর্যায়ে নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা প্রসঙ্গ এসে গেল। আড্ডায় সাধারণত যা হয়, একবার একটি প্রসঙ্গ উঠলে গোটা আলোচনা সেদিকেই ধাবিত হয়। প্রত্যেকেই যার যার জানা নিঃসঙ্গতা বিষয়ক গল্প কাহিনি বলতে শুরু করল। সবাই দাবি করতে লাগল গল্পগুলো আসলে বাস্তব ঘটনা।

আলাপের এক পর্যায়ে আসরের সবচেয়ে বয়স্ক আড্ডাবাজ আশি বছরের বুড়ো মার্কুইজ স্যামুয়েল ঘরের উজ্জ্বল বাতিটার দিকে তাকিয়ে স্বভাবসুলভ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন: এ বিষয়ে আমারও একটা ভয়াবহ কাহিনি জানা আছে। ঘটনাটা সম্পূর্ণ বাস্তব, এক বর্ণও বানানো নয়। ঘটনাটা এমন ভীতিজনক যে তার স্মৃতি এখনও আমাকে তাড়া করে ফেরে। কম করে হলেও ছাপ্পান্ন বছর আগের ঘটনা। অথচ দেখো, মাসখানেক আগেও স্বপ্নে দেখলাম। বিষয়টা আমার মনের মধ্যে এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে মাঝে মাঝেই আমি স্বপ্নে দেখি। এই ভীতিজনক ঘটনার স্থিতিকাল মিনিট খানেকের বেশি ছিল না অথচ একটা স্থায়ী ভয় এখনও আমার হার্টবিট বাড়িয়ে তোলে। রাতের অস্পষ্ট আলোয় দেখা জিনিস আমাকে পলায়নপর করে তোলে, কেননা আমি অন্ধকারকে ভয় পাই। ওই ঘটনা আমাকে এত বেশি

উতলা করে যে দীর্ঘস্থায়ী ও রহস্যময় অস্বস্তিতে ভুগতে থাকি—কারও কাছে এই ভয়, এই বেদনা প্রকাশ করতে পারি না। আজ কেন জানি না সবকিছু বলবার সাহস অর্জন করেছি। আজ আমি সব বলব তোমাদের। অকপটে বলব, ঠিক যা যা ঘটতে দেখেছি। তবে ভাই, ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টা অনেকদিন আগের তা তো তোমাদের বলেছি। তখন থাকতাম বোঁ এলাকায়। একদিন জেটির ধার দিয়ে হাঁটছিলাম। একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। তার নামধাম অবশ্য মনে করতে পারলাম না। আমি হাঁটার গতি কমিয়ে দিলাম। টের পেয়ে লোকটা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। যৌবনে এই মানুষটার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, শেষ পর্যন্ত এই কথাটি স্মরণে আনতে পারলাম। বছর পাঁচেক যাবৎ তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। মনে হলো লোকটার বয়স এই পাঁচ বছরে পঞ্চাশ বছর বেড়ে গেছে। মাথার সব চুল পেকে একেবারে ধবধবে সাদা। খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল সে। মনে হচ্ছিল শরীরে কোন শক্তি নেই। আমার বিস্ময়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। তার দুর্ভাগ্যের কারণ সবিস্তারে খুলে বলল আমাকে।

এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পাগল হয়ে তাকে বিয়ে করেছিল সে। কিন্তু বড়ই মন্দ কপাল তার। দু'বছর না ঘুরতেই হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মারা গেল সে। স্ত্রীকে কবর দিয়ে সেদিনই গৃহত্যাগ করল লোকটা। এখন সে থাকে বোঁ এলাকায়। মনে তার সুখ নেই, শান্তি নেই। দুঃখ আর হতাশায় ভুগতে ভুগতে এখন সে দিবানিশি আত্মহত্যা করার কথা ভাবে। সে আমাকে বলল, 'শেষমেশ তোমাকে পেলাম। আমাকে কিন্তু একটা জরুরী কাজ করে দিতে হবে, ভাই। না করতে পারবে না। আমার

পুরানো সেই বাড়িটায় যেতে হবে তোমাকে। আমার বেডরুমের দেরাজ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এনে দিতে হবে। চাকরবাকর বা কাজের লোক পাঠানো যাবে না, কারণ ব্যাপারটিতে কিছু বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। চাকরবাকর দিয়ে তা হবার নয়। আমার নিজের কথা যদি বলো, তা হলে না বলে পারছি না—পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই ফের আমাকে ওই বাড়িতে পাঠায়, ওই অভিশপ্ত বাড়িতে যেতে বলে আমাকে। তোমাকে আমার বেডরুম ও দেরাজের চাবি দেব। মালীকে একখানা চিঠি লিখে দেব যাতে সে আমার বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে কোন বাধা না দেয়। কাল সকালে এসো আমার বাড়িতে, এক সাথে নাশতা করব। তখন বাদবাকি আলাপ সারা যাবে।'

আমি লোকটাকে কথা দিলাম তার কাজটি করে দেব। কারণ ব্যাপারটি তেমন কঠিন বলে আমার মনে হয়নি। ঘোড়ায় চড়ে তার পুরানো সেই বাড়িটাতে পৌঁছুতে আমার ঘণ্টা খানেকের বেশি লাগবে না। পরদিন সকালে সেই বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে নাশতা খেলাম আমি। একটা বিষয়ে ভেবে অবাক হলাম, সে আমার সাথে খুব কম কথা বলল। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে জানাল যে ব্যাপারটা নিয়ে সে খুবই চিন্তিত। একটা কিছু সুরাহা হতে চলেছে এই মানসিক শান্তি পাওয়ার আশায় ব্যাকুল সে। কীভাবে কী করতে হবে সে বিষয়ে আমার বন্ধু একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়ে বসল। অথচ ব্যাপারটা ছিল খুবই সাদামাঠা, এত দীর্ঘ বক্তৃতার কোন দরকারই ছিল না। সে বলল, 'ডানদিকের টেবিলের প্রথম দেরাজ থেকে আমাকে দুটি প্যাকেট ও কিছু কাগজপত্র এনে দিতে হবে, এর বেশি কিছু না। তবে একটা কথা—প্যাকেটগুলোর দিকে কিন্তু ভুলেও তাকাবে না তুমি।'

তার ওই কথায় কিছুটা আহত হলাম আমি। ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললাম: ঠিক আছে, তুমি যে ভাবে বলবে, সে ভাবেই হবে।

আমাকে ক্ষুণ্ন হতে দেখে সে অপরাধীর স্বরে বলল, 'আমাকে মাফ করে দাও, ভাই। বুঝতেই পারছ মাথা ঠিক নেই আমার।'

তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। বেলা একটা নাগাদ আমি বন্ধুর বাড়ি থেকে রহস্যময় সেই অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম।

আবহাওয়াটা ছিল খুবই চমৎকার। পাখিদের গান শুনতে শুনতে চারণভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললাম। খুব ভাল লাগছিল। বনের মধ্যে ঢুকে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে লাগলাম। বুনো গাছপালার পাতা চোখে মুখে ঝাপটা মারছিল। জীবন কী সুন্দর এই বোধ থেকে হৃদয়ে অনির্বচনীয় সুখ এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বন্ধুর বাড়ির কাছে এসে পৌঁছুলাম। পকেট থেকে মালীকে লেখা চিঠিখানা বের করলাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম চিঠিখানার মুখ সিলগালা করা। মেজাজটা এমন বিগড়ে গেল যে মনে হলো তখনই ফিরে যাই। বন্ধুর চঞ্চল ও নাজুক মানসিকতার কথা বিবেচনা করে নিজেকে সংযত রাখলাম আমি।

বছর বিশেকের পরিত্যক্ত বাড়ি এটা। সদর দরজাটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। রাস্তায় ঘাস বিচালি গজিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ফুল গাছগুলোকেও আলাদা করে চিনবার উপায় নেই। দরজায় কড়া নাড়তে একজন বুড়ো মতন লোক বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সে। চিঠিখানা তার হাতে দিলে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল বুড়ো ভৃত্যটি। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখন কী করতে চান?'

আমি বললাম, 'আশা করি সে কথা তুমি চিঠিটা পড়েই অনুধাবন করতে পেরেছ। তবুও তুমি যখন জিজ্ঞেস করলে তখন বলি—আমি এই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে চাই।'

ভৃতটি বলল, 'আপনি তা হলে বেগম সাহেবার ঘরে ঢুকবেন?'

আমার রাগ চরমে উঠেছিল। ক্ষুব্ধ স্বরে বললাম, 'অবশ্যই। কিন্তু এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। তোমার প্রভুর কথামত কাজ করো।'

এর জবাবে বৃদ্ধ বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই, স্যর। আমি বলছিলাম কি, বেগম সাহেবার মৃত্যুর পর ঘরটা একবারও খোলা হয়নি। আপনি যদি দয়া করে দশটা মিনিট সময় দেন তা হলে আগে গিয়ে দেখে আসি অবস্থাটা।'

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, 'আমার কাছে চাবি আর তুমি ঢুকবে ঘরে? চালাকি পেয়েছ? কী মতলব তোমার? বেশি কথা না বলে ওপরে যাবার রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দাও।'

এরপরও চাকরটা আমতা আমতা করতে লাগল। তাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম আমি। রান্নাঘর, চাকরদের কামরা ও প্রশস্ত হলঘর পার হয়ে বন্ধু বর্ণিত তার স্ত্রীর ঘরে যাওয়ার সিঁড়ি পেয়ে গেলাম। খুব সহজেই তালাটা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি। ঘোরঘুট্টি অন্ধকার হাঁ করে আছে ঘরটার মধ্যে। চোখে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। দীর্ঘদিনের বদ্ধ ঘরটা থেকে মাটির সোঁদা গন্ধ আসছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকারের পর্দাটা চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল। এলোমেলো বিশাল বেডরুম। বিছানায় কোন চাদর নেই। জাজিমের ওপর একটা বালিশ। বালিশটার মাঝখানে মাথা রাখার কারণে সৃষ্ট গর্ত। মনে হচ্ছিল একটু আগেই এখানে কেউ শুয়ে ছিল। ঘরের চেয়ারগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো। বাথরুমটার

দরজা এখনও আধা ভেজানো। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রথমে আমি জানালার ধারে গেলাম। সাটারগুলোতে মরচে ধরে একেবারে শক্ত হয়ে আছে বলে খুলতে পারলাম না। তরবারির আঘাতে ভাঙতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোন লাভ হলো না। একেবারে বিরক্তি ধরে গেল আমার। জানালা খোলার চিন্তা বাদ দিয়ে টেবিলের কাছে গেলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বন্ধুর নির্দেশ মত ড্রয়ারটা খুললাম। জিনিসপত্রে ঠাসা ড্রয়ারটা। প্রত্যাশিত কাগজের প্যাকেটগুলো খুঁজতে লাগলাম আমি।

আমার দৃষ্টি প্যাকেটগুলোর গায়ের লেখার ওপর নিবদ্ধ হলো। ঠিক সেই সময় আমার পেছন দিকে খচমচ করে কীসের যেন শব্দ হলো। পাত্তা দিলাম না। মিনিটখানেক পরেই আবার ভারি শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা ঠিক কীসের বোঝা গেল না, সারা শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। নিজের অকুতোভয় স্বভাবের কারণেই ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে পেছনে ফিরে তাকালাম। দু'নম্বর প্যাকেটটা যেই পেয়ে গেলাম তখনই স্পষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস আমার কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর আর আমার পক্ষে সেখানে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব হলো না। প্রচণ্ড ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরিষ্কার দেখতে পেলাম সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারটার পেছনে, একটু আগেই যে চেয়ারটাতে আমি বসেছিলাম। মহিলার দৃষ্টি আমার চোখের দিকে। প্রচণ্ড ভয় বিদ্যুতের মত আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার দু'টি পা। দানবীয় ভীতি আমার মগজের কোষে কোষে খেলে যেতে লাগল। হৃদয়ের কম্পন চলল বেড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কাঁপতে লাগল আমার সারা শরীর। ভূত প্রেতে বিশ্বাস নেই আমার। মৃত্যুর ভয় তো আমাকে ভীত

করে না কখনও। তবে এই মুহূর্তে অতি প্রাকৃতের আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করেছে। একথা অস্বীকার করব না। মহিলাটি যদি কথা না বলত তা হলে হয়তো ভয়েই মরে যেতাম আমি। কিন্তু কথা বলল সে। বলল সুরেলা কণ্ঠে। ব্যথাভরা স্বরে। তার এই মুখরতা আমার হৃদস্পন্দনের মাত্রা কমিয়ে এনে প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে দিল। তবে এর সবকিছু যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা তখনও হলো না। মেয়েটি তার সেই দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, 'স্যর, আমার একটা উপকার করবেন?'

আমি তার কথার জবাব দিতে চাইলাম কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। আমার কণ্ঠ দিয়ে শুধু ফ্যাঁসফেঁসে ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'আপনি আমাকে বাঁচান, স্যর। আমার একটুখানি উপকার করুন। আমাকে সারিয়ে তুলুন আপনি, বড় কষ্টে আছি আমি, ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছি।'

কথা বলতে বলতে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল মেয়েটি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি কোন কথা বলতে পারছিলাম না। জিভের প্রচণ্ড আড়ষ্টতা সত্ত্বেও আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমি আপনার উপকার করব।'

মেয়েটি কাছিমের হাড়ের একটা চিরুনি বের করে আমার হাতে দিল। বলল, 'চুলে জটা ধরে গেছে। অনেকদিন আঁচড়ানো হয় না, একটু আঁচড়ে দেবেন চুলটা? তা হলেই সেরে উঠব, ভাল হয়ে যাব আমি। দেখুন আমার মাথার দিকে তাকিয়ে কেমন বিচ্ছিরি রকমের জটা ধরে গেছে।'

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম অসম্ভব দীর্ঘ, ঘন কালো চুল তার। চেয়ারের ওপর থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে গেছে। আমার মনে হলো কেমন করে চিরুনিটা হাতে নেব। এত দূরে হাত

বাড়াব কী করে? সারা শরীরে একটা শীতল ভয় খেলে গেল। মেয়েটার এক একটা চুলকে মনে হতে লাগল এক একটা সাপ। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

আশ্চর্য ব্যাপার, তার চুল আঁচড়ে দিলাম আমি। জটা ছাড়িয়ে সুন্দর মসৃণ করে বেণী পাকিয়ে দিলাম। কী করে করলাম কাজটা বলতে পারব না। আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটি, মাথা নিচু করে চুল আঁচড়াতে সাহায্য করল আমায়। তাকে তখন খুব সুখী মনে হলো। চুল আঁচড়ানো হয়ে গেলে মিষ্টি হেসে ধন্যবাদ দিল আমাকে। চিরুনিটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। ঘরের ভেতর একা পড়ে রইলাম আমি। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে মানুষ যে রকম ভীত বিহ্বল হয় আমারও তেমন অবস্থা হলো। কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পেলাম আমি। দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। খুলে দিলাম বিশাল একটা জানালা। এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। দ্রুত ছুটে গেলাম দরজাটার কাছে, যেটা দিয়ে পালিয়ে গেছে মেয়েটি। দরজাটা শক্ত করে আটকানো, এমন কী খুলবার কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। আমি এমন আতঙ্কিত হলাম যে ভাবলাম দ্রুত পালাতে হবে এখান থেকে, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা চলবে না। প্যাকেটগুলো শক্ত করে ধরে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আমার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। কাল বিলম্ব না করে ঘোড়াটা ছুটিয়ে দিলাম। থামলাম এসে একেবারে আমার ঘরের দোরগোড়ায়। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে পুরো ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে বসলাম। কিন্তু কোন কূলকিনারা পেলাম না। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে আমি একটা হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছি মাত্র। যা কিছু দেখেছি সবই আমার দৃষ্টির বিভ্রম, লুপ্ত চেতনার ভ্রান্তি।

জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। বাইরে ঝলমলে আলো। সেই আলোর অনেকখানি ঘরে এসে ঢুকেছে। হঠাৎ চোখ পড়ল আমার বুকের ওপর। আমার কোটের বোতামের সাথে ঝুলে আছে একটি দীর্ঘ মেয়েলি চুল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত দিয়ে চুলটি সরিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। ভীষণ অসুস্থতা অনুভব করতে লাগলাম আমি। চাকরটাকে দিয়ে ভূতুড়ে বাড়িটা থেকে উদ্ধার করা প্যাকেটগুলো বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। প্যাকেটগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করে বন্ধুর সই করা একটা রশিদও চাকরটা এনে আমাকে দিল।

পরদিন সকালে বন্ধুর খোঁজে বের হলাম আমি। তাকে সব কিছু খুলে বলতে না পারলে শান্তি পাব না আমি। তার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে, আর ফেরেনি। পরদিন আবার গেলাম আমি। পাওয়া গেল না তাকে। এমনি করে কেটে গেল সাতটা দিন।

তাকে খুঁজে বের করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারস্থ হলাম আমি। তারা দ্রুত তদন্তে নেমে পড়ল। বিশদ তদন্ত করে জানাল, ওই ভূতুড়ে বাড়িতে সন্দেহজনক কোন চরিত্রের সন্ধান তারা পায়নি। তারা এরকম কোন প্রমাণও পায়নি যে, ওই বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক বাস করত। আমার বন্ধুকে খুঁজে বের করবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ওই ঘটনার পর ছাপ্পান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু বন্ধুটির কোন খোঁজ আজও আমি পাইনি।

মূলঃ গী দ্য মোপাসাঁ
অনুবাদঃ দিলওয়ার হাসান

সর্পকন্যা

কোরিয়া দেশের আকৃতি এমন, দেখলে মনে হয় জাপান দ্বীপপুঞ্জের বুকে উঁচু করে ধরে রাখা হয়েছে একটা ছুরি। সেদেশে দুটো গ্রাম আছে। চুংশান লি এবং মিনদং লি। গ্রামদুটোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বিশাল পাহাড়। আর পাহাড় জুড়ে ওক আর পাইন গাছের গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় বুনো জন্তুরা। গাছে গাছে উড়ে বেড়ায় পাখি। বুকে ভর দিয়ে চলাচল করে সাপের দল। অনেক সাপ এই জঙ্গলে। কোনও কোনও সাপের বয়সের ঠিক নেই।

অনেক কিংবদন্তি রয়েছে এই সাপ সম্পর্কে। অনেকে বলে, এসব সাপ নাকি মেয়ে মানুষের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য অনেকেই বিশ্বাস করে না একথা। তবুও সাহসী লোকেরা পর্যন্ত এড়িয়ে চলে এই জঙ্গলের পথ। রাতের বেলা এদিক দিয়ে চলার কথা স্বপ্নেও ভাবে না কেউ।

চুংশান লি গ্রামের এক ছেলে হিয়াংখুন। বয়স ষোলো ওর। 'মিনদং লি গ্রামে যাবি তুই,' একদিন হিয়াং-এর বাবা ডেকে বললেন তাকে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার এক বাল্যবন্ধু আছে ওখানে,' বাবা বললেন, 'খুব ধনী। সবকিছুর উত্তরাধিকারিণী তার একমাত্র মেয়ে। প্রায় তোর বয়সী সে। তোরা যখন ছোট ছিলি, আমরা দু'বন্ধু মিলে ঠিক করেছিলাম

তোদের বিয়ে দেব। এখন বিয়ের বয়স হয়েছে তোর। মেয়েটারও বিয়ের বয়স হয়েছে। দেরি করতে চাচ্ছি না আমি। তাই তোকে পাঠাতে চাচ্ছি মিনদং লি গ্রামে। আলাপ করে আয় ওদের সাথে। দেখে আয় মেয়েটাকেও।'

'কবে যাব?' বলল হিয়াং।

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়,' বাবা বললেন।

একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ভাবী শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল হিয়াংখুন।

মানুষ চলাচলের পথে গেল না সে, হাঁটা ধরল জঙ্গলের পথে। মানুষ চলাচলের পথে গেলে পৌঁছতে সময় লাগবে তিনদিন। পাহাড়-জঙ্গলের পথে গেলে পরদিন সকালেই পৌঁছানো যাবে। তা ছাড়া এ পথে গিয়ে ওদের দেখানোও যাবে কত সাহস ওর।

খুবই সাহসী ছেলে হিয়াংখুন। অনেক ঘুরেছে সে পাহাড়-জঙ্গলের পথে। সুতরাং এ পথে যেতে ভয় করল না তার। জোরে পা চালাল সে। পথে খাবার জন্য তার কাছে রয়েছে এক ব্যাগ সেদ্ধ আলু। এ ছাড়া কাঁধে রয়েছে এক বোঝা কাপড়। বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীর জন্য কাপড়গুলো উপহার হিসেবে দিয়েছেন হিয়াং-এর বাবা।

ফুরফুরে মেজাজে পথ চলতে লাগল হিয়াং। বনের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। সে এতটা আনমনা হয়ে পড়েছিল যে সরুপথটার দিকে আর খেয়াল রইল না। ফলে পাহাড়ি জঙ্গলে পথ হারাল সে।

ইতোমধ্যে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিম আকাশে। আর একটু পরে নামবে অন্ধকার। এখন পথের সন্ধান না পেলে অন্ধকারে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করল হিয়াং। কিন্তু খুঁজে পেল না পথ। ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল জঙ্গলে।

বন্যজন্তুদের চলাফেরার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। হিয়াং কি ওদের

হাতে মারা যাবে? কিন্তু এভাবে মরবে না সে। একটা আশ্রয় তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটা গাছের কোটর কিংবা পাহাড়ের গুহায় রাত কাটাতে পারে সে। ইতোমধ্যে চোখে সয়ে এসেছে অন্ধকার। আবছা দেখা যাচ্ছে সবকিছু। খুব সতর্কতার সাথে পা বাড়াল সে।

মাঝরাতের দিকে দূরে একটা আলো দেখতে পেল হিয়াং। এগোল সেদিকে। একটু পর একটা ঘরের সামনে চলে এল। ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে বাইরে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। যাক, একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে।

এত রাতে বাড়ির লোকজনদের বিরক্ত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারল না হিয়াং। ইতস্তত করতে লাগল সে। কিন্তু বাইরে খুব ঠাণ্ডা। সহ্য করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া যদি সাপ মেয়ে সত্যিই থেকে থাকে তখন কী হবে? সুতরাং বাধ্য হয়ে বাড়ির দরজার দিকে এগোল সে। ধাক্কা দিল বন্ধ দরজায়। কিছুক্ষণ কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুলল তাকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল হিয়াং।

দরজা খুলেছে এক মাঝবয়সী মহিলা। মাথার বেশির ভাগ চুল পাকা তার। মহিলা বলল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ? যাবে কোথায়? ভেতরে এস। বাইরে খুব ঠাণ্ডা, জমে যাবে তো।'

মহিলার কথায় আশ্বস্ত হলো হিয়াং, মহিলার পিছুপিছু ভিতরে ঢুকল।

মেঝেটা ধুলোয় ভর্তি। এক কোণে হাঁটু মুড়ে বসল হিয়াং। কোনও বয়স্কা মহিলাকে সম্মান জানানোর এটাই রীতি।

'বস, খোকা, আরাম করে বস,' নরম গলায় বলল মহিলা, 'এত রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে কী করছ জঙ্গলে, তোমার কি একটুও ভয় নেই?'

'পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি,' বলল হিয়াংখুন।

'পথ হারিয়ে ফেলেছ?' মহিলা বলল, 'কিন্তু কেন এসেছিলে এপথে?'

হিয়াং খুলে বলল সব কথা। মন দিয়ে শুনল মহিলা, তারপর বলল, 'খুব সাহসী ছেলে তুমি। গরম পানি এনে দিচ্ছি, হাত মুখ ধুয়ে নাও। তারপর খাবারের ব্যবস্থা করব তোমার।'

'এতরাতে আমার জন্য কষ্ট করতে হবে না আপনাকে,' হিয়াং বলল, 'থাকার জন্য একটু জায়গা পেলেই আমার চলবে।'

'কী বলছ!' মহিলা বলল। 'আমার অতিথি তুমি। তোমার জন্য এটুকু করব না?'

হিয়াং বলল, 'তা হলে গরম পানি দিলেই হবে। খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে না। খাবার আমার সঙ্গে আছে।'

'কী খাবার?'

'সেদ্ধ আলু।'

'আর কিছু লাগবে না?'

'না।'

একটু পরে মহিলা একটা বড় পাত্রে গরম পানি নিয়ে এল। 'নাও, ভাল করে হাত মুখ ধোও। দরকার হলে আরও পানি দেয়া যাবে।'

গরম পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে সেদ্ধ আলু খেতে লাগল হিয়াংখুন।

মহিলা বলল, 'আমার স্বামী শহরে মেলা দেখতে গেছে। ফিরবে কাল। সে ফিরবার আগেই আমার সেলাইয়ের কাজ শেষ করতে হবে। কিছু লাগবে তোমার?'

'না।'

'তা হলে আমি হাতের কাজটা সেরে ফেলি।'

মহিলা ঘরের অন্যকোণে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসল।

ভরপেট খাবার পর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল হিয়াং-এর। দুচোখে ঘুম নেমে এল। ধকল তো কম যায়নি পাহাড় আর জঙ্গলের পথে হাঁটতে গিয়ে। দেয়ালে হেলান দিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে সে। পরক্ষণে সব মনে পড়ল। দু'চোখ ডলে ঘরের চারদিকে তাকাল সে। যেন বদলে গেছে ঘরটা। সব কিছু কেমন অস্পষ্ট আর আবছা। মহিলা তখনও প্রদীপের সামনে বসে সেলাই করে যাচ্ছে। তবে অনেক কমে গেছে বয়স। দারুণ সুন্দরী লাগছে তাকে। মাথায় একটাও পাকা চুল নেই। একরাশ কালো চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে। সেলাই করার সময় নড়ছে তার হাত। সেই তালে দুলছে তার অপূর্ব দেহ সৌষ্ঠব।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হিয়াংখুন। না, ভুল দেখছে না সে। পালটে গেছে মহিলার চেহারা। বৃদ্ধা পরিণত হয়েছে যুবতীতে। হাসছে ঠোঁট টিপে।

ঘুম পুরোপুরি চলে গেছে হিয়াং-এর চোখ থেকে। মহিলাকে ভাল করে দেখার জন্য সামনে এগোল সে। আলাপ করার জন্য বলল, 'এই পাহাড় আর জঙ্গলের নৈসর্গিক দৃশ্য সত্যিই সুন্দর।'

সুঁইয়ের সুতো শেষ হয়ে গিয়েছিল মহিলার। সুঁইয়ে নতুন সুতো পরানোর জন্য জিভ বের করল। সুতোর মাথাটা ভেজাল জিভ দিয়ে। চমকে উঠল হিয়াংখুন। আতঙ্কে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। সে দেখল, মহিলাটির জিভটা চেরা—সম্পূর্ণ চেরা! একেবারে সাপের জিভের মত। ভয় পেল হিয়াং। বুঝতে পারল নিঝুম এই রাতে দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলে এক সর্পকন্যার কবলে পড়েছে সে। চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল অনেক কষ্টে। বাঁচতে

হলে পালাতে হবে তাকে। যেমন করে হোক পালাতে হবে এখান থেকে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। বলল, 'আমি—আমি একটু বাইরে যাব। ইয়ে—প্রকৃতির ডাক।'

চোখ তুলে হিয়াং-এর দিকে তাকাল মেয়েটা। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সন্দেহ। পরক্ষণে হেসে বলল, 'পেছনে দরজার ওপাশে ব্যবস্থা আছে। ওদিকে যাও।'

দরজার ওপাশে গিয়ে দৌড় শুরু করল হিয়াং। কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না সে। ছুটছে প্রাণপণে। ছুটতে ছুটতে এক পায়ের জুতো খুলে গেল। পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল পা। তবু ছুটছে। গাছের কাঁটায় ছিঁড়ে গেল জামাকাপড়। গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ফেটে গেল কপাল। রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই হিয়াংখুনের। সে ছুটছে...। পিছনে শোনা যাচ্ছে শব্দ। সর্পকন্যা তাড়া করেছে তাকে। সর্বনাশ! এখন কী করবে সে? হঠাৎ সামনে একটা ঘর দেখে থেমে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে। বুঝতে পারছে না এখানে আশ্রয় নেয়া নিরাপদ হবে কিনা।

হঠাৎ ঘরের ভিতর ঘণ্টার শব্দ হলো। কিছুটা স্বাভাবিক হলো হিয়াং। ভাবল, পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর কোন বৌদ্ধ মন্দির এটা। মন্দির হলে নিশ্চয় আশ্রয় মিলবে এখানে। আর সর্পকন্যাও কোন ক্ষতি করতে পারবে না তার। ভাল করে ঘরটার দিকে তাকাল সে, পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। টালির ছাদ। দৌড়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল সে। চিৎকার করে বলল, 'আমাকে বাঁচান... দরজা খুলুন।'

খুলে গেল দরজা। ওখানে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী। হিয়াংকে ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বললেন তিনি। ভেতরে ঢুকল হিয়াং।

ঘরের এক পাশে কাঠের বেদি। তার ওপর বুদ্ধের একটা ছোট

মূর্তি। মূর্তির দু'পাশে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। ভিক্ষুণী বললেন, 'তুমি কে? এই গভীর রাতে কোথা থেকে এসেছ তুমি?'

হিয়াং হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সে অনেক কথা, মা। সব বলব আপনাকে। আপাতত এটুকু বলছি, আমার নাম হিয়াংখুন। একটা সর্পকন্যা তাড়া করেছে আমাকে। আপনি ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচান।

'সর্প কন্যার কবলে কী করে পড়লে?' ভিক্ষুণী প্রশ্ন করলেন।

'পথ হারিয়ে তার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি আমি। সে মেয়ে মানুষের রূপ ধরে ছিল।'

'কিন্তু সে যে সর্পকন্যা বুঝলে কী করে?'

'সে যখন...'

হিয়াংকে শেষ করতে না দিয়েই ভিক্ষুণী বললেন, 'সে যখন সুঁইয়ে সুতা পরানোর সময় সুতোর মাথাটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিল, তখন তুমি তার চেরা জিভটা দেখলে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' আতঙ্কভরা গলায় বলল হিয়াংখুন। 'কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'কী করে জানলাম?' মুখ টিপে হেসে ভিক্ষুণী বেদিটার কাছে গেলেন। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন একটা মোমবাতির আলো।

চিৎকার করে উঠল হিয়াংখুন। সে দেখল, ভিক্ষুণী যখন মোমবাতিতে ফুঁ দিলেন, তখন তাঁর ছুঁচাল আর চেরা জিভটা বাইরে বেরিয়ে পড়ে যেন নাচতে লাগল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল অন্য মোমবাতিটির আলোও। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেবল শোনা যেতে লাগল হিস্...হিস্...শব্দ।

মূলঃ নাকচুয়াং পেক
রূপান্তরঃ মিজানুর রহমান কল্লোল

রাত ঠিক বারোটা!

ট্রেনে করে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি। সঙ্গে রয়েছে আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু ইমরান। দশ বছর পর ইমরানের সাথে দেখা। এই দশ বছর ইমরানের সাথে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। থাকবে কী করে, এইচ.এস.সি পরীক্ষার পরই আমি কানাডায় চলে যাই। কানাডায় বেশ ভালভাবেই সবকিছু গুছিয়ে এনেছিলাম। অর্থ উপার্জনও হচ্ছিল ভাল। আর ইতিমধ্যে দুটি বড়সড় ডিগ্রিও নিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ কয়েকবছর আগে আম্মু খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, আমি দেশে চলে আসি। দেশে এসেই একটা এন.জি.ও-তে লোভনীয় চাকরি পেয়ে যাই। তারপর থেকে বিদেশে যাওয়ার আর ইচ্ছা হয়নি।

ইমরানের সাথে একমাস আগে হঠাৎই কক্সবাজারে দেখা হয়ে গেল। ইমরান এবং ওর স্ত্রী কেয়া কক্সবাজার ঘুরতে এসেছিল। দেশে ফিরে চাকরি করছি তিন বছর হয়ে গেল। এই তিন বছর ইমরানের কথা অনেক ভাবলেও দেখা করার সুযোগ হয়নি। অনেকদিন পর ইমরানের সাথে দেখা হয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ইমরানের অবস্থাও একই। কক্সবাজারে দেখা হওয়ার পর থেকে ইমরান আমাকে ছাড়ছে না। সবসময় আমার সাথে থাকার চেষ্টা করছে। এই যে এখন সিরাজগঞ্জে ওর

নানাবাড়ি যাচ্ছে, সেখানে ও জোর করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। ওর স্ত্রী কেয়া অবশ্য আমাদের সাথে আসেনি। ও ঢাকাতেই আছে।

ইমরান বলল, 'রিয়াজ, কেমন লাগছে ট্রেন ভ্রমণ?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'কতদিন পর একসাথে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি। ভাবতেই ভাল লাগছে।' একটু থেমে ইমরান বলল, 'তোকে আমি সঙ্গে এনেছি একটা কারণে।'

'কী কারণে?'

'সেদিন তোর বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম ফারিয়া ভাবির কথা। ফারিয়া ভাবি নাকি এখন পাবনা মেন্টাল হসপিটালে। কী হয়েছিল, রিয়াজ?'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'সে অনেক বড় কাহিনি।'

'প্লিজ, আমাকে সবকিছু বল। আমি জানতে চাই তোর জীবন সঙ্গী, ভালবাসা ফারিয়া কেন পাগল হয়ে গেল? কেন তোর জীবনটা আজ বিষাদে ঢাকা? আমি সব জানতে চাই।'

ইমরানের পীড়াপীড়িতে আমি বলতে শুরু করলাম, 'দেশে চাকরিটা পাওয়ার পরেই এক শুভদিনে ফারিয়ার সাথে আমার বিয়ে হয়। দুপরিবারের পছন্দেই বিয়েটা সম্পন্ন হয়। প্রেম করার সুযোগ আর ইচ্ছা কোনওটাই আমার হয়নি। তাই মা-বাবার পছন্দকে অগ্রাহ্য করিনি। বিয়ের পর পরই আমি বুঝতে পারলাম জীবনের সবচেয়ে সঠিক কাজটা আমি করেছি। ফারিয়ার সাথে আমার সম্পর্কটা ছিল একদম বন্ধুর মত। ওকে যতই দেখছিলাম ততই মুগ্ধ হতাম। আমার ফিরতে যতই রাত হোক, ও না খেয়ে অপেক্ষা করত। ও আমাকে সিগারেট খেতে দিত না। এই নিয়ে

ওর সাথে আমার অনেক মনোমালিন্য হয়েছে। তবে এই মনোমালিন্যের মধ্যেও আনন্দ লুকিয়ে থাকত। ওর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল ওর চাওয়া কম ছিল। জেদ জিনিসটা যেন ওর অভিধানে ছিল না। ওর জন্য কোনও জিনিস কিনলে ও খুশি হওয়ার বদলে কেমন যেন ভুরু কুঁচকাত। ফারিয়া কখনও চাকরি করতে চাইত না। চেষ্টা করলে ও বেশ ভাল চাকরিই করতে পারত। কোনও এক অদ্ভুত কারণে চাকরির কথা বললেই ও মুখ গোমড়া করে ফেলত। আসলে ওর ধারণা ছিল চাকরি করলেই আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। ও কোনও ভাবেই এটা চায়নি। ফারিয়া আমার খুবই যত্ন নিত। একদিন রাতে আমার জ্বর হলো। ফারিয়া বাসার কাউকে না জানিয়ে সারারাত আমার সেবা যত্ন করল। জ্বরে আমাকে খুবই ভোগায়। কিন্তু ফারিয়ার হাতের স্পর্শে, ভালবাসায়, পরদিনই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ওর দিকে তাকালে আমার মনে হত শুধু ওর দিকে তাকিয়েই আমি জীবন পার করে দিতে পারব।

'ফারিয়াকে দেখতে খুব নরম মনে হলেও সে আসলে খুব শক্ত ছিল। একবার ছুরিতে ওর হাত কেটে যায়। রক্তে পুরো হাত মাখামাখি। ফারিয়া একবারও আহ-উহ করল না। অথচ আমি নিজে খুব ভয় পেয়েছি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর জানতে পারলাম দুটি শিরা কেটে গেছে। ঘটনাটি দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। ফারিয়া খুব সাহসীও ছিল। প্রায়ই গভীর রাতে ও ছাদে চলে যেত। আমি এই নিয়ে ওকে অনেক রাগারাগি করেছি। আমার রাগ দেখে ফারিয়া শুধু হাসত। ওর হাসিও ছিল অপ্সরীর মত। ফারিয়াকে পেয়ে আসলেই আমি খুব সুখী হয়েছিলাম। আমার সুখের মাত্রা আরও বাড়ল বিয়ের এক বছর পর। ফারিয়া মা হতে যাচ্ছে। অদ্ভুত আনন্দে আচ্ছন্ন হলাম

আমি।

'ফারিয়া কিছু ব্যাপারে খুব পাগলাটে ছিল। প্ল্যানচেট করার প্রতি ওর খুব আগ্রহ ছিল। ওর আগ্রহের মূল্য দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা প্ল্যানচেটের চেষ্টা করতাম। আমি গভীর রাতে লাইট নিভিয়ে পদ্মাসনের মত বসতাম। তারপর মনে মনে বলতাম, "হে নিকটতম আত্মা। আমাদের যে কোনও একজনের উপর ভর করো। এসো। এসো। এসো।"

'আসলে পুরো ব্যাপারটা ছিল একটা খেলা। আমরা জানতাম কখনোই এভাবে আত্মা চলে আসতে পারে না।

'একদিন আমি আর ফারিয়া পদ্মাসনের মত বসে প্ল্যানচেটের চেষ্টা করছি। রাত বারোটা। হঠাৎ ফারিয়া সটান হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি বললাম, "ফারিয়া!! ফা-ফারিয়া কী-কী হয়েছে?"

'গম্ভীর ভরাট গলায় কেউ বলল, "ফারিয়া নেই। আমি এসেছি।"

'"তুমি কে?"

'"তুমি যাকে ডেকেছ। নিকটতম আত্মা।"

'"তু-তুমি চলে যাও। চ-চলে যাও।"

'"না। আমি যাব না। আমি থাকব। প্রতিদিন রাত বারোটায় আসব। হা হা হা।"

'আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। মনে হলো ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বা জ্ঞান হারালাম। সকালবেলা সবকিছু স্বাভাবিক। ফারিয়া ঘুম থেকে উঠে চা বানিয়ে আনল, আমি বুঝতে পারলাম রাতের সবকিছুই আমার স্বপ্ন। অফিসে যেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু জোর করে গেলাম। অফিস থেকে ফিরে জানতে পারলাম সকাল থেকে আমাদের কাজের ছেলে

জামশেদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটা পালিয়ে গেছে।

'সেদিন রাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি তাকিয়ে দেখি ফারিয়া আমার পাশে নেই। লাইট জ্বেলে দেখলাম ফারিয়া সটান হয়ে দাঁড়ানো। ওর চোখ দুটো জ্বলছে। বারবার জিভ বের করছে।

'আমি বললাম, "ফারিয়া?!!!"

'"ফারিয়া নেই।"

'"কে তুমি?"

'"তোমার নিকটতম আত্মা।"

'"তুমি চলে যাও। চলে যাও।"

'"না। আমি যাব না।"

'"তোমাকে যেতেই হবে।" ফারিয়া হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল। আমাকে সজোরে লাথি দিল। আমি দেয়ালের উপর ছিটকে পড়লাম। ফারিয়া দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। আমি কোনও মতে উঠে দাঁড়ালাম, তারপরেই বিছানায় পড়ে গেলাম।

'সকালে চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম ফারিয়া আমার পাশে ঘুমাচ্ছে। আমি সকালে নাস্তা না খেয়েই অফিসে চলে গেলাম। অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম আমাকে এক সপ্তাহের জন্য চট্টগ্রাম যেতে হবে। আমাদের কোম্পানি একটা নতুন প্রজেক্ট খুলবে চট্টগ্রামে। সেজন্যই আমাকে যেতে হবে। আমি দুপুরের খাবার খেয়েই চট্টগ্রাম রওনা দিলাম। কিন্তু চট্টগ্রামে গিয়ে বিরাট ফ্যাসাদে পড়লাম। যেদিন চট্টগ্রামে গেলাম, সেদিন থেকে পুরো এক সপ্তায় দশজন মানুষ খুন হলো। প্রতিটি মানুষের বুক, পেট চৌকোনাকার করে কাটা। আমি কাজ শেষ করেই ঢাকায় ফিরে এলাম। ঢাকায় ফিরে ফারিয়াকে দেখে আশ্বস্ত হলাম। আগের

থেকে ও আরও সুন্দর হয়েছে। ওর চোখ-মুখে ছিল সন্তানের প্রতীক্ষা। রাতে ঘুমানোর আগে ফারিয়া এক গ্লাস পানি খায়। আমি সেদিন রাতে ফারিয়ার পানিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। যাতে রাতে ওর ঘুম না ভাঙে। এভাবে টানা দেড় মাস আমি ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যেতে লাগলাম। একসময় হঠাৎ আবার অফিসের কাজে আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হলো। এবার প্রায় দুমাসের সফর। এই দুমাসে চট্টগ্রামে প্রায় আঠারো জন মানুষ খুন হলো। সবারই বুক, পেট চৌকোনাকার কাটা। পুরো চট্টগ্রামে রেড অ্যালার্ট জারি হলো। কোনও সংঘবদ্ধ চক্র কাজটি করছে বলে সবাই ধারণা করল। বাড়িতে বাড়িতে শুরু হলো পুলিশের বিশেষ অভিযান। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মা ফোন করে জানাল, আমার একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। খবরটি শুনে মনে হলো আমার সব দুঃস্বপ্নের অবসান হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে এলাম। আমার মেয়ের নাম রাখলাম অধরা।' আমি ইমরানের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ইমরান, জিশানের কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ। আমাদের স্কুল জীবনের বন্ধু।'

'জিশানের সাথে আমার দেখা হয় ঢাকাতেই। জিশান তখনও বিয়ে করেনি। একটা ছোটখাট ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকত জিশান। একদিন আমি ফারিয়া এবং অধরাকে নিয়ে জিশানের বাসায় যাই। গল্প জমে ওঠে খুব। জিশান অনেক অনুরোধ করল রাতে থেকে যেতে। ছোট বাচ্চা নিয়ে কোথাও থাকা খুব মুশকিল। তবু আমরা জিশানের ফ্ল্যাটে থেকে গেলাম। সেই রাতে পাশের রুমে একটা আর্তচিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি পাশের রুমে গিয়ে দেখি জিশানের বুক, পেট চৌকোনাকারে কাটা। ফারিয়ার সারা শরীরে রক্ত। আর ফারিয়ার মুখে....'

ইমরান বলল, 'কী? কী ছিল?'

'জি-জিশানের ক-কলিজা।'

'ওহ মাই গড! কী বলছিস, রিয়াজ!!!'

'হ্যাঁ। ফারিয়া আমাকে দেখে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। আমিও অধরাকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরুলাম। আমাকে পালাতে হবে। তা না হলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাব। আমি সেইরাতটা অধরাকে নিয়ে ফুটপাতে কাটালাম। সকালে বাসায় গিয়ে দেখি ফারিয়া বাসাতেই রয়েছে। ওকে বা বাসার কাউকে এ বিষয়ে কোনও কথা বললাম না। ফারিয়াকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ওর বাবার বাড়িতে রেখে এলাম। রাতে ঘুমানোর সময় আমার অনেক হিসাব মিলে গেল। চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডগুলো তা হলে ফারিয়াই করেছে। এ ছাড়া ঢাকায়ও কিছু রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড হয়েছে। সেগুলোও হয়তো ফারিয়া করেছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল অধরার কথা। ওকে ফারিয়ার সাথে পাঠিয়ে দেয়া একদম ঠিক হয়নি। সারারাত আমার ঘুম হলো না। সকাল বেলা আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এল অধরাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি পাগলের মত ফারিয়াদের বাড়িতে ছুটে গেলাম। ফারিয়াকে দেখলাম পাগলের প্রলাপ বকছে। ফারিয়া নিজেও হয়তো জানে না ও একটা খুনি। দুপুরের দিকে ফারিয়াদের বাড়ির পাশের ডোবায় অধরার মৃতদেহ পাওয়া যায়। অধরার বুক ও পেট চৌকানাকার ভাবে কাটা ছিল। ফারিয়া তখন পুরোপুরি পাগল হয়ে যায়। ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয় পাবনা মেণ্টাল হসপিটালে। আমি বুকে পাথর বাঁধি। ফারিয়াই যে অধরাকে মেরে ফেলেছে তা আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। কী লাভ! এতে আরও সবাই আমাকে পাগল ভাবত। কেউ এসব বিশ্বাস করত না।'

ইমরান কপালের ঘাম মুছে বলল, 'কেউ বিশ্বাস না করলেও

আমি তোর সব কথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু একটা হিসাব মিলছে না।'

'কী হিসাব?'

'ভাবি, চট্টগ্রাম গিয়ে মানুষ খুন করেছে। আশ্চর্য।'

'হ্যাঁ। আত্মাটার হয়তো অনেক ক্ষমতা ছিল।'

'আবার এমনও হতে পারে, চট্টগ্রামেও কোনও মানুষের উপর এরকম একটা খারাপ আত্মা ভর করেছিল।'

'হতে পারে।'

'আচ্ছা, রিয়াজ, ভাবি তো মেণ্টাল হসপিটাল থেকেও পালাতে পারে বা ওইখানেই মানুষ মারতে পারে।'

'আমার মনে হয় আত্মাটা ওকে ছেড়ে চলে গেছে।'

'কী করে নিশ্চিত হলি?'

'স্রেফ অনুমান। এত খুন করার পরও কি ওর সাধ মেটেনি?'

সিরাজগঞ্জ পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল। ইমরানের নানী বেঁচে নেই। তবে নানা বেঁচে আছেন। নানার বিশাল বাড়ি। নানার দেখাশুনা করেন ইমরানের ছোট খালা। খালা বিধবা, তাঁর একটা ছোট মেয়ে রয়েছে। নাম লিপি। ইমরানের নানা আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। পুরো বাড়িটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখালেন। রাতে প্রচুর খাবারের আয়োজন করলেন। আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম। তাই রাতে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা ইমরান আমাকে ডেকে তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রিয়াজ, বাইরে যেতে হবে।'

'কেন?'

'লিপিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কী বলছিস?'

'সমস্ত বাড়ি, পাড়া, মহল্লায় খোঁজা হয়ে গেছে। কোথাও লিপি

নেই। খালা খুব কান্নাকাটি করছেন।'

আমরা সারাদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। লিপিকে পাওয়া গেল না। সারা শহরে মাইকিং-এর ব্যবস্থা করা হলো। স্থানীয় পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো।

দুদিন পর আমি আর ইমরান ঢাকা এসে পৌঁছালাম। ইমরানের চোখে বারবার পানি দেখতে পাচ্ছি। কারণ লিপিকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এই খালাত বোনটাকে ইমরান খুব ভালবাসত। আমি ইমরানের কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, 'ইমরান, এত ভেঙে পড়িস না। আজ আর তোর বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই। আম্মু-আব্বু গ্রামে গেছেন। আমি বাড়িতে একা। আমার সাথে থেকে যা।'

ইমরান রাজি হলো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। আমি ঘরের তালা খুললাম। এরপর দুজনে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। বাইরে থেকে বিরিয়ানী এনেছিলাম। রাতে দু বন্ধু বিরিয়ানী খেলাম। আমাদের শুয়ে পড়তে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল।

আমি বললাম, 'ইমরান, আমি তোকে আরও কিছু কথা বলতে চাই।'

'বল।'

'ভয় পাবি না তো?'

'মানে?'

'তোকে আমি সিরাজগঞ্জে যাওয়ার সময় যে ঘটনা বলেছি সব মিথ্যা। আসলে আত্মাটা ফারিয়ার উপর ভর করেনি, ভর করেছিল আমার উপর। ঢাকা, চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডগুলো আমিই ঘটিয়েছি। জিশানকেও আমি মেরেছি। আমি ফারিয়াকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতাম যাতে ও আমার কোনও কাজের সাক্ষী না থাকে। তবু

জিশানকে মারার দৃশ্যটা ও দেখে ফেলে। ফারিয়া বুঝতে পারে ওর এবং অধরার জীবনও নিরাপদ নয়। তখন ও অধরাকে নিয়ে ওর বাবার বাড়িতে চলে যায় কিন্তু অধরা আমার হাত থেকে নিস্তার পায়নি। অধরাকে খুন করার পর ফারিয়া সবাইকে বলতে থাকে আমার কুকীর্তির কথা। তখন আমি চালাকি করে ফারিয়াকে পাগল সাজিয়ে পাবনা মেণ্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেই। তবে বর্তমানে আমি খুব বুঝে শুনে কাজ করি। লাশ এমন ভাবে লুকিয়ে ফেলি, যাতে কেউ সহজে তা না পায়। আত্মাটার সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব। আত্মাটা প্রতিদিন রাত বারোটায় আমার উপর ভর করে এবং সকালের আলো ফোটার আগেই চলে যায়। আমার প্রথম শিকার হচ্ছে কাজের ছেলে জামশেদ এবং আপাতত আমার সর্বশেষ শিকার লিপি। ওর লাশটা আমি তোদের নানাবাড়ির পিছনের পুকুরে ফেলে দিয়েছি। হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

আমি ইমরানের দিকে তাকালাম। ইমরান কাঁপছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওর হাত পা শীতল হয়ে গেছে। ইমরান শুধু বলল, 'আ-আমি এ-এখন যাব।'

আমি জিভ বের করে হেসে বললাম। 'বাচ্চা ছেলের মত কথা বলছিস কেন, ইমরান? তুই যেতে পারবি না। দেখছিস না রাত বারোটা বাজতে আর ত্রিশ সেকেণ্ড বাকি। হাহ্-হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

রিয়াজুল আলম শাওন

ঘুমবাড়ি

পূর্ব কথন

জগতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রচলিত বিজ্ঞানে এসব ঘটনাকে ব্যাখ্যাতীত আখ্যা দিয়ে ভুলে যাওয়া হয়। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ, জীবনে একাধিকবার অমন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞান। বেচারা মানুষগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছেন 'পাগল' নামে। আমি একজন সামান্য লেখক। নিজের অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা, কোনটাই আমার নেই। অভিজ্ঞতাটাকে স্রেফ একটা গল্প হিসেবে নিলেই বোধহয় ভাল হয়, একটা ভৌতিক গল্প। গত বিশটি বছর ধরে এই গল্প আমি চাপা রেখেছি আমার হৃদয়ে। সেই অদ্ভুত ঘটনার পর ওরা আমাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেয় 'সাইকো' আখ্যা দিয়ে। প্রথম প্রথম ডাক্তারদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তাঁরা নির্বিকার বদনে শুনে গিয়েছেন। তখন আমার মনে হয়েছে যা করেছি সব পণ্ডশ্রম। আক্রোশে চিৎকার করেছি। ডাক্তার মহাশয় আর ওয়ার্ডেনরা আমাকে তখন ইলেকট্রিক শক্ দিয়েছেন ইচ্ছেমতন। বিশ বছর পর 'স্বাভাবিক' সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে এসেছি স্যানাটোরিয়াম থেকে।

গল্পের খাতিরে এখানে আমি কোন সময়, স্থান কিংবা কোন

চরিত্রের আসল পরিচয় উল্লেখ করিনি। পাছে ওরা আমাকে ফের পাগলাগারদে পুরে দেয়। আজ আমি মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়টা একটু স্বাধীনভাবে কাটাতে চাই। এ গল্প রইল আগামী প্রজন্মের জন্য। ওরাই উদ্ধার করুক অজানা বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য।

এক

বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে একদম পোড়োবাড়ির মত। দোতলা পুরানো ধরনের প্রাসাদ। বাইরের দেয়ালে শ্যাওলা জমে আসল রঙ হারিয়ে গিয়েছে। ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে আছে আগাছার ঝাড়। শহরের এ মাথায় জনবসতি নেই বললেই চলে। আসলে এই জায়গাটা কোন কালেই শহরের অংশ ছিল না। অস্থায়ী একটা বসতি ছিল মাত্র। বাড়িটা থেকে দুশো গজ দূরত্বে পরিত্যক্ত কয়লার খনি। যতদিন খনিটা ফলবতী ছিল, এখানে জনবসতিও ছিল। উত্তোলন তলানিতে এসে ঠেকলে যে যার মত ফিরতি পথ ধরেছিল। এখন আছে দু'চার ঘর বস্তি। পঙ্গু আর অক্ষম শ্রমিক কিংবা ভিক্ষুকের বাস ওই জীর্ণ কুঁড়েগুলোয়। কয়লা উত্তোলনকারী শ্রমিকদের তৈরি একটা কাঁচা ইঁটের পথ গিয়ে মিশেছে শহুরে রাস্তায়। পাহাড়ী রাস্তাটা বাঁক নিয়ে উঠে গেছে আরও উপরে। এখান থেকে মূল শহরটা আবছাভাবে চোখে পড়ে।

আমি বাড়িটার দিকে নজর ফেরালাম। চারপাশে জলপাই গাছের ঘন জঙ্গল। মাঝে ভুতুড়ে চেহারার এই বাড়ি। বাইরের

চেহারা দেখে ভিতরে ঢোকার সাহস করতে পারলাম না। পেছনে মট্ করে শুকনো ডাল ভাঙল একটা। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। তেলতেলে চেহারার মোটাসোটা বৃদ্ধ বাড়ির মালিককে দেখে স্বস্তির হাঁফ ছাড়লাম। উনি কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ি পছন্দ হয়েছে?' আমি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললাম, 'ছেলেমেয়েরা পছন্দ করবে না। বাড়ির অবস্থা তো নড়বড়ে। যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে।'

'বাইরের চেহারা দেখে তা মনে হলেও ভেতরটা কিন্তু অন্যরকম, বেশ জমকালো।'

'চলুন তবে ভেতরে যাওয়া যাক।' গম্ভীরভাবে বললাম আমি। 'বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন কবে?'

'বাড়িটা আমি তৈরি করাইনি,' কিছুটা নিরাসক্ত কণ্ঠে জানালেন বৃদ্ধ, 'আমার বাবা কিনে নিয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ মাইন অফিসারের কাছ থেকে। সেও প্রায় সত্তর বছর আগের কথা।'

'তারমানে বাড়িটার বয়স প্রায় একশো'র কাছাকাছি,' ঠিক প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করলাম মাত্র।

'উঁহুঁ, কাছাকাছি নয়। একশো থেকে একটু বেশি এর বয়স। কয়লাখনিটা আবিষ্কারের বছরখানেক পর এর মালিক তৈরি করিয়েছিলেন। সে আমলে প্রায় রাজপ্রাসাদের মত ছিল বাড়িটা। আমাদের আধুনিক ঘর-বাড়ির মত সেলার, অ্যাটাচ্ড বাথ, পানির হাউজ, এমনকী একটা বায়ুচালিত পানি তোলার পাম্পও রয়েছে।'

বাড়িটার প্রবেশদ্বারে লাগানো মান্ধাতার আমলের বিশাল তালাটি খুললেন ভদ্রলোক। বিশাল একটা বারান্দা পেরিয়ে মস্ত হলরুমে ঢুকলাম আমরা। সত্যিই জমকালো! বার্নিশ করা চকচকে মেঝে, আবলুস কাঠের তৈরি দানবীয় ফার্নিচার, ছাদ থেকে ঝুলে থাকা বিশাল ঝাড়বাতি, সে এক এলাহী কারবার। হলরুমের

উত্তর কোণ থেকে, একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। এ ছাড়া পূর্ব আর পশ্চিম দিকে দু'টো করিডোর দেখা যাচ্ছে। মালিক ভদ্রলোক অনুষ্ঠানের উপস্থাপকদের মত দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই আমার রাজত্ব। পূর্ব দিকে করিডোর ধরে গেলে কিচেন, ডাইনিং হল, গেস্টরুম, বাথরুম, টয়লেট এসব পাবেন। পশ্চিম দিকেরটা দিয়ে পাবেন রংমহল, স্টাডি, সেলার ইত্যাদি।'

'রংমহল?'

'শ্বেতাঙ্গ বাবুদের হেরেমখানা আর কী!' বিষাদ মাখা কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক। 'খনিশ্রমিকদের অনেকের স্ত্রী-কন্যাদের লুণ্ঠিত ইজ্জতের কয়েদখানা।'

'আপনি বোধহয় এসবের বিরুদ্ধে?' বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি হেনে বললাম।

ভদ্রলোক উত্তরটা এড়িয়ে দোতলার বর্ণনা দেওয়া শুরু করলেন, 'তিনটে বেডরুম, সবগুলোতে অ্যাটাচড্ বাথ, বাইরের দিকে একটা ড্রইং আর কোনার দিকটায় লিভিংরুম। প্রায় সবগুলো ফার্নিচার অক্ষত পাবেন। তবে বদলাতে চাইলেও বাধা নেই। সেক্ষেত্রে আমি ওগুলো আলাদা নিলাম করব।'

'না, না, ফার্নিচারগুলো আমিই রাখতে চাই,' তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'চলুন, পশ্চিম করিডোরের রুমগুলো দেখা যাক।'

'অবশ্যই, তবে শুধু স্টাডিরুমটা দেখতে পারবেন। অন্য দু'টো রুমের চাবি আনতে ভুলে গিয়েছি।' অদ্ভুত সুরে কৈফিয়ত দিলেন বাড়িওয়ালা। আমি অবশ্য ততটা আমল দিলাম না। কেননা স্টাডিরুমটা দেখাই আমার প্রয়োজন। অন্যগুলো পরে দেখলেও চলবে। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করলাম, 'বাড়িটা তো বেশ। হঠাৎ বিক্রি করতে চাইছেন কেন?'

'আমটা খান, আঁটি চুষতে যাচ্ছেন কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বাড়িওয়ালা।

আমি কিছুটা থতমত খেয়ে গেলাম, 'না, মানে ইয়ে...এমনি কৌতূহল থেকে জানতে চাচ্ছিলাম। অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি বলে দুঃখিত।'

'আমার হঠাৎ বেশ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে,' একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। যদিও আমি একটুও বিশ্বাস করলাম না কথাটা। তাই খুঁত খুঁজতে শুরু করলাম। বৃদ্ধ অমন ব্যবহার না করলে হয়তো এটা করতাম না। খুঁত অবশ্য মিলেও গেল। যদিও সেটা খুঁত কী না জানি না। রংমহলের দরজায় আলাদা রকমের একটা তালা ঝোলানো। তাতে হিজিবিজি অক্ষরে কী সব লেখা। মনে পড়ল বৃদ্ধের অজুহাত–'চাবি আনতে ভুলে গিয়েছি'। কেমন যেন সন্দেহ হলো। সেলারের দরজাতেও দেখলাম একইরকম একটা তালা ঝুলছে।

'এই তালা দু'টো মনে হচ্ছে ব্যতিক্রম।'

বৃদ্ধ যেন একটু থমকালেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'ও হ্যাঁ, ওগুলো বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানানো। ভেতরের আসবাবগুলো বেশি দামী কীনা।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এবারও তাঁর কথা বিশ্বাস হলো না। তবে কথা বাড়ালাম না। পরে রহস্য উদ্ধার করা যাবে। স্টাডিরুমের দরজা খুলে দেখলাম। লাইব্রেরিটা দেখে চোখ কপালে উঠে গেল। আট-দশটা দানবীয় আলমিরা জুড়ে রাশি রাশি বই সাজানো। শুধু এজন্যই বাড়িটা পছন্দ হয়ে গেল।

'বেশ!' আনন্দিত কণ্ঠে বললাম, 'এবার দোতলাটা ঘুরে দেখা যাক।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন। সেই ভাল।' বৃদ্ধ অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

দোতলার প্রতিটা রুম খুঁটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ করলাম। বেডরুমগুলো বেশ মানসম্মত। মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত জানালা। দু'টো বেডরুমে কোন খাট নেই, তবে তৃতীয়টায় একটা বিশাল পালঙ্ক দেখতে পেলাম। মেঝে থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে পালঙ্কের কিনারা। সম্ভবত এগুলোকেই ময়ূর পালঙ্ক বলে। সব দেখেশুনে বাড়িটা ভালই মনে হলো। নীচে নামতে নামতে বাড়িওয়ালাকে বললাম, 'বাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। তবে বাইরের চেহারাটা খুব খারাপ। আর শহর থেকেও বেশ দূরে, যাতায়াতে খুব অসুবিধা হবে। আপনি দামটা একটু বিবেচনা করে বলবেন।'

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি ন্যায্য দামই চাইব।' ভদ্রলোক দাম উচ্চারণ করলেন। শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। দাম খুব একটা বেশি হবে না সে আশাই করেছিলাম। কিন্তু তাই বলে এত কম! এ যে জলের দামে কেনা হয়ে গেল। ভদ্রলোক মত বদলানোর আগেই কথা পাকা করে ফেললাম। ফেরার পথে সারাটা রাস্তা মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে এলাম।

দুই

ছোট ছেলে রিশাদ বাড়িটা দেখে কতক্ষণ হাঁ হয়ে রইল। তারপর আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ড্যাড্, আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে বাড়িটা এমন ফাটাফাটি হবে!' ও ছুটে বেড়াতে লাগল বাড়িটা ঘিরে। আমি বড় মেয়ে

রুমানার দিকে তাকালাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। ও স্মিত হেসে বলল, 'বাড়িটা যতটা ভেবেছিলাম ততটা খারাপ নয়। সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশটা অনেক সুন্দর, নিরিবিলি।'

'হ্যাঁ, তোর লেখালেখির অনেক সুবিধা হবে।'

'হুঁ, তবে মা বোধহয় বাড়িটা পছন্দ করেনি। দেখ না, কেমন কপাল কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে।' আমি রোজিনার দিকে তাকালাম। ও সত্যিই কপাল কুঁচকে বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করছে। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'বাড়িটা ভাল লাগেনি, তাই না?'

ও একটু হাসল, 'তা নয়, তবে একটু বেশি নীরব। আশপাশে কেউ নেই। রাতের বেলা বেশ ভয় ভয় করবে।'

'একুশ শতকের এই সময়েও তুমি ভূত বিশ্বাস কর? হাসালে দেখছি।'

'আরে নাহ্, ভূতের কথা কে বলল? চোর-ডাকাতের ভয় আছে না! আর চারপাশে কত জঙ্গল। বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ আর হিংস্র প্রাণী থাকাও বিচিত্র নয়।'

'তা ঠিক। তবে বিভাগীয় শহরের পাশের জেলায় এত কম দামে এর চেয়ে ভাল বাড়ি আর হয় না। দু'চার বছর কষ্ট কর। শহর বাড়লে তখন অনেক সুবিধা পাবে। শুনেছি এদিকে নতুন করে মাইন খোঁজা হচ্ছে।'

'বেশ তো, চল কালই উঠে পড়ি। বাড়িটা সাজাতে হবে। অনেক ঝুট-ঝামেলা। হাতে ছুটিটা থাকতে থাকতে সব সেরে ফেলি।'

'হুঁ, সেই ভাল। চল এখন ফিরে যাই।' রিশাদকে ডাকলাম আমি ফিরে যাওয়ার জন্য। ও আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য গাঁইগুঁই শুরু করল। কিন্তু রোজিনার ধমক খেয়ে সুড়সুড় করে গাড়িতে গিয়ে উঠল। কাঁচা ইঁটের রাস্তায় গাড়িটা পড়তেই মনে

পড়ল গেটে তালা লাগানো হয়নি। রোজিনা বলল, 'বেশিদূর তো আসিনি, গাড়ি ব্যাক করার প্রয়োজন নেই। তুমি নেমে গিয়ে তালাটা দিয়ে এসো।' আমিও তাই ভাবছিলাম। বাড়িতে ঢোকার পথটা যে বিশ্রী আর এবড়ো-খেবড়ো, সন্ধ্যার এমন আধো আলোতে গাড়ি ব্যাকে নিলে শেষে আরেক ঝামেলায় পড়তে হত। বলা তো যায় না, যদি টায়ার ফেঁসে যায়। গাড়িটা ফোরহুইল ড্রাইভও নয়। অতএব ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে বাড়িটার দিকে হাঁটা ধরলাম। বাড়ির বাউণ্ডারিতে ঢুকতে হলে প্রথমে একটা লোহার ভাঙাচোরা গেট পেরোতে হয়। বের হয়ে আসার সময় গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। এখন ঢোকার জন্য ফের গেটটা খুলতে হলো। প্রবল ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল ওটা। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। জলপাইগাছগুলো থেকে দু'একটা বাদুড় ডানা ঝাপটাচ্ছে। এখন ওদের দিন শুরু হবে। রোজিনা ঠিকই বলেছিল। রাতের বেলা অনেক ভয় করবে। আবছা আলো থাকা সত্ত্বেও আমার গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। তাড়াহুড়ো করে উঠানটা পেরিয়ে গেলাম। তালাটা দরজায় ঝুলছিল। বেশ শক্তি লাগল ওটা লাগাতে। ফিরব এমন সময় কাঁধে কেউ হাত রাখল। বরফ শীতল শীর্ণ একটা হাত। আমার হৃৎপিণ্ড বিট মিস্ করল একটা।

ঘুরে দাঁড়াতে চাইলাম। কিন্তু পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গিয়েছে। কাঁধে হাতের চাপ বাড়তে লাগল। অস্তিত্বের গভীর থেকে নড়ে উঠতে চাইলাম। অবশেষে শরীর সাড়া দিল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখ পড়ল একজোড়া সবুজাভ চোখে। কুঁচকানো চামড়ার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া ভয়াল দু'টি চোখ। এগুলোকেই সম্ভবত 'ক্যাটস আই' বলে। বিড়ালের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে

অন্ধকারে। সাহস জড় করে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, 'কে তুমি?' চোখের মালিক কোন কথা বলল না। মুখটা বিকৃতভাবে বেঁকে গেল তার। যেন কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না। এমন সময় মেইন গেটে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনলাম। একটা মেয়ের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বাবা! বাবা! তুমি কি এখানে?'

আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিলাম। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল রুমানা এসেছে আমাকে খুঁজতে। কিন্তু দেখলাম ও নয়, একটা পাহাড়ি মেয়ে। গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো সারং-এর মত একটা পোশাক। অন্যান্য সাধারণ পাহাড়িদের তুলনায় মেয়েটা যথেষ্ট লম্বা, এবং অনাবশ্যক ভাবে সুন্দরীও। ভয়াল চোখের মালিক মধ্যবয়সী লোকটা বোধকরি ওর বাবা। নিজের বাবার সাথে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটা একটু চমকে উঠল। আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। মেয়েটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে এল, 'তুমি কে, সাহেব?'

'আমি এ বাড়ির নতুন মালিক। তুমি কে?'

মেয়েটি যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায়নি। বিড় বিড় করে বলল, 'কী ভয়ানক! "ঘুমবাড়ি" কিনে ফেলেছ?'

'এতে ভয়ানকের কী হলো?'

কিন্তু আর বলল না মেয়েটা, এড়িয়ে গেল, 'এত রাতে এখানে কী করছ তুমি, সাহেব?'

'তালা লাগাতে এসেছিলাম,' লোকটার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার বাবা বুঝি?'

'হুঁ, বোবা, কথা বলতে পারে না। তোমাকে ভয় দেখায়নি তো?'

'না, তা নয়। তবে এই ভরসন্ধ্যায় এখানে কাউকে আশা

করিনি।'

'বাবার মাথা ঠিক নেই। পায়ে শিকল দিয়ে রাখি। তবুও মাঝে মাঝে কীভাবে যেন ছুটে যায়, এখানে এসে বসে থাকে।'

'কেন?'

'সে অনেক কথা, সাহেব। তোমার শুনে কাজ নেই। চল, বাবা।'

'তোমার নামটা তো বললে না।'

চলে যাচ্ছিল মেয়েটা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। আমার কথায় থমকে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, 'আমার নাম মহুয়া। লেবার বস্তিতে থাকি।'

'তুমি খুব সুন্দর করে কথা বল, মহুয়া। অন্য পাহাড়িদের মত নও তুমি।'

'আমার দাদা শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। আমিও পড়াশোনা করছি। মনটা বাদে আমার বাকি সবটাই পাহাড়ি।'

'আমরা কিছুদিন পরেই এ বাড়িটাতে এসে উঠছি। তোমার বয়সী আমার একটা মেয়ে আছে, মহুয়া। ওর নাম রুমানা। তুমি মাঝে মাঝে এলে ও খুব খুশি হবে। আসবে তুমি?'

মেয়েটা কয়েক মুহূর্ত আমার চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'চলে যেতে যেতে একটা কথা বলি, সাহেব। জানের মায়া থাকলে এ বাড়িতে আর এসো না। পাহাড়ি না হলেও তুমি খুব ভাল। তাই বলতে না চাইলেও কথাটা বললাম। বাকিটা জানতে চেয়ো না। শুধু জেনে রাখো, এতে তোমার লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। চলি, সাহেব।' আমার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে লোকটাকে নিয়ে চলে গেল মহুয়া নামের পাহাড়ি মেয়েটা।

বেশ কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। পাশের ঝোপ থেকে

ভেসে এল তক্ষকের ডাক। বাড়ির ভিতরে কোথাও দড়াম করে শব্দ হলো। যেন কিছু একটা আছড়ে পড়ল কাঠের দরজায়। মনের অজান্তেই কেঁপে উঠলাম। চারদিক পুরো অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। আমি দ্রুত পা বাড়ালাম মেইনগেটের দিকে। লোহার বিশাল গেটটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। মহুয়া আর ওর বাবাকে কোথাও দেখা গেল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। বাইরে পা বাড়িয়েছি মাত্র, কোত্থেকে দমকা হাওয়া এসে আমাকে দু'পা পিছিয়ে দিল। ঠিক সেই সময় বাড়িটা থেকে গম্ভীর একটা শব্দ ভেসে এল। অনেকটা হিন্দুদের 'ওঁম্' শব্দের মত। আমার পুরো শরীরে ঝিম্ ধরে গেল। পড়েই যাচ্ছিলাম, লোহার গেট ধরে পতনটা কোনমতে ঠেকালাম। মনে হলো শরীরের শক্তি কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করছে বসে একটু জিরিয়ে নিই। ওদিকে ওঁম শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দমকা হাওয়ায় জলপাই গাছগুলো পাগলের মত দুলছে। অজানা আশঙ্কায় মনটা কেঁদে উঠল।

গাড়ির হর্নের ক্ষীণ শব্দ এল কানে। চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, 'রুমানা! মা গো! আমি যে ফিরতে পারছি না!' কিন্তু গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বের হলো না। ধীরে ধীরে শরীর আরও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। আচমকা তীব্র আলো এসে পড়ল চোখে। তন্দ্রা টুটে গেল আমার। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম বাতাস কমে এসেছে। গম্ভীর শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না। দেখলাম আমাদের গাড়িটা এবড়ো-খেবড়ো মাটির রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আমি এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে ব্রেক কষে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল রোজিনা, 'কী ব্যাপার? আধঘণ্টা হয়ে গিয়েছে

তুমি এসেছ, কী করছিলে এতক্ষণ? ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যাচ্ছে।'

আমি কোন কথা না বলে রোজিনার পাশের সিটে গিয়ে বসলাম। ওকে ইশারায় ড্রাইভিং করতে বললাম। গাড়ি কাঁচা ইঁটের রাস্তা পার হয়ে মেইনরোডে উঠে এল। রোজিনা স্পিড বাড়িয়ে দিল। সাইড উইণ্ডোর কাঁচ নামিয়ে দিলাম আমি। পাহাড়ি ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে এল। বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির করে। এখন পুরো ব্যাপারটা মনে পড়তেই হাসি পেল আমার। বোঝাই যাচ্ছে মহুয়ার রহস্যজনক কথা আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমার নার্ভে বিশেষ চাপ ফেলেছিল। তাই সাময়িক দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

তবুও কোথায় যেন ক্ষীণ একটা সন্দেহ রয়েই গেল।

তিন

ব্যাপারটা শুরু হলো রিশাদকে দিয়ে।

বাড়িতে ওঠার সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা সেটা। বাড়িটা কিনেছিলাম বর্ষার শুরুতে। সংস্কার করে, রং-টং লাগিয়ে, বাসযোগ্য করতে করতে মাসখানেক পার হয়ে গেল। লোহার মেইনগেটটা ঠিক করাতে হলো। খনিশ্রমিকদের বলে বাড়ির সামনের রাস্তাটায়ও কাঁচা ইঁট বসিয়ে নিলাম। মহুয়া নামের মেয়েটা বেশ সাহায্য করল লোকবল দিয়ে। বোঝা গেল বস্তির মানুষজনের উপর ওর বেশ প্রভাব রয়েছে। রাস্তা তৈরির প্রস্তাব নিয়ে বস্তিতে যাওয়ার দিনই ওর সাথে দ্বিতীয়বার দেখা। আমাকে

দেখে বলল, 'সাহেব, আবার ফিরে এলে? আমার কথা বিশ্বাস হয়নি বুঝি?' বুঝলাম মেয়েটা আমাকে ফের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। তাই একটু কর্কশ কণ্ঠেই বললাম, 'দেখো, মহুয়া, আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। বাড়িটা নতুন কিনেছি। আমার পুরো পরিবার বাড়িটা খুব পছন্দ করেছে। আমরা ওখানে উঠবই। যদি পার তো এখন একটু সাহায্য কর।' এরপর মহুয়া আর সে বিষয়ে কথা বলল না। নিজের লোকদের বলে কাঁচা ইঁটের একটা রাস্তা তৈরি করে দিল। ওকে দাওয়াত করেছিলাম বাড়িতে। ভেবেছিলাম রুমানা একজন সঙ্গী পাবে। কিন্তু মেয়েটা সাফ অস্বীকার করে বলল, 'আমি তোমার মেয়ের বন্ধু হতে চাই না। আপনজনের বিচ্ছেদ সহ্য করার ক্ষমতা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে।' এরপর আর মহুয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়নি।

বাড়িতে ওঠার পরপরই লক্ষ করলাম, কেনার সময় একটা জিনিস খেয়াল করিনি। এ বাড়িতে কোন গ্যারেজ নেই। আমার ছোট্ট গাড়িটা নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়লাম। কোথায় রাখি? রোজিনাকে বলতেই সমস্যার সমাধান করে দিল। বলল, 'লোক ডেকে একটা ঢালু পাড়ওয়ালা গর্ত করো সেলারের পাশে। তারপর সেলারের একদিকের দেয়াল ভেঙে পাড়সহ সেলারের মেঝেটা সিমেণ্ট দিয়ে ঢালাই করে দাও। হয়ে গেল আমাদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজ!' মনে মনে ওর বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। শ্রমিক জোগাড় করা হলো। কিন্তু মূল জায়গায় গিয়ে বাধল এক ফ্যাসাদ। বাড়ি মালিকের গছিয়ে দেওয়া চাবির রিংটাতে সেলারের তালা খোলার কোন চাবি পেলাম না। কেমন যেন সন্দেহ হলো। রংমহলের তালাটা খোলার চেষ্টা করলাম। যা ভেবেছি তাই! বুড়ো এ তালাটারও কোন চাবি দেয়নি। এখন সেলারের দেয়াল ঠিক কোন্

জায়গাটায় শেষ হয়েছে তা না জেনে কীভাবে কাজ শুরু করি? তালা ভাঙাও এক বিশাল ঝামেলা। দেখতে মান্ধাতার আমলের হলে কী হবে, হাতুড়ির বাড়ি পড়তে বোঝা গেল ওই তালা কত শক্ত! অগত্যা বাড়িওয়ালার বাসায় যেতে হলো। ওখানে গিয়ে দেখি পাখি হাওয়া। শহরের বাড়িটাও বিক্রি করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছে লোকটা। পাড়া-প্রতিবেশীরা কিছু বলতে পারল না। অবশেষে মিস্ত্রী ডাকিয়ে হাইড্রোজেন শিখার সাহায্যে তালার হুক গলিয়ে ফেলতে হলো।

সময়টা ছিল পড়ন্ত বিকেল। মিস্ত্রীটা কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে। আমি সেলারের দরজা খুললাম। যথেষ্ট শক্তি খরচ হলো খুলতে। ভিতরের আবহাওয়াটা ভেজা ভেজা, আর কেমন যেন ভাপসা একটা গন্ধ। মাথাটা ঘুরে উঠল। মুখের ভিতরটা কেমন টক-টক লাগছে। বহু কষ্টে বমি-বমি ভাবটা দমন করলাম। ভাবলাম বহু পুরানো ঘর, বদ্ধ পরিবেশ, তাই হয়তো এমন হচ্ছে। এ কারণে দরজাটা খোলা রেখেই করিডোরে ফিরে এলাম। দ্বিতীয়বার একই অনুভূতির ভয়ে রংমহলের দরজাটা খুললাম না। সেদিন রাতে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল পাহাড়ি এলাকাটায়। মট-মট শব্দে অসংখ্য জলপাই ডাল ভেঙে পড়ল বাড়ির আশপাশে। মোটকথা পুরো বাড়িটা ঘিরে নরক গুলজার হয়ে গেল। এসব কারণে ঘুম হলো না খুব একটা। উঠতেও দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে শ্রমিকরা এসে হাজির।

করিডোর ধরে সেলারের দিকে যাচ্ছি, দেখি রংমহলের দরজাটা হাট্ করে খোলা। কে খুলল? সবাই তো ঘুমিয়ে। সাবধানে উঁকি দিলাম ভিতরে। বিশাল একটা কামরা। ছাদ থেকে ঝুলছে তেমনি

বিশাল একটা ঝাড়বাতি। মেঝে ঝকঝকে তকতকে হয়ে আছে। বোঝাই যায় না, এ ঘর এতদিন অব্যবহৃত ছিল। বুড়ো বাড়িমালিক বলেছিল, ঘরে অনেক দামী দামী আসবাবপত্র রয়েছে। কই? আমি তো তেমন কিছুই দেখছি না। শুধু একপাশে কতগুলো গদি পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। কালো কাপড়ে ঢাকা। মালিক তো মহাধড়িবাজ! আমি পুরো কামরাটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। আচমকা চোখ আটকে গেল গদিগুলোর পিছনে। গুটি পাকিয়ে কে যেন শুয়ে আছে ওখানে! আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পাশেই একটা পুরানো তক্তা নজরে পড়ল। তক্তাখানা রাইফেলের মত বাগিয়ে মৃদু পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম। যত কাছে যাচ্ছি তত অবাক হচ্ছি। দেহাবয়বটা একদম শিশুদের মত। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কাপড়টা সরালাম। আরি! এ যে রিশাদ! ঝাঁকি দিয়ে ওর ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাঙল না। বরঞ্চ আমাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরল ও। পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম ওকে। মনে মনে রোজিনার উপর রেগে গেলাম। বাচ্চাদের দেখে রাখতে পারে না, এ কেমন মা?

পরের চারটি ঘণ্টা রিশাদ মড়ার মত ঘুমাল। রোজিনা বহু চেষ্টা করেও ওর ঘুম ভাঙাতে পারল না। যখন ঘুম ভাঙল তখন রিশাদ অন্য মানুষ। কোন কথা বলছে না। প্রশ্ন করলে শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেন কী বলা হচ্ছে বুঝতে পারছে না। সেই ছোটাছুটি, হুটোপুটি, কোনটাই নেই। রোজিনা চিরকাল এমন শান্তশিষ্ট রিশাদের স্বপ্নই দেখেছে, অথচ আজ ও-ই বিচলিত হয়ে উঠল এই অবস্থা দেখে। বাচ্চাদের কখনও ও চা খেতে দেয় না। আর আজ নিজ হাতে কড়া চা বানিয়ে খাওয়াল রিশাদকে। রোজিনার হাতে সব তথ্য বের করার ভার দিয়ে আমি নীচে নেমে

এলাম। শ্রমিকরা একনাগাড়ে কাজ করে চলেছে। আমি সেলারে ঢুকলাম গজফিতা হাতে। বাজে গন্ধটা তখনও বাতাস ভারী করে আছে। কোনমতে কাজ শেষ করে বের হয়ে এলাম। দেখি রোজিনা দাঁড়িয়ে আছে রংমহলের দরজায়। কপালটা কোঁচকানো। আমার পায়ের শব্দে ওর সংবিৎ ফিরল–

'ও অদ্ভুত সব কথা বলছে,' রোজিনার কণ্ঠস্বর কেমন কাঁপা কাঁপা মনে হলো।

'কে, রিশাদ? কী বলছে?'

'বলছে একদল পরী ওকে ঘুম পাড়িয়েছে। তার আগে ওর সাথে নেচেছে, গান শুনিয়েছে।'

'তুমি বিশ্বাস করেছ ওসব!'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। ও অস্বাভাবিক আচরণ করছে এটাই মূল ব্যাপার।'

'এখানে কী মনে করে এসেছ?'

'ব্যাপারটা যাচাই করতে এসেছি। এবং বোধকরি উত্তরটা পেয়েও গিয়েছি।'

'কী ?'

'গ্যাস। বদ্ধ ঘরে আটকে থাকা বিষাক্ত গ্যাস। খুব সম্ভব কার্বন মনোক্সাইড।'

'কী করে বুঝলে?'

'ভুলে যাচ্ছ, আমি কেমিস্ট্রির প্রফেসর।'

'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বললে ভাল হত।'

'আমি নিজেও তো ঠিক মত বুঝতে পারছি না। পুরানো ঘরে বিষাক্ত গ্যাস জমে, এটা ঠিক। তবে কার্বন মনোক্সাইড নয়। আবার এটাও নিশ্চিত, আমি যে গন্ধ পেয়েছি তা অন্য কোন গ্যাসের হতে পারে না। রিশাদই প্রথম ঘরটা খুলেছে। জমানো

গ্যাসের প্রথম ধাক্কাটা ওর উপর দিয়েই গিয়েছে। ফলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজব যত স্বপ্ন দেখেছে ছেলেটা।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ। কাল সেলারে আমিও প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। সেটাও বোধহয় একই গ্যাসের কারণে। রিশাদ ছেলেমানুষ বলে ধাক্কাটা সইতে পারেনি। চিন্তা কোরো না। ঠিক হয়ে যাবে।'

'উঁহুঁ, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মুক্ত বাতাসে গ্যাসের ধাক্কা যতটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, রিশাদ ততটা পারছে না। ও আরও ঝিমিয়ে পড়ছে। শীঘ্রি ওকে একটা ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'ঠিক আছে, তুমি আর রুমানা ওকে শহরে নিয়ে যাও। আমি কাজগুলো দেখি।'

বিকেলের দিকে ওরা রিশাদকে শহরে নিয়ে গেল। আমি শ্রমিকদের কাজগুলো তদারক করতে লাগলাম। একসময় বিকেল পড়ে এল। শ্রমিকদের সেদিনের মত বিদায় দিলাম। ওরা চলে যাবার পর সেলার আর রংমহলে তালা ঝুলাতে গেলাম। মাথার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড ঘুরছে। দম বন্ধ করে সেলারের দরজা লাগিয়ে দিলাম। রংমহলের দরজাটা লাগানোর আগে ভিতরটা একবার ঘুরে দেখতে মন চাইল। আমিও ঘরে পা রাখলাম আর তখনই পুরো বাড়ি জুড়ে গম্ভীর 'ওঁম' শব্দটা ছড়িয়ে পড়ল। সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেল সে শব্দে। মাথাটা ভারী হয়ে আসতে লাগল। ঘুমে জড়িয়ে আসল দু'চোখ। মনের সব শক্তি একত্র করে পিছিয়ে এলাম। করিডোরের দেয়াল ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলাম। এক পা দু'পা করে পিছিয়ে চললাম বাইরের দিকে। একটু খোলা বাতাস দরকার। উঠানে পা দিয়েই চমকে গেলাম। সেই মধ্যবয়সী পাগলটা। মহুয়ার বাবা! বুনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

আমার দিকে। সর্বশরীর কাঁপছে থর থর করে। আচমকা আমাকে অবাক করে দিয়ে বুড়ো চিৎকার করে উঠল। কীসের বোবা? এমন সিংহনাদ কোন বোবার পক্ষে সম্ভব নয়! দু'হাত শূন্যে দোলাতে দোলাতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। লক্ষ করলাম ওর চিৎকারের পরপরই থেমে গিয়েছে গম্ভীর শব্দটা।

কিছুক্ষণ পরই আমাদের গাড়িটা ঢুকল দরজা দিয়ে। রোজিনা চিন্তিত মুখে নামল ড্রাইভিং সিট ছেড়ে। আমি এগিয়ে গেলাম, 'কী বলল ডাক্তার?'

'বলল তো ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় না। কোথাও একটা সমস্যা আছে। ঠিক ধরতে পারছি না।'

রোজিনার মাতৃসত্তা সেদিনই বুঝতে পেরেছিল ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

চার

তিন মাস পর রিশাদ মারা গেল। বহু চেষ্টা করেও ওকে বাঁচাতে পারলাম না।

প্রথম ঘটনাটার পর সপ্তাহখানেক রিশাদ একটু মনমরা হয়ে রইল। খাওয়া দাওয়া, হুটোপুটি, সব কমিয়ে দিল। রোজিনার অক্লান্ত সেবায় আটদিনের মাথায় ওর মুখে হাসি দেখলাম। গ্যারেজ তৈরির কাজ তখন শেষের দিকে। শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে

দোতলায় উঠছি, এমন সময় কানে এল খিল্ খিল্ হাসির শব্দ। আমি দ্রুত রোজিনার রুমে ঢুকলাম। দেখি মা-ছেলে বিছানায় বসে গল্প করছে। রোজিনা কী যেন অভিনয় করে দেখাচ্ছে, আর রিশাদ খিল খিল হাসিতে ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। দৃশ্যটা দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

এরপর ধীরে ধীরে সব প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। প্রায় বললাম এজন্যই যে একটা সমস্যা রয়েই গেল। আর তা হলো রিশাদের ঘুম! রংমহলের ওই ঘটনার পর থেকে ক্রমানুপাতিক হারে ওর ঘুম বেড়ে চলল। প্রথম দিকে আমরা কেউ-ই পাত্তা দিলাম না। বাচ্চা মানুষ, তার উপর অসুস্থ, একটু বেশি ঘুমালে ক্ষতি কী? কিন্তু একমাসের মাথায় সবার টনক নড়ল। এ ঘুম যেন স্বাভাবিক নয়। ও দিনের অর্ধেকটাই ঘুমিয়ে কাটায়। সে এমনই ঘুম যে হাজার ডেকেও ওকে বিছানা থেকে তোলা যায় না। দিন দিন ছেলেটা আমার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়তে লাগল। বুকের হাড়গুলো আঙুল দিয়ে গোণা যায় এমন অবস্থা। কত ভিটামিন, মিনারেল, টনিক খাওয়ালাম। সব বেকার গেল! ডাক্তাররা হতাশ। কেউ রোগটা ধরতে পারছে না। রোজিনা আর আমি ওষুধের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছি। এমনি একদিন দ্বিতীয় সর্বনাশের সূত্রপাত হলো।

সেদিন রোজিনা আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। কোথাকার কোন্ এক কবিরাজ যেন, তার খোঁজে। কোন চেষ্টাই বাদ রাখছি না। তাও যদি ছেলেটা হারানো উদ্যম ফিরে পায়। বাড়িতে রিশাদকে রুমানার হেফাজতে রেখে এসেছি। রুমানা যথেষ্ট দায়িত্বশীল একটা মেয়ে। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত

ছিল, দায়িত্বশীলতাই সব নয়। ওর লেখকসুলভ কৌতূহলী মনটাও বিবেচনায় রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বা আমরা কেউই ঈশ্বর নই, ভবিষ্যৎ দেখতে পারি না। পেলে হয়তো পৃথিবীটা এত বিচিত্রও হত না। আমরা যখন কবিরাজের খোঁজে গ্রামের পথে গাড়ি হাঁকাচ্ছি, ঠিক তখন রুমানা সন্তর্পণে সেলারের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

গ্যারেজ হিসেবে বিশাল সেলারের অর্ধেকটা ব্যবহার করেছি। বাকি অর্ধেক দেয়াল গেঁথে আলাদা করে দেয়া হয়েছিল। আমাদের মুখে শুনে শুনে রহস্যময় রংমহল আর সেলার সম্বন্ধে রুমানার আলাদা একটা আগ্রহ জন্মেছিল। রহস্যগল্পের মালমশলা জোগাতে এর আগেও ওর অমন হাজারো আগ্রহের সাথে আমি পরিচিত ছিলাম। পুরানো জমিদার বাড়ি, ভুতুড়ে জলাশয়, অদ্ভুত পথ-ঘাট, অভিশপ্ত মানুষ, কিংবদন্তীর হারানো চরিত্র–এসব ছিল রুমানার আগ্রহের বিষয়। এসবের খোঁজ পেলেই মেয়েটা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত। ওর একদল ছন্নছাড়া বন্ধু-বান্ধবীর দল ছিল। সবাই মিলে রহস্যের খোঁজে চরে বেড়াত। এহেন রুমানা যে একলা বাড়িতে একটা অঘটন ঘটাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

রুমানা যখন সেলারে ঢুকেছিল তখন ভরদুপুর। এমনিতেই আমাদের বাড়ির চারপাশটা বেশ নীরব। সেখানে ভরদুপুরে তা একদম সুনসান হয়ে যায়। সেলারে আমি একটা সাধারণ তালা ঝুলিয়েছিলাম। রুমানা তালা খুলে সেলার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ওর অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী চোখ অচিরেই সেলারের গায়ে একটা গুপ্তদরজা আবিষ্কার করে ফেলল। এদিক ওদিক হাতড়াতে একটা লিভার খুঁজে পেল দেয়ালের খাঁজে। দেরি না করে লিভার টানল ও। আর তারপরই হয়ে গেল সর্বনাশ। আচমকা বাড়িটা গোঙাতে শুরু করল। একঝলক হিমশীতল বাতাস এসে ঝাপটা

মারল রুমানার চোখে মুখে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে ও আবিষ্কার করল বাতাসে কোন অক্সিজেন নেই। কটু একটা বাতাসে ওর ফুসফুস বিষিয়ে উঠল। সব মিলিয়ে আতঙ্কজনক অবস্থা। রুমানা বহুকষ্টে নড়ে উঠল। ভারী তরলপদার্থে সাঁতার কাটার মত অনুভূতি নিয়ে এগিয়ে গেল সেলারের দরজার দিকে। ওদিকে গম্ভীর শব্দটা ওর অস্তিত্বে মিশে যাচ্ছে রক্তের মত। তারপর আচমকা চোখের সামনে নেমে এল কালো পর্দা।

কবিরাজের দেওয়া লতাপাতার ভর্তা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সূর্য পাটে নেমেছে। পুরো বাড়ি নিস্তব্ধ। আমার মন অজান্তেই কু ডাকতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। রোজিনা আগেই চলে এসেছিল। হলরুমে পা রাখতেই ডানদিকের করিডোরে ওর চিৎকার শুনতে পেলাম। দৌড়ে গেলাম শব্দটা লক্ষ্য করে। রোজিনা দাঁড়িয়ে ছিল রংমহলের দরজায়। চোখে হতভম্ব দৃষ্টি। আমি কাছে যেতেই ওর সংবিৎ ফিরল। ঠেলে সরিয়ে দিল। কিন্তু ততক্ষণে যা দেখার তা দেখে ফেলেছি। হা ঈশ্বর! আমার মেয়ে! রুমানা! রংমহলের ঠিক মাঝখানে, ঝাড়বাতির একেবারে নীচে, ঘুরে ঘুরে নাচছে। গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। চুল এলোমেলো। উন্মাদিনীর মত চোখ বন্ধ করে ও কেবল নেচেই চলেছে। রোজিনা যখন ওকে পোশাক পরিয়ে করিডোরে ফিরিয়ে আনল তখনও ওর হুঁশ ফেরেনি। চোখ খোলা এখন, কিন্তু সেখানে কোন অনুভূতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। আমি ওর সামনে গিয়ে চিৎকার করে নাম ধরে ডাকলাম। তবুও সাড়া দিল না। আচমকা ঠাস্‌ঠাস্‌ করে দু'টো চড় কষালাম ওর গালে। এবার যেন চোখে হতবিহ্বল দৃষ্টি ফিরল। একনজর আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়েই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে

পড়ল ও।

আমি আর রোজিনা চারহাতে তুলে ওকে দোতলায় নিয়ে এলাম। রিশাদ তখনও ঘুমে। রোজিনা ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসে ছিটিয়ে দিল রুমানার চোখে মুখে। ধীরে ধীরে চোখ মেলল ও। 'বাবা', প্রায় অস্ফুট কণ্ঠস্বর রুমানার, 'আমি সেলারে একটা ট্র্যাপডোর ডিসকভার করেছি। কিন্তু ওটা ভুতুড়ে, বাবা।'

'কী আবোল-তাবোল বক্‌ছিস, মা। নে একটু পানি খা। তারপর সব খুলে বল আমাদের।' রুমানা পানি খেল না। এক নিঃশ্বাসে দুপুরের কাহিনি বর্ণনা করল।

'কিন্তু তুই তো জ্ঞান হারিয়েছিলি দুপুরে, আমরা এলাম সন্ধ্যায়। তোকে রংমহলে আধোঘুমন্ত-অবস্থায় পাওয়া গেল। মাঝখানের সময়টার কথা তো কিছুই বললি না।'

'আমি জানি না, বাবা,' ফুঁপিয়ে উঠল রুমানা। তারপর রোজিনার দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলল, 'মা, আমি রিশাদের মত হতে চাই না। আমাকে বাঁচাও, মা।'

রোজিনা ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ কেমন রহস্য? চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচে নেমে এলাম। কাবার্ড থেকে পাঁচ ব্যাটারির বিশাল একটা টর্চ নিয়ে এসেছি। বাথরুমে গিয়ে একটা রুমাল পানিতে ভিজিয়ে নিলাম। তারপর কষে বাঁধলাম নাকে-মুখে। বিষাক্ত গ্যাস যদি থেকেও থাকে, এতে কিছুটা প্রতিরক্ষা পাওয়া যাবে। রংমহলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গা শির শির করে উঠল। মনে পড়ে গেল রুমানার ভৌতিক নাচের দৃশ্যটা। সেলারের সামনে আসতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলাম কয়েক পা। বুক ভরে তাজা বাতাস টেনে নিলাম। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফের এগিয়ে গেলাম। গুপ্তদরজাটা চোখে

পড়ল। সেটার পর একরাশ কালিগোলা অন্ধকার। টর্চ জ্বালতেই চমকে গেলাম। গুপ্তদরজার পরের সুরঙ্গটার প্রায় বিশ ফুট দূরত্বে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। গায়ের পোশাকগুলো তখনও অক্ষত। শূন্য অক্ষিকোটর দু'টো আমার দিকেই ফেরানো। আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আলোটা সোজা করে ধরলাম। কিন্তু অনন্ত সুরঙ্গের শেষ চোখে পড়ল না। এমন সময় ফুসফুস জানিয়ে দিল অক্সিজেনের সঞ্চয় শেষ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি গুপ্তদরজাটা লাগিয়ে দিলাম। 'খট্' করে লিভারটা আগের অবস্থানে ফিরে গেল। এখন ওটাকে দেখতে সাধারণ একটুকরো সিমেন্টের মত লাগছে। বাতাসের জন্য বুক আকুলি-বিকুলি করে উঠল। দ্রুত পিছিয়ে গেলাম। সেলারের দরজায় তালা দিয়ে ফিরে এলাম করিডোরে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছুটলাম শ্রমিক-বস্তির উদ্দেশে। মহুয়াকে জানাতে হবে সবকিছু। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে রহস্যটা সম্পর্কে। মহুয়াদের চৌচালা টিনের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল ওর বাবার উপর। শীর্ণ লোকটিকে উঠানের এক কোণে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে খুঁটির সাথে, গবাদিপশুর মত। আমাকে দেখেই সে শিকল ধরে টানতে শুরু করল। মুখ দিয়ে ভেসে আসছে জান্তব গোঙানি। মহুয়া বেরিয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে পড়ল। চোখে প্রশ্ন। কিছুটা উত্তর দেওয়ার মত করেই বললাম, 'ঘুমবাড়ি সম্পর্কে সবটা জানতে এসেছি।'

'ধ্বংস শুরু হয়ে গিয়েছে তা হলে,' বিদ্রূপের স্বরে বলল মেয়েটা।

'আমাকে সাহায্য করো, মহুয়া। আমার সন্তান দু'টো মরতে বসেছে।' কাতর কণ্ঠে বললাম আমি।

'সাহেব, তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম। তখন তো পাত্তা দাওনি। তা দেবে কেন, আমি পাহাড়ি মেয়ে, আমার কথার কী দাম আছে?'

'প্লিজ, আমাকে আর উপহাস কোরো না। আমি অসহায়। রিশাদ মরতে বসেছে, রুমানা পাগলপ্রায়। সেলারের গুপ্তসুরঙ্গে একটা ফিরিঙ্গী কঙ্কাল পড়ে আছে। এসব কী?' চিৎকার করে উঠলাম আমি। আমার কথা শুনে চমকে উঠল মহুয়া, 'কঙ্কাল? বিদেশী সাহেবের? তুমি সত্যি বলছ?' মেয়েটা দৌড়ে গেল বাবার কাছে, বাবা, শুনছ, সাহেব কী বলছে? তোমার হারামী জন্মদাতাটাকে পাওয়া গিয়েছে। পচে গলে নিঃশেষ হয়ে পড়ে আছে ঘুমবাড়ির ভিতর। তুমি শুনছ, বাবা?'

মহুয়ার বাবার চোখ ঝলসে উঠল। কাঁপতে শুরু করল তার দেহটা। আমার দিকে ফিরল মহুয়া, 'সাহেব, হয়তো তোমাদের বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু বাবাকে কথা বলাতে হবে। তাকে ওই কঙ্কালটা দেখাতে হবে। চলো এক্ষুণি।'

আমি মহুয়া আর ওর বাবাকে নিয়ে ঘুমবাড়িতে ফিরলাম। হলঘরে পা দিয়েই থমকে গেলাম। দোতলা থেকে জোরকণ্ঠে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দৌড়ে সিঁড়ি ডিঙাতে শুরু করলাম আমি। পৌঁছে গেলাম বেডরুমে। বিছানায় রোজিনা রিশাদের মাথাটা কোলে নিয়ে বিলাপ করছে। আমাকে দেখে ও ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। রিশাদ মারা গিয়েছে।'

পাঁচ

রিশাদকে আমরা ঘুমবাড়ির পাশেই কবর দিলাম।

ওদিকে শোকে রোজিনা শয্যা নিল। রুমানার অবস্থাও ভাল নয়। স্বাভাবিক রইলাম শুধু আমি। মহুয়াকে নিয়ে কাজে নামলাম। শহরে গিয়ে গ্যাসমাস্ক জোগাড় করলাম দু'টো। এ ছাড়া সুরঙ্গে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে বেলচা, ম্যানিলা রোপ, পিটনসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার কিনলাম। রিশাদের মৃত্যুর চারদিন পর আমি আর মহুয়া ঢুকলাম গুপ্ত সুরঙ্গে। মহুয়ার বাবাকে উঠানে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। আমি টর্চ জ্বেলে সামনে চলছি, পিছনে মহুয়া। প্রথমে কঙ্কালটা পরীক্ষা করলাম। হলদে হয়ে গেছে হাড়গুলো। পরনের কাপড় চোপড় স্পর্শেই গুঁড়িয়ে গেল শুকনো পাতার মত। ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম, কঙ্কালের ডান হাতে ধরা একটা ডেরিঞ্জার পিস্তল। তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলাম। মরচে পড়ে একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে। মহুয়াকে বললাম একটা ক্যানভাসের স্যাক নিয়ে আসতে। দৌড়ে সেলারে গেল মেয়েটি। ফিরল মিনিট কয়েক পরেই, হাতে বড়সড় একটা বস্তা। 'একটু হেল্প করো, মহুয়া। কঙ্কালটা বস্তায় ভরতে হবে।'

'সাহেব, এটা এখানে থাকলেই বোধহয় ভাল হত। আত্মা দেহাবশেষের আশপাশেই ঘুরতে থাকে, মহামুক্তির পূর্ব পর্যন্ত।

বাইরে নিয়ে গেলে এর পাপাত্মাও সাথে যাবে।'

'ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ কর,' ধমকে উঠলাম আমি। 'আত্মা, রহস্য, ভূত এসব বোগাস! এ সুরঙ্গের কোথাও অবশ্যই কোন না কোন বিষাক্ত পদার্থের উৎস আছে। এ লোক কে? কীভাবে এখানে এল? মরলই বা কীভাবে? আমাকে সব জানতে হবে। বাইরে না নিয়ে গেলে তা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, তোমার যেমন খুশি,' যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল মহুয়া। অতিসাবধানে টুকরো-টাকরা কাপড়সহ পুরো কঙ্কালটা বস্তায় ভরলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে কঙ্কালটার কোত্থেকে যেন এক টুকরো কাপড় খসে পড়ল। নিচু হয়ে তুলে নিল মহুয়া জিনিসটা।

'একটা পকেট ব্যাগ, সাহেব। মনে হয় আস্তই আছে।'

'কই দেখি!'

বস্তাটা সুরঙ্গের দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাতব্যাগটা খুললাম। খুব ভাল ধরনের চামড়ায় তৈরি ব্যাগটা। সম্ভবত এ কারণেই এখনও টিকে আছে। মোট তিনভাগে বিভক্ত ব্যাগটার প্রথম অংশেই একটা মলিন হয়ে যাওয়া ফটোগ্রাফ আবিষ্কার করলাম। ফ্যামিলি ফটোগ্রাম। মধ্যবয়সী দু'জন শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ আর ছোট্ট একটি বাচ্চা। পুরুষটার সঙ্গে বেশ মিল পেলাম মহুয়ার চেহারায়। টানা চোখ, টিকলো নাক, লম্বাটে চিবুক—বেশ মিল।

'সম্ভবত তোমার পূর্বপুরুষদের কেউ,' ছবিটা এগিয়ে দিলাম মহুয়ার দিকে। মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। আমি ব্যাগের অন্যান্য অংশগুলো ঘেঁটে দেখলাম। কাগজগুলো প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু হলদে হয়ে যাওয়া একটা চিঠি উদ্ধার করতে পারলাম। টানা ইংরেজী অক্ষরে লেখা চিঠিটির অর্থ করলে দাঁড়ায়—

প্রিয় পিট,

তোমার চিঠি পেয়ে চরম উৎকণ্ঠায় আছি। অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি ওই অভিশপ্ত বাড়িটা ছাড়লে না। আমি যীশুর কিরে কেটে বলেছিলাম, ওখানে অশুভ কিছু একটা আছে। তুমি বিশ্বাস করনি। তোমাকে আমি ভালবাসি, পিট, ভালবাসে তোমার ছোট ছেলেটাও। ওর কথা ভেবেই তোমাকে একা রেখে দেশে ফিরে এলাম। তা ছাড়া, যত যুক্তিই দেখাও না কেন, ওইসব সরল শ্রমিকদের প্রতি তোমার আর তোমার সহকর্মীদের নির্যাতন কখনোই আমার কাছে ভাল লাগেনি। রংমহলের সেইসব নর্তকীদের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার এখনও আমার দুঃস্বপ্নে ফিরে আসে। যত যাই বল, পিট, এভাবে স্বেচ্ছাচার করা তোমাদের সাজে না। এখনও সময় আছে, ফিরে এসো।

শেষ করার আগে আরেকবার অনুরোধ করছি, অনুসন্ধানের চিন্তা বাদ দাও। সেলারের ওই সুরঙ্গে তুমি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই পাবে না। জগতের সব রহস্য উন্মোচিত হবার নয়। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

ভালবাসা নিও
তোমারই
কারলা

চিঠি পড়ে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে এল। চিঠির পিট নিশ্চয় ছবির ওই পুরুষটি, এখন যার কঙ্কাল ক্যানভাসের বস্তায় দুমড়ে মুচড়ে আছে। কারলা সম্ভবত তার স্ত্রী, বৈধ স্ত্রী। বোধকরি আমার মত পিটও এই সুরঙ্গে অনুসন্ধান চালাতে এসেছিল। তারপর অজানা কারণে আটকা পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল একসময়। মহুয়ার ডাকে সংবিৎ ফিরল আমার, 'সাহেব, তুমি ঠিকই ধরেছ। এ লোক আমার

পূর্বপুরুষ। আমার পিতার জন্মদাতা। আমার দাদী-র হন্তারক।' ধরাধরি করে বস্তাটা আমরা উঠানে নিয়ে এলাম। মহুয়ার বাবা লাফিয়ে উঠল কঙ্কালটা দেখে। উত্তেজনায় তার মুখে ফেনা গড়াতে শুরু করল। হিস্-হিস্ শব্দ বেরুতে লাগল মুখ দিয়ে। মহুয়া এগিয়ে গিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল তাকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে গর্জন করে উঠল লোকটা, 'আমাকে ছেড়ে দে। ওর মুণ্ডু চিবিয়ে খাব আমি। শয়তানটা হাসছে আমাকে দেখে! এত বড় আস্পর্ধা! আমার বাঁধন খুলে দে। ওকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।'

বিস্ময়ে মহুয়া হাঁ হয়ে গিয়েছে। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আচমকা লোকটা শান্ত হয়ে গেল। বসে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। মাঝে মাঝে 'মা, মা' শব্দে বিলাপ করতে লাগল। মহুয়া ততক্ষণে বাবার পাশে গিয়ে বসেছে। দু'হাতে বাবার মাথাটা বুকে চেপে ধরে রেখেছে। একসময় ধাতস্থ হলো লোকটা। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। কাউকে লক্ষ না করে, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'ওই লোকটা, ওই ঘৃণিত পশুটা, যার কঙ্কাল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, ছিল আমার জন্মদাতা। রংমহলের গুমোট বাতাসে নিংড়ে বের করেছে অসংখ্য নারীর আত্মা। তাদের শরীর কবর দিয়েছে এ বাড়ির ভিতরেই কোথাও। ছোট্ট আমি, বর্বর সে নির্যাতন নিজ চোখে দেখেছি। আমার মা, আরও অনেকের মা, কারও বোন, কারও মেয়ে—শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লালসা চরিতার্থ করেছে ওদের। অবশেষে এল অভিশাপ। খনিতে আগুন লাগল। সাদা পিশাচগুলো বন্ধ করে দিল খনির মুখ। দেয়াল তুলে দিল চারপাশে, যাতে আগুন ছড়াতে না পারে। কিন্তু লাভ হলো না। সাহেব্ বাড়িতে দুর্দিন নামল। কী একটা যেন তাদের শক্তি চুষে

খেতে শুরু করল। একসময় অবস্থা এমন দাঁড়াল, সবাই শুধু ঘুমুচ্ছে, দিন-রাত, সবসময়। ওভাবেই মরল ওরা। আর এই পিশাচটা নিখোঁজ হলো একদিন।' আমার দিকে ঘুরল মহুয়ার বাবা। 'সাহেব, চলে যাও যদি পার। এ বাড়ি তোমাদের বাঁচতে দেবে না। সময় থাকতে পালিয়ে যাও।'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। মহুয়া বাবার শিকল খুলে দিল। তারপর দু'জন মিলে ফিরে চলল। আমি একলা উঠানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘোর কাটিয়ে উঠলাম একসময়। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। সুরঙ্গে ঢুকব, না সব বাদ দিয়ে চলে যাব বাড়ি ছেড়ে। আধুনিক মনটা মানতে চাইল না মহুয়ার বাবার বক্তব্য। নিশ্চয়ই কোন না কোন সহজ সমাধান আছে এ রহস্যের, এ অতল গভীর ঘুমের। বস্তাসহ কঙ্কালটা গাড়ির বনেটে রেখে দিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম শহরে নিয়ে গিয়ে ল্যাবে পরীক্ষা করাব ওগুলো। মৃত্যুর কারণটা জানতে হবে। এ ছাড়া একজন এক্সপার্টও নিয়ে আসব সুরঙ্গটা পরীক্ষা করাবার জন্য। ভুতুড়ে একটা গল্পের কারণে শুধু শুধু বাড়ি ছেড়ে যাব কেন? গভীর ঘুম, উদ্ভট আচরণ, গোঙানি, শরীর অবশ হয়ে যাওয়া, চোখে অবাস্তব কিছু দেখা সবকিছুরই বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। বিষাক্ত অজানা গ্যাস, মানসিক ডিপ্রেশন, হ্যালুসিনেশন, বাতাসের অদ্ভুত জ্যামিতি—এগুলোই হতে পারে রহস্যের মূল। শুধু শুধু ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। রিশাদের মৃত্যুটা অস্বাভাবিক ছিল সত্যি, কিন্তু ভুতুড়ে নিশ্চয়ই ছিল না। কেউ ওর রক্ত চুষেও খায়নি, ঘাড়ও মটকায়নি। ছেলেটা অপুষ্টিতে ভুগে মরেছে। হয়তোবা অজানা গ্যাসের প্রভাবে দৈহিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কর্মপন্থা ঠিক করতে করতে দোতলায় উঠে এলাম। রোজিনা

কাঁদছে। কাঁদুক। মনটা হালকা হবে। রুমানার ঘরে উঁকি দিলাম। ও ঘুমোচ্ছে। গিয়ে পাশে বসলাম। পরম মমতায় হাত রাখলাম ওর গায়ে। পরক্ষণেই বৈদ্যুতিক শক লাগার মত করে হাতটা সরিয়ে নিলাম। পুরো শরীর বরফশীতল হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পালস চেক করলাম। খুব ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। জাগাতে চেষ্টা করলাম ওকে। কিন্তু লাভ হলো না।। বাস্তবিক অর্থেই মড়ার মত ঘুমোচ্ছে আমার মেয়েটা, আর নেমে যাচ্ছে মৃত্যু গহ্বরে। চেঁচিয়ে রোজিনাকে ডাকলাম আমি। দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল সে। দ্রুত নির্দেশ দিলাম ওকে । তারপর দু'জন মিলে হাত-পা ঘষতে শুরু করলাম রুমানার। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় মেয়েটার পালস রেট স্বাভাবিক হয়ে এল।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রিশাদের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তি হারাতে লাগল রুমানা। হসপিটালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা বেডরেস্টের কথা বলে ফিরিয়ে দিল। উচ্চশক্তির ভিটামিন, গ্লুকোজ, মিনারেল—সব চেষ্টা করলাম, হলো না। ওদিকে রোজিনাও শয্যা নিয়েছে। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। নিজের মধ্যেও অনুভব করতে লাগলাম দুর্বলতা। অল্পতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। সেবা-যত্ন, কাজকর্ম ভুলে শুধু ঘুমাই, সময়ে-অসময়ে। তিন সপ্তাহের মাথায় মারা গেল রুমানা। আমরা সবাই তখন ঘুমাচ্ছি। লাশ আবিষ্কারের পর রোজিনাকে ডাকতে গেলাম আমি। জাগাতে পারলাম না। ঘুমবাড়ি শক্তি শুষছে তখন ওর শরীর থেকে।

ছয়

ঘুমবাড়ি আমাদের বন্দি করে ফেলল।

রুমানাকে কবর দিতে গিয়ে টের পেলাম ব্যাপারটা। লোকজনদের খবর দিতে বাইরে যাব। এমন সময় দেখি গাড়ির সবগুলো টায়ার ফেঁসে গিয়েছে। অগত্যা হাঁটা ধরলাম। কিন্তু যেই না মেইন গেট স্পর্শ করেছি, ভোঁতা গোঙানিতে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা। নিমিষে আমার শরীরের সব শক্তি উধাও হয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছে। বহুকষ্টে বুকে হেঁটে সরে এলাম গেট থেকে। উঠানের মাঝামাঝি পৌঁছাতেই শব্দ থেমে গেল। শক্তি ফিরে পেলাম। এরপর ঘুমবাড়ি আমার সাথে নিষ্ঠুর খেলাটা বারবার খেলতে লাগল। যতবার বাড়ি থেকে বের হতে যাই, ও আমার শক্তি কেড়ে নেয়। উঠানের দিকে চলে আসলেই ফিরিয়ে দেয়। বাড়ির অন্যান্য দিক দিয়েও বের হতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি।

এরপর বহুকষ্টে নিজেই একটা কবর খুঁড়েছি উঠানের পাশে। কবর না বলে গর্ত বললেই ভাল হয়। গায়ে আমার একটা ছোট শিশুর বলও নেই। তারপরও কীভাবে জানি না রুমানাকে দোতলা থেকে নামালাম। টেনে-হিঁচড়ে, মেঝেতে ঘষটে ঘষটে ওর লাশ বয়ে নিলাম গর্ত পর্যন্ত। গড়িয়ে দিলাম ভিতরে। উপুড় হয়ে পড়ল লাশটা। সোজা যে করব সে শক্তিটাও আর নেই। ওভাবেই গর্তটা

মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলাম। কান্নায় বুক ফেটে গেল। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। কাজ সেরে শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম গর্তের পাশেই। কখন ঘুমোলাম, কখন জাগলাম ঠাওর করতে পারল্যাম না। সব যেন ঘোরের মধ্যে ঘটে চলেছে। জোম্বির মত ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে রোজিনার পাশে গিয়ে বসলাম।

রোজিনা টিকল চারদিন। ওর লাশ কবর দেবার মত সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি তখন প্রায় হাঁটতেই পারি না। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। এরমধ্যে আরেকবার চেষ্টা করেছিলাম বাইরে যেতে, পারিনি। উঠান পর্যন্তই যেতে পারিনি। দু'চারটে শেয়াল অগভীর গর্ত থেকে রুমানার লাশ তুলে উঠানের মাঝখানে ভোজ বসিয়েছিল। বীভৎস! আমি দ্বিতীয়বার আর ওমুখো হইনি। দু' দিনের মধ্যেই রোজিনার লাশও দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল। আমি রুমানার ঘরে শুয়ে শুয়ে ঘুমাই। জাগলেই চোখের সামনে আবোল তাবোল দেখি। শ্বেতাঙ্গ সাহেব, নর্তকীর চিৎকার, ব্যভিচার, নৃশংস হত্যা, সব দেখি। একসময় অসহ্য হয়ে দাঁড়াল সবকিছু। দুঃস্বপ্ন, লাশের দুর্গন্ধ, ঘুম, দুর্বলতা—সব মিলিয়ে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। মৃত্যু কামনা করলাম মনে প্রাণে। কিন্তু ঘুমবাড়ি এত সহজে তা হতে দিল না। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল আমার দুর্দশা।

এক সকালে হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে গেল সবকিছু। পুরো শক্তি ফিরে পেলাম শরীরে। বুঝলাম এটা বাড়িটার নতুন খেলা। আমাকে কষ্ট দিয়ে মজা পাচ্ছে। আক্রোশে আমার অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ অনুভব করলাম। আমার এত সুন্দর সংসার যে শক্তি তছনছ করে দিল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। মরব আমি ঠিকই, কিন্তু শেষ দেখে ছাড়ব। সব মানসিক শক্তি একত্র করে রুমানার ঘর থেকে বের হলাম।

তাকাব না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। নিজের অজান্তেই চোখ চলে গেল রোজিনার ঘরে। গলতে শুরু করেছে লাশ। হাজার হাজার মাছি ভন ভন শব্দ করছে লাশটা ঘিরে। বিজবিজে ফেনায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে পুরোটা শরীর। দম আটকানো দুর্গন্ধ!

পালিয়ে এলাম নীচতলায়। আমার মনে এখন কোন ভয় নেই। বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। কাবার্ড খুলে হার্ডওয়্যারগুলো বের করলাম। রওয়ানা হলাম সেলারের উদ্দেশে। গুপ্তদরজাটা হাট করে খোলা। গ্যাসমাস্ক পরে নিলাম। টর্চের তীক্ষ্ণ রশ্মি অন্ধকার পথ কেটে এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে সুরঙ্গটা। দু'বার গর্তের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। সুরঙ্গের দেয়ালে পিটন গেঁথে, রশি ঝুলিয়ে পার হলাম গর্তদু'টো। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু সুরঙ্গ শেষ হলো না। নীচের দিকে নামতে নামতে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে সামনের পথ। তারপর একসময়, কতক্ষণ পর জানি না, দূরে-বহুদূরে, ক্ষীণ একটুকরো আলো চোখে পড়ল। এগোতে শুরু করলাম আমি। বাতাস কেমন গরম হয়ে উঠেছে। ঘাম ঝরছে পুরো শরীর বেয়ে। আচমকা শেষ হয়ে গেল পথটা। সামনে নিদারুণ বিস্ময়!

জায়গাটা রোমান অ্যামফিথিয়েটারের মত। বহু উঁচুতে ছাদ। ছাদ থেকে ঝুলছে অসংখ্য চোখা পাথর। চারপাশের গোলাকার দেয়ালের খাঁজে খাঁজে জ্বলছে কয়লা। ভয়ঙ্কর তাপ ছড়াচ্ছে সেগুলো। আমি দাঁড়িয়ে আছি ঝুলন্ত একটা ডিম্বাকার কার্নিশে। দু'শো ফুট নীচে চোখে পড়ছে থিয়েটারের মেঝে। পুরোটা মেঝে জুড়ে শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল। লাখ-লাখ, কোটি কোটি।

মাঝখানে বিশালাকার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে দানবীয় একটা কিছুকে। কীভাবে ওটার বর্ণনা দেব আমি জানি না। না মানুষ, না পশু, না যন্ত্র। অলৌকিক সেটার আকার। আমার বোধবুদ্ধির বাইরে। মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে দেহটা। আমি সম্মোহিতের মত তাকিয়েই রইলাম। আচমকা ভয়ঙ্কর কর্কশ একটা শব্দ ভেসে এল ওখান থেকে। পুরো থিয়েটার কেঁপে উঠল সে শব্দে। আমার কানে তালা লেগে গেল। ছিটকে পড়লাম কার্নিশ থেকে।

দেয়াল থেকে কয়লার স্তর খসে পড়ল কয়েক পরত। ছাদ থেকে ধস নামল চোখা পাথরের। হিস্-হিস্ শব্দে বাষ্পের মত সাদাটে ধোঁয়া বেরিয়ে এল থিয়েটারের চারপাশ থেকে। আমার মাথা বোঁ করে ঘুরে উঠল। কার্নিশ ধরে বসে পড়লাম। এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট রইল না শরীরে। আবার দেখলাম দুঃস্বপ্ন। আমার চারপাশে ভেসে বেড়াতে লাগল আত্মারা। রোজিনাকে দেখলাম সেখানে। রুমানাকে দেখলাম নর্তকীর পোশাকে। ওদের অপার্থিব শরীর ভাসতে ভাসতে অদ্ভুত দর্শন জিনিসটার ভিতর ঢুকে পড়ল। এমন সময় আমার হাত আঁকড়ে ধরল কেউ। বহুকষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। এ যে মহুয়া! গ্যাস মাস্ক মুখে দিয়ে আছে। ইশারা করল আমাকে উঠতে। আমি যেন কিছুটা সাহস পেলাম, শক্তিও পেলাম শরীরে। উঠে দাঁড়ালাম। মহুয়া আমার একটা হাত ওর কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে আমাকে সাপোর্ট দিল। ধীর পায়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম সুরঙ্গপথে। ফেরার পথে উঁচু হয়ে গিয়েছে পথ, ফলে কষ্ট হচ্ছিল বেশ। কিন্তু থামলাম না আমরা। এদিকে শব্দটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উত্তাপে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে শরীরে। রশি ঝোলানো প্রথম গর্তটা পার হলাম আমি। আমার পরে এল মহুয়া। দ্বিতীয় গর্তটা আকারে বেড়ে গিয়েছে।

নতুন রশি ঝোলাতে হলো। বহু কষ্টে পার হলাম আমি। কিন্তু মহুয়া পার হতে পারল না। আচমকা ওর পায়ের নীচে মাটি সরে গেল। আরও বড় হলো গর্তটা। মহুয়া একহাতে বহুকষ্টে ঝুলে রইল কিনারা ধরে। আমি রশি চেপে ধরলাম ওকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু মেয়েটা তা হতে দিল না। গ্যাসমাস্ক খুলে তাকাল আমার দিকে। এমন পরিস্থিতিতে ও হাসল একটু। গলার স্বর চড়িয়ে বলল, 'চলে যাও, সাহেব, আমাকে বাঁচাতে পারবে না। পালাও, প্রাণ বাঁচাও নিজের। আমি চললাম।'

পরক্ষণেই হাত ছেড়ে দিল বোকা মেয়েটি। নিমিষে হারিয়ে গেল অতল অন্ধকারে। পতনের কোন শব্দ পেলাম না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কোত্থেকে যেন একরাশ আতঙ্ক এসে ভর করল শরীরে। দৌড়াতে শুরু করলাম পাগলের মত। পিছনে কাঁপতে শুরু করল সুরঙ্গের মাটি। কোথায় যেন ধসে পড়ল দেয়াল। গুম-গুম শব্দে ভরে গেল পুরো সুরঙ্গ। কতক্ষণ পর ছিটকে বেরিয়ে এলাম সুরঙ্গ থেকে। পরমুহূর্তেই ধসে পড়ল সুরঙ্গের ছাদ। বন্ধ হয়ে গেল গুপ্তপথটা চিরতরে।

বসে পড়লাম আমি সেলারের মেঝেতেই। হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। জ্ঞান হারানোর আগে চোখে পড়ল মহুয়ার বাবাকে। একদল শ্রমিক নিয়ে সেলারে ঢুকছে সে। তারপর সব অন্ধকার।

উপসংহার

অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে মহুয়া আর ওর বাবা ওই ঘটনার দিন আমাদের খোঁজ নিতে এসেছিল। রুমানা আর রোজিনার পচা-গলা লাশ দেখেই বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছিল দু'জনে।

মহুয়ার বাবা ফিরে গিয়েছিল লোক জোগাড় করতে। আর মহুয়া রয়ে গিয়েছিল আমার জন্য।

ওরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। টানা তিনদিন অচেতন ছিলাম আমি। জ্ঞান ফেরার পর মহুয়ার বাবাকে খুলে বলেছিলাম সব। লোকটা কোন কথা না বলে ফিরে গিয়েছিল। আর কোনদিন কেউ তাকে দেখেনি। ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য আমাকে সানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দেয়। এরপর বিশটি বছর শুধুই কষ্ট আর কষ্ট।

ঘুমবাড়ি এখনও আছে। এই দেশেই আছে। কিন্তু সাবধান! কোনদিন যদি কেউ জলপাইঘেরা দোতলা সেই পুরানো প্রাসাদ দেখতে পান, ভিতরে যাবেন না। অন্তত একা তো নয়ই।

শামীম আল মামুন

ফকির

তন্ত্র-মন্ত্রের দিকে প্রবল ঝোঁক পিতার দিক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল ফকির। পিতা সারাটি জীবন বহু ঘাত-প্রতিঘাত নীরবে সহ্য করে সাধনা করে কী ফল পেয়েছিলেন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা কখনও দেখতে পাইনি। তবে তা যে পূর্ণ ছিল না তার প্রমাণ হচ্ছে ফকিরের নামকরণে। পিতার অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ছেলের নাম রেখেছিলেন ফকির। যার প্রকৃত অর্থ মিসকিন নয়, বরং সাধক। আর সাধনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা।

বাজারে দাঁড়িয়ে যাদুকরের কেরামতি দেখছিলাম আমরা। জ্যান্ত মানুষকে কাপড়ের নীচে ঢুকিয়ে ছুরি দিয়ে ফালা-ফালা করছিল সে। মানুষ কাটা যাদুকর নিজেকে সাধক দাবি করে বলছিল অমাবস্যার রাতে ন্যাংটো হয়ে কবর থেকে মড়ার খুলি তুলে আনতে পারলে অসীম ক্ষমতাধর হওয়া যায়। এমন লোকের অঙ্গুলী হেলনে নাকি সবাই ওঠাবসা করতে থাকবে। বারো বছরের সাধনার দ্বারা যে পর্যায়ে পৌঁছা যায়, তা মাত্র একটি অমাবস্যার রাতেই যে কোনও মানুষের দ্বারা সম্ভব।

বাজারের সাধকের কথাগুলো দ্বারা ফকির কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তা আমরা প্রথমে অনুভব করতে পারিনি। সে শুধু আমাদেরকে জানিয়েছিল কাজটা করা দরকার। আমরা এ ধরনের

একটা উদ্ভট কাজ করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ বোধ করছিলাম না। আসলে কাজটা করার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি আমরা। যাদুকর জানিয়েছিল এধরনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় কারও সাহায্য নেয়া যাবে না। একাই সব কিছু করতে হবে। তা ছাড়া এমন কাজ করতে গেলে নাকি জিনেরা বিভিন্ন রূপ ধরে এসে বাধা দেয়ারও চেষ্টা করবে। অমাবস্যার রাতে একা-একা উদোম শরীরে কবরে গিয়ে সেধে জিন-ভূতের খপ্পরে পড়ার দুঃসাহস ছিল না আমাদের। কাজেই অসীম ক্ষমতাবান হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়ার কথা মনেও হয়নি আমাদের। কিন্তু ফকিরের ব্যাপারটা ভিন্ন। পিতার স্বপ্ন পূরণে যে কোনও পন্থা অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের সবাইকে হতবাক করে দিয়ে অমাবস্যার রাতে ন্যাংটো হয়ে কবর থেকে মড়ার খুলি তুলে নিয়ে এল সে। আমরা গভীর আগ্রহে তার মধ্যে অসীম ক্ষমতার প্রকাশ দেখার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েকটা দিন সে-ও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে চলতে লাগল। কথা-বার্তা কমিয়ে দিয়ে অধিকাংশ সময় নীরবতা অবলম্বন করতে লাগল সে। আমরা মনে করলাম অসীম ক্ষমতা প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে তার এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। আমরা একই সঙ্গে তাকে কিছুটা ভক্তি করতে লাগলাম। আবার উল্টো-পাল্টা কিছু হয়ে গেল নাকি ভেবে ভয়ও হতে লাগল। কিন্তু সত্যিই আমরা গভীর প্রতিক্ষায় ছিলাম, কখন সে আমাদের সামনে তার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে থাকবে। এমনিভাবে অনেক দিন পার হয়ে গেল, সপ্তাহ পার হয়ে মাস এল। ফকিরের অর্জিত ক্ষমতার কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা। অবশেষে অধৈর্য হয়ে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে লাগলাম তার

দুঃসাহসিক সেই অভিযানের কথা।

হঠাৎ একদিন আমাদের আড্ডায় চিৎকার করে উঠল সে, 'সব ভুয়া।'

'ভুয়া!' আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'হ, ভুয়া। মিথ্যা সব কিছু। ওই শালার ভণ্ডটারে পাইলে এক্কেরে...' কথা শেষ করল না ফকির। কিন্তু তার কণ্ঠের চেপে রাখা ক্রোধের তীব্রতায় চমকে উঠলাম আমরা।

আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি তাকে, 'হয়তো তোরই ভুল হয়েছে কোথাও। তুই মড়ার খুলি তুলে ফিরে আসার সময় পিছে তাকিয়েছিস একবারও?' এত বড় দুঃসাহসিক সাধনা ব্যর্থ হওয়ার আশংকায় বিমূঢ় আমরা সাধকের বাতলানো বহু শর্তের একটি মনে করিয়ে দিলাম তাকে।

'না, একবারও না।' দৃঢ় উত্তর তার।

'কোনও দিক থেকে তোর নাম ধরে ডাক দিয়েছে কেউ?'

'নাহ্, সেরকম কিচ্ছু হয় নাই। আমি গেছি, একখান ভাঙা কবরে নামছি, মাথার খুলি নিয়া ফির‍্যা আইছি সোজা বাড়িত। এর মইদ্যে আর কিচ্ছু হয় নাই। ওই ব্যাটা ভণ্ড যা-যা কইছে তার মইদ্যে একখানও হয় নাই।'

ফকিরের এই দুঃসাহসিক অভিযানের অনেক আগে থেকেই আমার নিজেরও অসীম ক্ষমতাধর হওয়ার এই পদ্ধতিটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ছিল এবং আন্তরিক বিশ্বাসও ছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তা বাস্তবে রূপদানে সাহসী হয়ে উঠতে পারিনি কখনও। কাজেই আগ্রহটা আগ্রহই থেকে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফকিরের জবানবন্দীতে পদ্ধতির পরিণতি শুনে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লাম আমি এবং সেই সাথে হতাশাও গ্রাস করল আমাকে।

এর পর ফকিরের নীরব মূর্তির মুখোমুখি হলাম আমরা। কবর অভিযানের পর এমনিতেই কথা-বার্তা অনেক কমে গিয়েছিল তার। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা প্রকাশ করার পর সে একেবারে নীরব হয়ে গেল। আমাদের প্রতিদিনের নির্ধারিত আড্ডায় তার আসা-যাওয়াও কমে যেতে লাগল এবং অবশেষে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল ফকির। দু'চার দিন খোঁজ করলাম তার। কেউ বলতে পারল না সে কোথায় গিয়েছে। যতই দিন গেল ধীরে ধীরে তার ব্যাপারটা ভুলে যেতে লাগলাম আমরা। কিন্তু যেমনভাবে অদৃশ্য হয়েছিল তেমনি হঠাৎ একদিন এসে হাজির সে।

ছিন্নভিন্ন পোশাক-আশাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত ফকিরকে দেখে আমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। প্রাণহীন মৃত মানুষের দৃষ্টি তার চোখে। মুখে বিড় বিড় করা ভাষা। কী বলে বোঝা যায় না। আমরা যারা তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলাম তারাও হতবাক হয়ে লক্ষ করলাম সে আমাদের কাউকে সহসা চিনতে পারছে না, অথবা না চেনার ভান করছে। মুখোমুখি হলে দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করে। নাম ধরে ডাকলে ভাষাহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর নীরবে কেটে পড়ে সামনে থেকে। কবরে গিয়ে উল্টো-পাল্টা কাজ করে তার মাথায় যে কোন সমস্যা হয়েছে সে ব্যাপারে সন্দেহ রইল না আমাদের। তার জন্য সাইন্স-আর্টস্ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার কথা ভাবলাম আমরা। অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর জন্য মনের গহীনে একটা দায়বদ্ধতা ছিল আমাদের। কিন্তু তাকে কোনও এক জায়গায় পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। সারাক্ষণ সে উদ্‌ভ্রান্তের মত চক্কর দিতে লাগল রাস্তায়-রাস্তায়, ঝোপে-জঙ্গলে, নদীর তীরে। তবে বাজার এলাকা বা বেশি মানুষের সমাগম হয় এমন স্থানগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলতে লাগল সে। কাজেই তাকে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল আমাদের জন্য।

এভাবেই চলে যাচ্ছিল দিন। যতই দিন যাচ্ছিল ফকিরের মধ্যে অস্বাভাবিকতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার অস্বাভাবিক আচরণে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সারাদিন সে কোথায় থাকে কী করে কিছুই জানে না তারা। গভীর রাতে বাড়ি ফেরে। ঘুমের ঘোরে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তার খুব কাছের বন্ধু হিসেবে আমি তার এই অবস্থাটা মেনে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু তার জন্য কিছু করব সেই উপায়ও বের করতে পারছিলাম না। তাকে খুঁজে পাওয়াই ছিল মূল সমস্যা। সে কিছুতেই ধরা দিতে চাইছিল না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দার মত খোঁজ করতে লাগলাম তার। তবুও খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলাম না।

অবশেষে একদিন পেলাম তাকে। সন্ধে পার হয়ে গিয়েছে তখন। আবহাওয়া পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছিল শরীরে। সেই ধাক্কায় শরীরটা টাল-মাটাল ছিল। স্বভাববিরুদ্ধভাবে অন্যদেরকে ফেলে রেখে আমীর আলী ছাত্রাবাসের পেছনের বড় মাঠের প্রতিদিনের আড্ডা থেকে উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। বাজার পার হয়ে স্কুলের কোণে দেখা পেলাম ফকিরের। আজ এত কাছে পেয়ে সুযোগটা হারাতে চাইলাম না আমি। সে আমাকে দেখে দ্রুত পথ চলতে লাগল, যেন আমার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। আমি প্রায় দৌড়ে ধরলাম তাকে।

'ফকির, শুনে যা।'

সে থামল না। নীরবে দ্রুত পথ চলতে লাগল। আবার ডাক দিলাম তাকে।

'ফকির!'

সে নীরব। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরলাম তার। থেমে গেল সে। ভাষাহীন নিষ্প্রাণ দৃষ্টির অস্তিত্ব টের পেলাম আধো অন্ধকারেও।

আমি বললাম, 'চল আমার সাথে।' প্রায় টেনে নিয়ে চললাম তাকে।

'কোথায়?' মুখ খুলল সে।

'পুকুর ঘাটে।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে তার হাত আঁকড়ে ধরে পথ চলতে লাগলাম আমি। সে নিশ্চুপ রইল বাকি পথটুকু। কিছুক্ষণ পর ঘাটে এসে বসলাম আমরা।

'তোর কী হয়েছে খুলে বল তো আমাকে।' আমার পক্ষে যতটুকু আন্তরিকতা প্রকাশ সম্ভব তার সবটুকুই গলায় ঢেলে প্রশ্ন করলাম তাকে। কিন্তু সে নিশ্চুপ। আমি ছাড়লাম না।

'কোন অসুখ-বিসুখ হলে বল আমাকে। আমি দেখছি কী করা যায়। তুই কোন চিন্তা করিস না।' আশ্বাসের সুরে বললাম আমি। কিন্তু সে নিরুত্তর। তার নীরবতা ধৈর্যহীন করে তুলল আমাকে।

'কী ব্যাপার, কিছু বল!' প্রায় ধমকে উঠলাম আমি।

ধীরে ধীরে নড়ল সে। মুখ তুলে অন্ধকারে ছুড়ে দিল দৃষ্টি। তারপর বলল, 'আমি শ্যাষ হইয়া গ্যাছি।'

তার গলার হাহাকার আমার হৃদয়টায় একটা হ্যাঁচকা টান দিল। আমি ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে তোর? সব খুলে বল আমাকে।'

'না, সে কথা তুই সহ্য করবার পারবি না, আমি শ্যাষ হইয়া গ্যাছি।'

'যত যাই হোক তুই বল আমাকে। যাই ঘটুক সেটা মনে পুষে রাখলে তোর যন্ত্রণা আরও বাড়বে। বরং তুই আমাকে জানালে তোর মনের ভার হয়তো কিছুটা কমে যাবে।' আমি তাকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল সে, 'নারে, আমার সব শ্যাষ। অখন আর মাইনষেরে শুনাইয়া কোন লাভ নাই।'

তার কণ্ঠ থেকে হতাশা যেন ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু আমি বহু দিন পর এমন নিভৃত স্থানে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে আর কিছুতেই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না। মুখ যখন খুলেছে তখন অবশ্যই তার কাছ থেকে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হবে—এমন আশা চেপে ধরল আমাকে। আমি কোমল কণ্ঠে বললাম, 'যা-ই হোক তোর, আমাকে শোনা। কিছু করতে পারলে করলাম। না হলে আর কী, চেষ্টা করতে তো দোষ নাই। নাকি?'

তার জবান খুলে গেল। ফিসফিসে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলে যেতে লাগল তার কথাগুলো। যতই শুনতে লাগলাম স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগলাম আমি। তার সেই কথাগুলো জীবনে কখনোই ভুলতে পারব না আমি। তার সেই না ভুলতে পারা কথাগুলোই এত দিন পর শোনাব আমি নিজের ভাষায়।

ফকির বলতে লাগল, 'মড়ার খুলি কবর থেকে তুলে আনার পর আমি মনে করেছিলাম, এবার বিরাট কিছু হয়ে গেলাম। এই করব, সেই করব আরও কত কিছু! কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, দেখলাম আসলে কিছুই না। কিছুই পাইনি আমি। তখনই তোদেরকে বলেছিলাম সব ভুয়া, সব মিথ্যে। বাজারের ওই ভণ্ডটার ওপর প্রচণ্ড রকম রাগ-ক্রোধ-ক্ষোভ পাগল করে তুলল আমাকে। ক্রোধের তীব্রতা এমনই ছিল যে সেসময় হাতের কাছে পেলে কামড়ে খেয়ে ফেলতাম তাকে। যে লোক এসব গল্প বলে হাজার হাজার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাবিজ-পানিপড়ার ব্যবসা করছে, তার মুখোশটা খুলে দিয়ে প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে তাকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য মনের মধ্যে ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করতে লাগলাম আমি। তাকে খুঁজে বের করার জন্য ঘর ছাড়লাম শেষে। বাজার-ঘাটে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে লাগলাম। এভাবে এক সময় পকেটের পয়সা শেষ হয়ে এল।

কাজ-কর্ম কিছু না করাতে খাবার-দাবারের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। এমনি সময় আকস্মিকভাবে অদ্ভুত একটা সমাধান বের হয়ে এল আমার সামনে।

মড়ার খুলি কবর থেকে তুলে আনার ফলে আর কিছু না পেলেও একটা জিনিস পেয়েছিলাম। কবরের ভয় বলতে কোন কিছু অবশিষ্ট ছিল না আমার অন্তরে। একটা পুরো দিন না খেয়ে ছিলাম। হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা লাশ কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার সময় বুদ্ধি খুলে গেল আমার। রাত গভীর হতেই গোরস্থানে চলে গেলাম। তারপর কিছুক্ষণ পরিশ্রম করে কবরের ওপরের মাটি সরিয়ে বাঁশ-টাশ উল্টে ফেলে কবরে নেমে টান দিয়ে কাফনের কাপড় খুলে নিয়ে এলাম। সেই কাপড় বিক্রি করা টাকায় খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এভাবেই দিন চলতে লাগল আমার। প্রায়ই কোনও না কোনও জায়গায় কেউ না কেউ মারা যায়। আমি খবর পেলেই দেখে আসি কোথায় কবরটা দেয়া হচ্ছে। তারপর রাতেরবেলায় গিয়ে কাফনের কাপড় খুলে নিয়ে আসতে থাকি। কষ্ট করে কবরের মাটি আবার চাপা দিয়ে আসারও প্রয়োজন মনে করতাম না।

বাজারে বাজারে ঘুরতাম। কাফনের কাপড় বিক্রি করা টাকায় দিন বেশ চলে যাচ্ছিল। খাবার-দাবারের কোন চিন্তা নেই। মনের মধ্যে শুধু একটাই চিন্তা নেশার মত পেয়ে বসেছিল, ওই ব্যাটা ভণ্ডটাকে ধরতে হবে। বাড়ি-ঘরের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু কিছু দিন পর নির্মম সত্যটা ধরা পড়ল আমার কাছে। ভণ্ডটাকে ধরার নেশার সাথে অন্য একটা নেশাও পেয়ে বসেছে আমাকে। সেটা হলো গভীর রাতে কবরে গিয়ে কাফনের কাপড়

খুলে আনা। আমি যখন ব্যাপারটা ধরতে পারলাম তখনই ফিরে আসার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সারা দিন খারাপ লাগত। একটা পাপবোধ তাড়া করে ফিরত আমাকে। কিন্তু যখনই কোনও জায়াগায় মৃত মানুষের খবর পেতাম তখনই আমার শরীর ভারী হয়ে আসত। একটা অস্থিরতা গ্রাস করত আমাকে। যতক্ষণ না কাফনের কাপড় খুলে আনতে পারতাম ততক্ষণ আর কিছুতেই অস্থিরতা কাটত না আমার। বাস্তবিকই নেশাটার হাতে পুরোপুরি বন্দী হয়ে পড়েছিলাম আমি।

ধীরে ধীরে আমার স্বভাব পাল্টে যেতে লাগল। ক'দিন পর অনুভব করলাম কাজটার মধ্যে বেশ আনন্দ রয়েছে। রাত-বিরেতে নিকষ আঁধারে নির্জন কবরে গিয়ে সদ্য মৃত মানুষের শরীর থেকে কাফন খুলে আনার আনন্দ। মনের পাপবোধ নষ্ট হয়ে গেল। চিন্তাধারাও পাল্টে গেল। ভাবতে লাগলাম, লাশ তো আজ হোক কাল হোক পচেই যাবে। খামোকা এত সুন্দর নতুন কাপড়টা নষ্ট করে লাভ কী? বরং সেটা আমারও কাজে লাগুক, আবার কিছু গরিব মানুষও সস্তায় কাপড় কিনে পরুক। তাতে তো বরং মানুষেরই উপকার।

এভাবে ভালই দিন কেটে যাচ্ছিল। অন্য কোন কাজ করার দরকার হত না। সারা দিন ঘুরে ফিরে সময় কাটিয়ে দিতাম। যেখানে রাত হত সেখানেই কাত হয়ে শুয়ে পড়তাম। খাবার-দাবারের ভাবনা নেই। শুধু নতুন কোন মৃত্যু সংবাদ পেলেই ছুটে যেতাম সেখানে। তারপর গভীর রাতে আমার কাজ সেরে ফিরে আসতাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। একটা অল্প বয়সী মেয়ে মারা যাওয়ার খবর পেলাম। কীভাবে মারা গিয়েছে

তাতে আমার কোনও মাথা ব্যথা ছিল না। আমার দরকার কাফনের কাপড়। আমি ছুটলাম তার কবরের খবর সংগ্রহ করার জন্য। খবর যোগাড় শেষে আমার আস্তানায় ফিরে এলাম আবার। দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার শরীর ভারী হয়ে আসতে লাগল। গভীর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক সময় রওনা হলাম আমি। তারপর নির্দিষ্ট কবরে গিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নরম মাটি সরাতে বেশি সময় লাগল না। বাঁশ সরানোর সময় হঠাৎ মনে হলো কেমন যেন একটা গোঙানির আওয়াজ পেলাম। মনের ভুল মনে করে আবার কাজে লেগে পড়লাম। অল্প সময়ের মধ্যে বাঁশগুলো সরিয়ে কবরে নেমে পড়লাম আমি। কাফনের কাপড়ে হাত দিতেই আবার শুনতে পেলাম শব্দটা। এদিক-সেদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। কিন্তু তখন অত ভাবার সময় নেই। দ্রুত কাফন খুলে ফেললাম আমি। এমনি সময় হঠাৎ চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল চারদিক। সেই আলোয় দেখলাম অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে আমার সামনে। মেয়েটাকে দেখে কিছুতেই মৃত বলে মনে হলো না। যেন জীবন্ত একটা সদ্য যুবতী মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে মাটির ওপর। হঠাৎ মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার। নিজেকে সংযত করতে পরলাম না আমি। বুকে হাত দিলাম মেয়েটার। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা মানুষের শরীর। অসৎ কামনা প্রবলভাবে বশ করে ফেলল আমাকে। আমি তার শরীরে হাত বুলাতে লাগলাম। এ সময় আমি স্পষ্ট মেয়েটার শরীরের কাঁপন অনুভব করলাম। তার শরীরের কাঁপন আমার হাতের মধ্য দিয়ে আমার শরীরে প্রবেশ করল। ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠলাম আমি।

এত দিনে এই প্রথম ভয় পেলাম আমি। আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে কাফনের কাপড় নিয়ে উঠে পড়লাম কবর থেকে। কবরটা থেকে মাত্র কয়েক ধাপ এগিয়েছি এ সময় একটা জোরালো শব্দে পিছু ফিরতে বাধ্য হলাম আমি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেঁপে উঠল। কবরের পাশে উঠে বসেছে মেয়েটা। সারা শরীরে একটা সুতো নেই। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে যেন আলো বের হচ্ছে তার শরীর থেকে। কিন্তু চোখের জায়গা দু'টোতে চোখের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখান থেকে টকটকে লাল আগুনের লেলিহান শিখা দাউ-দাউ করে বেরিয়ে আসছে। সেই দৃশ্য আমার সমস্ত সত্তা গ্রাস করল। ভয়ের অনুভূতি কী কখনও সত্যিকারভাবে বুঝিনি। কিন্তু সে মুহূর্তে এত ভয় কোত্থেকে আমার সমস্ত অস্তিত্বে এসে বাসা বাঁধল আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল আমার। মেয়েটা পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, 'তুই এই কবরবাসীদের সামনে আমাকে যেভাবে বেইজ্জত করলি, তোকেও আল্লাহ্‌পাক সেভাবে বেইজ্জত করবে।'

কাফনের কাপড় ফেলে দৌড় দিলাম আমি। কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না। এক সময় খোলা একটা জায়গায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম তা-ও জানি না। চোখ খোলার পর দেখলাম দিনের আলো চারদিকে। কিছু মানুষ ভিড় করে দেখছে আমাকে।

ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মানুষজন ধরাধরি করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে সুস্থ হলাম ঠিকই, কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। মেয়েটার সেই কথাগুলো অনবরত কানে বেজে চলেছে আমার। প্রতিটা মুহূর্ত মেয়েটার ভয়ানক চোখ দু'টো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে।

তার কথা শুনতে শুনতে কখন যে আমি ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম নিজেই জানি না। পরে যখন ঘোর ভাঙল ফকিরকে দেখলাম না সামনে। অনেক রাত হয়েছিল। ঘোরের মধ্যে কোন রকমে নিজেকে হিঁচড়ে নিয়ে এলাম বাসায়। বিছানায় পড়ে গেলাম কয়েক দিনের জন্য।

আমার সাথেই সম্ভবত ফকির শেষ কথা বলেছিল। এরপর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। বহুদিন পর শুনেছিলাম সে মাজারে-মাজারে ঘুরে বেড়ায়। তার কথাগুলো আমাকে জানিয়ে তার মনের ভার কিছুমাত্র লাঘব হয়েছিল কি না, কিংবা প্রতিটি মুহূর্ত বয়ে বেড়ানো ভয়ানক অবস্থা থেকে বিন্দুমাত্র মুক্তি মিলেছিল কি না জানি না। তবে আমার মনের ওপর দুঃসহ বোঝার মত চেপে বসা তার কথাগুলো অনেক দিন পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হয়েছে আমাকে। সেই বোঝাটা আমার নিজের জন্য নয়, ফকিরেরই জন্য।

হাসানুজ্জামান মেহেদী

অন্য ভুবন

নতুন জায়গায় অপালার ঘুম আসে না। সে শুধুই এপাশ-ওপাশ করছে। পাশে জহির নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। ভাবতেও কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে, শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়েটা হয়েই গেল। তারা পালিয়ে বিয়ে করেছে। এ ছাড়া অবশ্য অন্য কোন উপায় ছিল না। অপালা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে। অন্য 'একটা' উপায় থাকলেও অপালা বের করে ফেলত। একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করে অপালা হয়তো বা ভুল করেছে। তবে বড় কোন ভুল নিশ্চয়ই না। অপালা কখনও বড় কোন ভুল করে না। অপালা এবার ঘুরে জহিরের দিকে তাকাল। নিষ্পাপ একটা মুখ। ছেলেদের এমন নিষ্পাপ মুখ মানায় না।

আজ দুজনকেই দারুণ ঘুরতে হয়েছে। পছন্দ মত ঘর কোথাও পাচ্ছিল না। পেলেও ভাড়া খুবই বেশি। অপালা অবশ্য বেশ কিছু টাকাও এনেছে, কিন্তু শিগ্‌গিরই এগুলো খরচ করতে রাজি নয়। শেষপর্যন্ত নামমাত্র ভাড়ায় এ বাড়িটা পেয়েছে। চমৎকার একটা একতলা বাড়ি। ছাদে চিলেকোঠা আছে। পেছনে বাগান। বাগান না বলে জঙ্গল বললেই বোধহয় ভাল হবে। সামনে বিশাল উঠান। পাশে আর একটা ছোট ঘরে বাড়িওয়ালা থাকেন। বাড়ির সীমানা বিশাল। মফস্বলে হলেও বাড়ির ভেতরের পরিবেশ গ্রামের মত। অতিরিক্ত রকমের নির্জন। নির্জনতা অবশ্য

অপালার ভাল লাগে।

সারাদিন অতিরিক্ত রকম ঘোরায় দু'জনেই ক্লান্ত। জহির গোসল করে সামান্য কটা নাকে মুখে গুঁজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু অপালার মোটেই ঘুম আসছে না। সে নীরবে রাতের গুটি গুটি পায়ে আসার শব্দ পাচ্ছে। এ শব্দ নির্জনতার শব্দ। অনুভব করে নিতে হয়। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো প্রবেশ করছে। ভেন্টিলেটর চুইয়ে আলো পড়ছে জহিরের গালে। অপালা আলতো করে জহিরের গালের জোছনাটুকু স্পর্শ করল। কোথা থেকে যেন হাস্নাহেনা ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ আসছে। নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও হাস্নাহেনার ঝাড় আছে। হঠাৎ ছাদে 'থপ' করে যেন শব্দ হলো। সমস্ত নির্জনতাকে ছাপিয়ে কানে বড় বেশি বাজল শব্দটা। অপালা চমকে উঠেছে। ভয় অবশ্য পায়নি সে। অপালা মোটেও ভীতু নয়। এবার শব্দটা প্রায়ই হচ্ছে। থেকে থেকে হচ্ছে থপ, থপ, থপ...। অপালা আলতো করে জহিরকে ঠেলা দিল। জহির উঠল না। শুধু অন্যপাশে ঘুরে গেল। অপালাও আর জাগাল না। ঘুমাক না মানুষটা। বড্ড ক্লান্ত সে। শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে থেমে আছে। অপালা ভাবছে কী হতে পারে? চোর নিশ্চয়ই না। চোর হলে এমন শব্দ করত না। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অপালা উঠে এল। বাথরুমে যেতে হবে। বাথরুম থেকে এসে ইচ্ছা হলো একবার ছাদ থেকে ঘুরে আসতে। বারান্দা থেকে উঠে গেছে ছাদের সিঁড়ি। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল।

ছাদে উঠে প্রথমেই চোখ গেল চাঁদের দিকে। থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। আচমকা তার দৃষ্টি চলে গেল ছাদের কোণে। চাঁদের রূপালী আলোয় রূপালী একটা ছায়া চোখে পড়ল। কুকুরের মত কিছু একটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ভাল করে

লক্ষ করতে বোঝা গেল ওটা একটা মানুষ। সম্পূর্ণ নগ্ন একটা পুরুষ মানুষ। এই প্রথম খুব বড় ধরনের ভুল করল অপালা।

দুই

এই মুহূর্তে মাহফুজ সাহেবকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাঁর সামনে দুটি ছেলে-মেয়ে বসে আছে। ছেলেটির নাম জহির, মেয়েটির অপালা। তারা এসেছে বাসা ভাড়া নিতে। তিনি বাড়ির সামনে কোথাও 'টু-লেট' অথবা 'বাসা ভাড়া'-র সাইনবোর্ড লাগাননি। তবু এরা যেন কোথা থেকে খবর পেয়েছে তাঁর একটা খালি ঘর আছে। খালি ঘর একটা আছে সত্যি। দু'রুমের ছোট্ট একটা ঘর। তবে সেটা ভাড়ার জন্যে নয়। এ ঘরটা তিনি কাউকেই ভাড়া দেন না। মাহফুজ সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। 'দেখুন, আমার একটা খালি ঘর আছে সত্যি। তবে ওটা ভাড়া দেওয়া হয় না। আমায় মাফ করবেন।'

'আচ্ছা,' বলে হাসি দিল দম্পতি। বুকটা ধক করে উঠল তার। মেয়েটার হাসিটা তার বুকে বড্ড বেশি বিঁধল। মেয়েটার বাঁ গালে গভীর একটা টোল পড়েছে। তাঁর মেয়েরও এমন টোল পড়ত। যে মেয়ের জন্যে খুন করতেও তাঁর সামান্য হাত কাঁপেনি। সামান্যও না। তিনি দম্পতির হাতে একটা চাবি ধরিয়ে দিলেন। 'যেদিন খুশি সেদিন উঠতে পারেন আপনারা।'

তিন

এই ঘরটাতেই থাকতেন তাঁরা। তিনি আর তাঁর ছোট্ট আদরের মেয়ে নীলা। মা মরা মেয়েটাকে তিনি বড্ড বেশি ভালবাসতেন। উপরের চিলেকোঠায় থাকত এক হুজুর। নুরানী চেহারা, মুখে চাপ দাড়ি। হুজুরকে তিনি রেখেছিলেন মেয়েকে আরবী পড়ানোর জন্যে। সেদিন ঘুণাক্ষরেও তিনি ভাবতে পারেননি এই সুন্দর চেহারার হুজুর এমন সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। এমন ভয়ঙ্কর একটা দিন ডেকে আনতে পারে।

সেদিন কী একটা কাজে বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। পোষা কুকুরটা গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল উঠানে। কুকুরটাকে কয়েকদিন হলো নীলা কোথা থেকে যেন নিয়ে এসেছে। হুজুর একেবারেই দেখতে পারে না কুকুরটাকে। নীলা ঘরেই ছিল—হুজুর পড়াচ্ছে। তিনি বাজারে চলে গেলেন।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই তাঁর বুকে একটা ধাক্কা লাগল। উঠানে পড়ে রয়েছে হুজুর। সারা শরীর রক্তাক্ত। আঁচড়, কামড়ের দাগ। কুকুরটা আশপাশে কোথাও নেই। তিনি জলদি ঘরে ঢুকলেন। অশুভ আশঙ্কায় কাঁপছে বুক। যার জন্যে আশঙ্কা, ঘরে ঢুকে প্রথমেই তার দেখা পেলেন। সিলিং থেকে ঝুলছে তাঁর মেয়েটা; নগ্ন! তাঁর আদরের মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। পাশেই বসে রয়েছে ধবধবে সাদা কুকুরটা। সারাগায়ে ছোপ ছোপ রক্ত। কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে ওটা।

পুরো ঘটনা বুঝতে তাঁর কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। তিনি প্রথমে ঘর থেকে বড় রামদা'টা নিয়ে বের হলেন। তারপরে ধীরে সুস্থে জবাই দিলেন হুজুরকে। ওটা আসলে একটা জানোয়ার। পাশে বসা জানোয়ারটার থেকেও কুৎসিত ওটা। জানোয়ারটা অবশ্য এমনিতেও বাঁচত না। তবু তিনি প্রতিশোধ নিলেন। তারপর ওটাকে নিয়ে কবর দিলেন পিছনের জঙ্গলে। পুরো ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল অবলা জানোয়ারটা।

যথাসময়ে পুলিশ এল। পুলিশকে বোঝাতে মোটেও কষ্ট হলো না শয়তানটা তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করে পালিয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি উঠানটা ধুয়ে ফেলেছেন। কুকুরটাকেও গোসল করিয়েছেন। পুলিশ কোনও ঝামেলার সৃষ্টি করল না। কয়েক দিনের ভেতরেই ব্যাপারটা শান্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে তিনি ঘরটা পাল্টালেন। পাশেই নতুন একটা ঘর তুলে থাকতে শুরু করলেন। মেয়েটার স্মৃতি তাঁকে খুব যন্ত্রণা দেয়। মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায়। তখন তিনি মেয়েটার জন্যে কাঁদেন। মাঝে মাঝে জঙ্গলের দিকে তাকান, যেখানে শয়তানটাকে কবর দিয়েছেন। তিনি আসলে ওটাকে পুঁতে ফেলেছেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ একা। তাঁর সাথে আছে শুধু কুকুরটা।

আজ হঠাৎ করে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি খেলেন। আচমকা তাঁর দৃষ্টি চলে গেল জঙ্গলে—যেখানটায় শয়তানটাকে পুঁতে ফেলেছেন। কুকুরটা ওখানে বসে কী করছে! তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। কোন রকম সাক্ষী বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তিনি রামদা'টা আবার তুলে নিলেন।

মাহফুজ সাহেব পা টিপে টিপে ওখানটায় চলে গেলেন। গিয়ে

যা দেখলেন তা দেখার জন্যে তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। কুকুরটা পচা-গলা মাংস প্রায় সব সাবাড় করে দিয়েছে। এখন হাড় চিবুচ্ছে। একটা কুকুর এতবড় একটা দেহ কেমন করে খেল মাহফুজ সাহেবের মাথায় ঢুকল না। তিনি শুধু দা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একটু পরে জায়গাটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি কুকুরটাকেও একই জায়গায় পুঁতে ফেললেন। কুকুরটা প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছিল। শুধুমাত্র একটা হাত বাকি ছিল। শয়তানটার একটা হাতে চারটে আঙুল ছিল। ওই হাতটা বেঁচে গেছে। কুকুরটার পেটটা অসম্ভব রকম ফুলে উঠেছিল। পুঁতে ফেলতে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে তাঁকে।

চার

অপালা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মানুষটার দিকে। কেমন যেন নড়ে উঠল মানুষটা। না, এটা তো মানুষও না। ঘুম থেকে জেগে উঠেছে ওটা। কুকুর ঘুম থেকে উঠে যে ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙে—অনেকটা বুকডন দেওয়ার মত, ঠিক তেমন একটা অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙল পশুটা। ওটার সারাদেহই মানুষের। শুধুমাত্র দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কুকুরের। এমন, যেন কোন কুকুরকে মানুষের ত্বক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। সারাদেহে একটাও লোম নেই। কোমল ত্বক। হাত-পায়ের গঠনও মানুষের মত। শুধুমাত্র ভঙ্গিটা কুকুরের। মুখভর্তি দাড়ি। সুশ্রী চেহারা। জিভ বের

হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে বড় জিভটা। ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মুক্তার মত দু'ফোঁটা লালা দেখা গেল জিভে। চিক চিক করছে চাঁদের আলোয়। পশুটা অনেক কাছে চলে এসেছে অপালার। হঠাৎ অপালা বুঝতে পারল তার দৌড় দেওয়া দরকার। কিন্তু পা দুটি অবশ হয়ে গেছে। নাড়ানো অসম্ভব। সে চিৎকার দেওয়ার চেষ্টা করল। সামান্যতম শব্দও বের হলো না। আচমকা পশুটা দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফ দিল। সামনের দু'হাত প্রসারিত করল—মানুষের মত। অপালাকে নিয়ে পড়ে গেল ওটা। অপালার অনুভূতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। শুধু দুটো জিনিস অনুভব করল সে। তার গাঢ় লালরঙা শাড়িটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে—মায়ের শাড়ি। আর পশুটার একহাতে চারটা আঙুল। চাঁদের ফিনকি দেয়া আলোয় ধর্ষিতা হলো অপালা।

পাঁচ

অপালাদের বিয়ের বয়স প্রায় একবছর হতে চলল। তার সন্তান হবে। জহির বাজারে গেছে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আনতে। কয়েকদিন পরে অপালা হাসপাতালে ভর্তি হবে। জহির বেশ আনন্দেই আছে। ওই ঘটনার পরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। জহির খুব ভাল একটা চাকরি পেয়েছে। বাবা-মাও বিয়েটা মেনে নিয়েছে। জহিরের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তাই সে অপালাকেই অনেক বেশি আঁকড়ে ধরেছে—যেমন করে স্বর্ণলতা আঁকড়ে ধরে বড় কোন বৃক্ষকে। ওইদিন কেমন করে নীচে এসেছে অপালা, তা

তার পক্ষে বলা সম্ভব না। ঘটনাটা সে কাউকে জানায়নি। শুধুমাত্র বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিল—দাড়িওয়ালা কাউকে চেনে কি না। সে সরাসরি বলে দিয়েছে চেনে না। তবে তার থমথমে মুখ দেখে অপালা সহজেই বুঝে গিয়েছে দাড়িওয়ালা লোকটাকে বাড়িওয়ালা চেনে অথবা চিনত। চিনত একারণে বলা; ওটাকে অপালা আর কোনও দিন দেখেনি। ছাদে অনেকদিন একা গিয়েছিল, তবু দেখেনি। অপালার প্রচণ্ড ইচ্ছে ওটার সঙ্গে আর একদিন কথা বলবে। ওটার সঙ্গে তার কথা বলা বড্ড দরকার।

ছয়

অপালা হাসপাতালে আছে। সে প্রচণ্ড প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। ডাক্তাররা অপারেশনের প্রস্তুতি নিয়েছেন। একটু বাদেই তার অপারেশন হবে। অপারেশন কক্ষে যাওয়ার আগে অপালা জহিরকে শুধু একটা কথাই বলল, 'আমি তোমাকে এক সমুদ্র ভালবাসি।' জবাবে জহির মৃদু একটা চাপ দিল অপালার হাতে।

অপারেশন প্রায় শেষ পর্যায়ে। অপারেশন করছেন ডাক্তার ফিরোজ আহম্মেদ। নামকরা গাইনোকোলজিস্ট। তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে বের করে আনলেন শিশুটিকে। রোগী অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করেছে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই হয়তো বা সে চলে গেছে অন্য এক ভুবনে। ডাক্তার সাহেবের তেমন দুঃখবোধ হলো না। তবে তিনি কেমন যেন মমতা অনুভব করছেন শিশুটার জন্য। শিশুটার পিঠে ছোট্ট একটি থাবড়া দিলেন তিনি। দেবশিশুর

মত চেহারা শিশুটির। শিশুটি সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে কেঁদে উঠল। এ তো এ জগতের কান্না নয়। অন্য কোনও ভুবনের কান্না। কুকুর শিশু যেমন করে কাঁদে ঠিক তেমন—কেঁউ, উঁ...উঁ...উঁ...।

এই মুহূর্তে সবাই তাকিয়ে আছে কুকুরছানার মত গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকা শিশুটির দিকে...

রাসেল আহমেদ

মৃত্যুখেলা

এক

দি নিউ মোতালেব ম্যাজিক অপেরার স্বত্বাধিকারী মোঃ আব্দুল মোতালেব খন্দকার ইজি চেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। আজকে সে তিন পেগ হুইস্কি পান করে মদপান বিরত রাখল। সে সবসময় দু-পেগ-এর বেশি পান করে না। কিন্তু আজ বিদেশি হুইস্কি পেয়ে একপেগ বেশি খেয়েছে। আরও পান করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু করল না।

মোঃ আব্দুল মোতালেব খন্দকার অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। প্রতিদিন নিয়ম করে দুবার মদ খায়, কিন্তু কখনও মাতাল হয় না। মাতাল হলে মন দুধের মত ধবধবে সাদা হয়ে যায়। অজান্তেই মনের সব গোপন কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যায়। সে চায় না তার মনের কথা কেউ জেনে যাক।

এখনও পেগের পর পেগ গলায় ঢালছে সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী। সে অত্র এলাকার সংসদ সদস্য। মোতালেব খন্দকারের সাথে তার আগেই পরিচয় ছিল। সে প্রায় বারো বছর আগের কথা। বারো বছর পর দুজনের আবার দেখা। দুজনেই বদলে গেছে।

'মতু মিয়া, মাল খাও না ক্যান? তোমার লাইগ্যা ঢাকা থেইক্ক্যা স্পিশাল মাল আনাইছি।' জড়ানো গলায় বলল সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

কুত্তার বাচ্চার কত্ত বড় সাহস আমারে মতু মিয়া কয়! শালার পুত আমার নাম মোঃ আব্দুল মোতালেব খন্দকার। দশ বছর আগেই আমার নাম মতু মিয়া থেকে মোঃ আব্দুল মোতালেব খন্দকার হয়েছে। মনে মনে কথাগুলো বলল মোতালেব খন্দকার। জোরে বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একজন সংসদ সদস্যের ক্ষমতা অনেক।

'কী মতু মিয়া, রাগ করলা নি? মতু মিয়া থেইক্ক্যাই তো মোতালেব খন্দকার হইছো! রাগ কইরো না। এই আমারে দেহো আমি ছুরাপ থেইক্ক্যা সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী হইছি। যখন মেম্বার হইলাম তখন ছুরাপ থেইক্ক্যা সোহরাব চেয়ারম্যান হইবার পর সোহরাব উদ্দিন, এম পি হইবার পর মোঃ সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী হইয়্যা গেলাম। আমারে কেউ ছুরাপ কইলে রাগ করি না। বাপ-মা নাম দিছে হেই নামে ডাকলে রাগ করুম ক্যান? মাল খাও না ক্যান? তোমার লাইগ্যা ঢাকা থেইক্ক্যা স্পিশাল মাল আনাইছি। হিঃ হিঃ হিঃ।' আবারও জড়ানো গলায় বলল সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

কুত্তার বাচ্চা কুত্তা পুরো মাতাল হয়ে গেছে। এক কথা বারবার বলছে। আমার জন্য মাল এনে নিজেই বোতল খালি করে দিচ্ছে। ইচ্ছে করছে পোঁদে লাথ মেরে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে।

'মতু মিয়া, তোমার ফুলমতির কথা মনে আছে?' ফুলমতির কথা বলতেই মোতালেব খন্দকার চারদিকে দৃষ্টি বোলাল। না, কেউ নেই। কুকুরের বাচ্চার মন দুধের মত সাদা হয়ে গেছে। বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে।

'ফুলমতির মত আর খাই নাই। কত্ত ... খাইলামরে মতু, কিন্তু ফুলমতির মত সোয়াদ আর পাইলাম না। মাগীরে কত্ত কইলাম

তোরে বিয়া কইরা রাণী বানাইয়া রাখমু। মাগী কী কয় জানো! কয় আমার মত লুইচ্চ্যার লগে বিয়া বইবো না! মাগী বারো ব্যাডার লগে রাইত কাটাইবো, তবুও আমার লগে বিয়া বইবো না। মতু আমারে তুই মাল দে। এক্কেবারে ফুলমতির মত মাগী দিবি। অনেক কষ্টে আছিরে মতু, তুই বুঝবি না...কষ্ট...ভাইসব আমারে ভোট দিলে...'

শুয়োরের বাচ্চা এখানে এসে মাতলামি শুরু করেছে। আপদটাকে বিদায় না করলে কপালে খারাবি আছে। শালা বেকুব। মাল খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলেছে। এটা তোর বক্তৃতা দেবার মঞ্চ না। পাবলিকে কেন যে তোরে ভোট দিছে! বেকুব...সব বেকুব। মোতালেব খন্দকার বাইরে এসে সোহরাব উদ্দিনের বডিগার্ড ও তার চাকরকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল আপদ নিয়ে কেটে পড়ো।

দুই

মোতালেব খন্দকারের মস্তিষ্কের নিউরোন কোষগুলো বারবার ফুলমতির স্মৃতি উগরে দিচ্ছে। সে বারবার চাচ্ছে ফুলমতির কথা ভুলে যেতে। কিন্তু পারছে না। অবশেষে মস্তিষ্কের জয় হলো।

বারো বছর আগে...এই ঠিক এখানে। তখন ছিল সোনাপুর হাই স্কুল আর এখন সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুল মাঠে শো করতে আসে জোসনা ম্যাজিক অপেরা। মোতালেব খন্দকার তখন সবে এই অপেরাতে যোগ দিয়েছে। সামান্য কয়েকটা হাতের খেলা দেখাত।

জোসনা ম্যাজিক অপেরার মালিক চান মিয়া তার একমাত্র

মেয়ে জোসনার নামে অপেরার নাম রাখে। চান মিয়া ভয়ংকর সব খেলা জানত। মানুষ কেটে দু-টুকরো করত, পেট দিয়ে তরোয়াল ঢুকিয়ে পিঠ দিয়ে বের করত।

মোতালেব খন্দকার তখনকার মতু মিয়া অপেরাতে ঢুকেই বুঝতে পারল এখানে যে যত ভয়ংকর খেলা দেখাতে পারে তার তত সুনাম এবং টাকা। মতু মিয়া চান মিয়ার সাথে ভাল ব্যবহার করত যাতে করে চান মিয়া খুশি হয়ে তাকে খেলা শিখিয়ে দিত। মতু মিয়া এতে সন্তুষ্ট হত না, কারণ তার ওস্তাদ খুব ধীরে ধীরে তাকে খেলা শেখাত। সে চাইত দ্রুত শিখতে। মতু মিয়া ছাড়াও অপেরাতে আরও জাদুকর ছিল। কিছু মেয়ে ছিল। সবাই খেলা দেখাত।

প্রথম শো-তে উপস্থিত ছিল তখনকার মেম্বার সোহরাব। ফুলমতিকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে যায়। ফুলমতি ছিল সব মেয়ের থেকে আলাদা। খদ্দের পছন্দ না হলে ডাবল টাকা দিলেও লাভ হত না।

মেম্বার সোহরাবকে দেখে ফুলমতি তার সাথে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। সোহরাব মেম্বার পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইলেও ফুলমতি রাজি হলো না। পাঁচ হাজার টাকা তখন মতু মিয়ার কাছে অনেক।

দিনে মতু মিয়া সোহরাব মেম্বার-এর কাছে গেল।

'কী চাও?' বলল সোহরাব মেম্বার।

'ছার, আমি জাদুকর। জোসনা অপেরায় জাদু দেখাই।'

সোহরাব মেম্বার বুঝতে পারল। সবাইকে বিদায় করে দিয়ে মতু মিয়ার সাথে একাকী বসল।

'তোমার নাম কী?'

'মতু মিয়া।'

'ফুলমতি কি রাজি হইছে?'

'জ্বে না, তয় আমি রাজি করামু। রাজি না হইলে দুইডা লোক দিবেন রাইতে উডাইয়্যা আনমু।'

সোহরাব মেম্বার খুশি হলো। সে বুঝতে পেরেছে এই লোক দিয়ে কাজ হবে। দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ওই লিকলিকে দেহটার জন্য সে পাগল হয়ে আছে।

'মাগীটার দেমাগ দেহো! পাঁচ হাজার টাহ্যা দিবার চাইলাম তয়ও রাজি হইলো না। মতু মিয়া, আমার চেহাড়াডা কি বেশি খারাপ? খারাপ হইলেই কি, মাগীরে কি মাগনা...টাহ্যা দিমু না!'

'মেম্বার ছাব, টাহ্যা কিন্তু আমার হাতে দিতে হইবো।'

'আরে দিমুনে। তোমারেই দিমু। এখন দুই হাজার টাহ্যা লইয়া যাও।'

মতু মিয়া সেদিনের পর থেকে ফুলমতিকে রাজি করানোর অনেক চেষ্টা করে। ফুলমতি রাজি হয় না। মতু মিয়া তবুও চেষ্টা করে। ফুলমতি মুখ ঝামটা মেরে বলে, 'অ্যাই ব্যাঢা, ওই লুইচ্চ্যাটার লাইগ্গ্যা তোর এত পোড়ানি কিয়ের। বেশি তেড়িবেড়ি করলে মালিকরে কইয়্যা দিমু।'

এরপর থেকে মতু মিয়া ফুলমতিকে আর ঘাঁটায়নি। তিন দিন পর সোহরাব মেম্বারের সাথে মতু মিয়ার দেখা।

'মতু মিয়া, আমি আর সইবার পারতাছি না। আমার টাহ্যা ফেরত দাও। তোমারে দিয়া আমার কাম হইবো না।'

'মেম্বার ছাব, আইজক্যাই মাগীরে তুইলা আনমু। রাইতে দুইডা জোয়ান লোক পাডাইয়্যা দিয়েন।'

কাজটা খুব সহজেই হয়ে গেল। শো শেষ করে সবাই গভীর রাতে ঘুমাতে যায়। সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দে কারও ঘুম ভাঙলো না। মেম্বার যে লোক দুইটা দিয়েছিল তারা অনায়াসে ফুলমতিকে

তুলে মেম্বারের কাছারি ঘরে নিয়ে গেল। কাছারি ঘরের আশপাশে বাড়িঘর নেই।

ভোররাতের দিকে মেম্বার এবং তার অনুগত লোকজন মিলে ফুলমতিকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। এক সময় ফুলমতি অজ্ঞান হয়ে গেল। এরপর মতু মিয়ার পালা। অজ্ঞান অসাড় দেহটা নিয়ে সে যা ইচ্ছে তাই করল। শেষে গলা টিপে হত্যা করে মেম্বারকে জানাল ফুলমতি মারা গেছে। মেম্বার ফুলমতির প্রাণহীন দেহটাতে ইঁট বেঁধে পাশের পুকুরে ফেলে দিল। সে জানে পুকুরের মাগুর মাছগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফুলমতির দেহটা খেয়ে ফেলবে।

পরের দিন সকালে ফুলমতিকে না পেয়ে সবাই ভাবল সে পালিয়েছে। কারণ আগেও সে দুবার পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ফুলমতির বদলে খেলা দেখাতে লাগল চান মিয়ার মেয়ে জোসনা।

দু বছরের মধ্যেই পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে চান মিয়ার কাছ থেকে সব খেলা শিখে ফেলল মতু মিয়া। ওস্তাদ মারা যাবার আগে অপেরা এবং তার মেয়ে জোসনার দায়িত্ব মতু মিয়ার কাছে দিয়ে গেল। কয়েক মাস পরেই অর্ধেক কাটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে জোসনার ভবলীলাও সাঙ্গ হলো। অপেরা এবং নিজের নাম বদলে আজকে সে মোতালেব ম্যাজিক অপেরার মালিক মোঃ আব্দুল মোতালেব খন্দকার।

তিন

মোতালেব খন্দকারের মুখটা হাসি খুশি দেখাচ্ছে। বিকেলের আগেই সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। আজকের শো ভালভাবে

জমাতে পারলে আগামীকাল টিকেটের বিক্রি দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সোহরাব চৌধুরীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খসানোর প্ল্যান করে রেখেছে।

সন্ধ্যার পর শো শুরু হয়ে গেল। প্রথমদিকে আজেবাজে খেলা দেখানো হয়।

আজকের শো তেমন ভাবে জমল না। দশ বছরে যে ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি তা আজ ঘটে গেছে। শান্তা নামের মেয়েটি দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার খেলা দেখায়। আট বছর ধরে সে এ কাজটি করে আসছে। আজকে সে পড়েই যাচ্ছিল। কোনওরকমে ঝুলে ছিল। নীচে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু।

তা ছাড়া রহমত মোতালেব খন্দকারের অপেরাতে যোগ দিয়েছে প্রায় দশ বছর হলো। শান্তাকে কাঠের বোর্ডের সাথে দাঁড় করিয়ে বিরানব্বইটা ছুরি ছোঁড়ে সে। ছুরিগুলো শান্তার গা ঘেঁসে কাঠের বোর্ডের ভিতরে গেঁথে যায়। আজকে কেন জানি তার নিশানা ব্যর্থ হয়ে শান্তার হাতের তালু ভেদ করে বোর্ডে গাঁথে।

মোতালেব খন্দকার চিন্তিত। সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী না থাকলে উত্তেজিত জনতা তার অপেরার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল প্রায়। উত্তেজিত জনতাকে সে খুব সহজেই শান্ত করে ফেলে।

'মোতালেব মিয়া, চিন্তা কইরো না। গ্রামের লোক আমার উপরে কথা কইবো না। কালকের শোখানা ভাল কইরো। এহন আমারে যে একখানা উপকার করতে হইবো।'

'বলেন কী করতে পারি।' যদিও মোতালেব খন্দকার জানে সোহরাব উদ্দিন চৌধুরীর জন্য কী করতে হবে।

'বেকুব হইবার ভান করো ক্যা? তুমি বোঝো না আমি কী চাই! শান্তারে ভালা কইরা দেখছো? এক্কেরে ফুলমতির লাহান! ও মতু মিয়া আমার কী হইলো। হেরা তো দড়ির উপরে দিয়া হাঁটে

না, হাঁটে আমার দিলের উপরে দিয়া। হাইটা যাওনের সময় আমার দিলডারে ছেদাবেদা কইরা দেয়। হাঃ হাঃ হাঃ...'

'মেয়েটা তো অসুস্থ। হাতের দু পিঠে দশটা সেলাই। অন্য মেয়ে নিয়ে যান। শান্তার ছোট বোন আছে। দেখতে ওর মতই। ওকে নিয়ে যান।' হাসিমুখে বলল মোতালেব খন্দকার। মনে মনে অশ্লীল গালি দিল সোহরাব উদ্দিন চৌধুরীকে।

'দুধের সোয়াদ কি আর ঘোলে মিডে! মিডে না! আমার শান্তারেই লাগবো। দশ হাজার দিমুনে।'

'না, টাকা কোনও ব্যাপার না। মেয়েটা অসুস্থ। ও রাজি হবে না।'

'পোনরো হাজার।'

'ওকে বলে দেখি পারবে কি না।'

'কিচ্ছু কওন লাগবো না পুরা বিশ দিমু। ট্যাহা তো কব্বরে নিমু না। বাইচ্চা থাকতে থাকতে একটু মউজ কইরা লই।' আবারও কুৎসিত হাসিতে ফেটে পড়লো সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

মনে মনে একটু খুশি হলো মোতালেব খন্দকার। দু-হাজার টাকায় যেখানে কাজ হয় সেখানে বিশ হাজার অনেক বেশি। দশ গুণ। শান্তাকে পাঠিয়ে দিল সে। শান্তা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু ভাবল টাকার কথা শুনে রাজি হয়েছে। মোতালেব খন্দকার প্রথমবারের মত লক্ষ করল শান্তার চেহারা ফুলমতির মত। হ্যাঁ, চোখজোড়া তো একদম এক।

চার

আজকেও সব টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। মোতালেব খন্দকার

সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে যাতে আর কোনও ভুল না হয়। তা ছাড়া আজ সে নিজেই খেলা দেখাবে।

সন্ধ্যার পর শো শুরু হয়ে গেল। মোতালেব খন্দকার একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের বারান্দার কাছে আসল। বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগুতেই সে দেখতে পেল সাদা শাড়ি পরিহিতা নারী মূর্তি।

'কে ওখানে?' বলল মোতালেব খন্দকার। নারী মূর্তিটি যেন কিছুই শুনতে পায়নি। আবারও চিৎকার করল মোতালেব খন্দকার। এবার নারী মূর্তি ঘুরে দাঁড়াল। মোতালেব খন্দকার চমকে উঠল। আবছা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল ফুলমতি দাঁড়িয়ে আছে।

জীবনে প্রথমবারের মত ভয় পেল মোতালেব খন্দকার। অস্পষ্ট ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'ফু...ফুল...ফুলমতি!'

'আমারে চিনছোস মতু। বড্ড জ্বালা রে...প্রতিশোধ নিমু...কাওরে ছাড়মু না। বারো বছর তোর লাইগ্যা পথ চাইয়া আছি। হাঃ হাঃ হাঃ। কাউরে ছাড়মু না...' যেন দূর থেকে কেউ কথাগুলো বলছে।

মোতালেব খন্দকার ইতিমধ্যে দৌড়াতে শুরু করেছে। তাঁবুর ভেতর এসে সে হাঁপাতে লাগল। দু-পেগ কড়া হুইস্কি পান করে সব ভুলতে চাইল।

আজ খুব সহজ একটা খেলা দেখানো শুরু করল মোতালেব খন্দকার। একটা লম্বা বাক্সের ভিতর শান্তার ছোট বোনকে ঢুকানো হলো। বাক্সের ভিতর থেকে দুটো শব্দ এল। শব্দগুলো খুব মৃদু যা দর্শকদের কান অবধি পৌঁছাল না। শব্দগুলোর অর্থ হলো, বাক্সের ভিতরে থাকা বোতাম টিপে বাক্সের অন্যপাশে

পৌঁছে যাওয়া।

মোতালেব খন্দকার জাপানী সামুরাইগুলো বাক্সের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সাত নাম্বার সামুরাই প্রবেশ করানোর সময় ভিতর থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। সেই সাথে রক্তের মত লাল এক ধরনের পদার্থ। দর্শকেরা যেন দম নিতে ভুলে গেছে। কেউ কোনও শব্দ করছে না। মোতালেব খন্দকার মনে মনে হাসছে। শো সবে জমছে।

সামুরাইগুলো বের করে বাক্সের দরজা খুলতেই রক্তাক্ত লাশটা ধপাস্ করে মঞ্চে পড়ল। দর্শকেরা চিৎকার করে উঠল। মোতালেব খন্দকার নিজেও বিস্মিত হলো। এমনটি হবার কথা নয়! সে বুঝতে পারল বাক্সের অন্য পাশে না সরে যাওয়ার ফলে এমনটি হয়েছে।

তা হলে শব্দ করল কে?

মোতালেব খন্দকার ভয়ে কাঁপছে। এমন সময় লাইট বন্ধ হয়ে গেল। দর্শকেরা চিৎকার করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর লাইট জ্বলল। লাশটা ধীরে ধীরে উঠে বসল। দর্শকেরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সবাই হাত তালি দিতে লাগল। কেউ বুঝতে পারল না একজন খুন হয়ে গেছে।

অন্ধকারে লাশটা সরিয়ে ফেলে সেখানে শান্তাকে রাখা হয়েছিল। দুজনের প্রায় একই চেহারা। তা ছাড়া একই পোশাক থাকার কারণে কেউ চিনতে পারেনি। ম্যানেজারের এই দ্রুত সিদ্ধান্তে মোতালেব খন্দকার খুশি হলো।

শো শেষ করে শান্তার কান্না থামানোর চেষ্টা করল মোতালেব খন্দকার। হাজার হলেও ছোট বোন তাই অঝোরে কাঁদছে শান্তা।

'দেখ, ভুলটা করেছে তোর বোন। আমার কোনও দোষ নেই। কাঁদিস না, তোরে বিশ হাজার টাকা দিব।'

'কী মতু মিয়া, মাইয়াডারে শ্যাষ কইরা দিলা। তুমি মিয়া খুব নিঠুর।' বলল সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

শুয়োরের বাচ্চা! মনে মনে গালি দিল মোতালেব খন্দকার। শালার শকুনের চোখ। তোর চোখ দুটো কানা করে দিতে পারলে শান্তি পেতাম।

'ভয় নাই মিয়া, আমি কাউরে কমু না। আমি আইছি আমার মাল নিবার। আর কাইন্দো না। আমার লগে চলো বেবাক কষ্ট ভুলায় দিমু।' শান্তার হাত ধরে টানতে লাগল সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

মোতালেব খন্দকার কিছু বলছে না। তার কিছুই বলার নেই। এই লোককে বাধা দিলে চরম সর্বনাশ ঘটবে।

পাঁচ

সারা রাত নির্ঘুম কাটল মোতালেব খন্দকারের। একটু আগে প্রকাশ্যে খুন করে বেঁচে গেছে সে। যদিও ব্যাপারটা খুন নয়, নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু দর্শকদের বুঝানো যেত না কিছুতেই। এখানে এসেই প্রথম শো-তেই অঘটন। তবে কি সত্যিই ফুলমতির আত্মা...। না, এ অসম্ভব। মৃত কেউ কখনও ফিরে আসে না। স্রেফ উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। শালার এই জায়গাতে শো করতে এসেই ভুল হয়েছে।

সকাল হবার সাথে সাথে রাতের ঘটনা অপেরার সবাই ভুলে গেল। সামান্য একজন মেয়ের মৃত্যুতে এদের কিছু আসে যায় না। সবাই প্রতিনিয়ত মৃত্যু নিয়ে খেলা করে। একটু এদিক ওদিক

হলেই নিভে যাবে জীবন প্রদীপ।

সন্ধ্যার পরে শো শুরু হয়ে গেল। মোতালেব খন্দকার মনে মনে কিছুটা ভয় পাচ্ছে। সে কোনও অঘটন চায় না। টুকটাক খেলা দেখানো শেষ হলে মোতালেব খন্দকার কালো পোশাক পরে মঞ্চে এল। আলখেল্লার ভিতর তার মুখটাও ঢাকা পড়েছে।

'দর্শকমণ্ডলী,' বলল মোতালেব খন্দকার। 'আমি এখন ভয়ংকর খেলা দেখাব। আপনারা সবাই চুপ করে থাকবেন। কেউ কোনও কথা বা শব্দ করবেন না। এ এক ভয়ংকর খেলা। এ খেলার নাম মৃত্যুখেলা। আপনাদের ভিতর থেকে একজন মঞ্চে উঠে আসুন। একজন সাহসী লোক উঠে আসুন।'

দু-মিনিট সব নিশ্চুপ। কেউ এল না। মৃত্যুখেলাতে কেউ অংশ গ্রহণ করল না।

'আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনাদের মাঝে কি সাহসী কেউ নেই?' আবারও বলল মোতালেব খন্দকার।

'আমি আছি।' শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে গেল কয়েকশত চোখ। সবার সাথে মোতালেব খন্দকারও বিস্মিত হলো। কারণ লোকটি সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।

'কুত্তার বাচ্চার মতলবটা কী!' বিড়বিড় করে বলল মোতালেব খন্দকার। তবে মুখে বলল, 'এই তো সাহসী লোক পেয়ে গেছি। আপনাদের যোগ্য এম পি সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী।' মনে মনে একটার পর একটা কুৎসিত গালি ছুঁড়ছে।

'মঞ্চে উঠে আসুন। সবাই এম পি সাহেবের জন্য হাততালি দিন।'

তুমুল করতালির শব্দ ভেসে এল।

'এবার আপনাদের এম পি সাহেবকে কেটে দু-টুকরো করে আবার জোড়া লাগিয়ে দেব।' আবারও হাত তালি।

মোতালেব খন্দকারের কথামত সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। দাঁত বের করে হাসছে সে। মোতালেব খন্দকার তার হাসির কারণ বুঝতে পারছে না। শালা, তোর মুখের উপর পেশাব করতে পারলে শান্তি পেতাম, মনে মনে বলল মোতালেব খন্দকার।

'সবাই প্রস্তুত! আমি এই তরোয়াল দিয়ে আপনাদের এম পি সাহেবকে দু-টুকরো করে আবার জোড়া লাগাব। ওয়ান...টু...থ্রী...' কোপ মারল মোতালেব খন্দকার। এটা আসলে আলোর কারসাজি। আলো পড়লে মনে হবে সোহরাব চৌধুরীর মাথা গলা থেকে বিচ্ছিন্ন।

এ কী! চমকে উঠল মোতালেব খন্দকার। সত্যি সত্যি সোহরাব উদ্দিন চৌধুরীর মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে! কাটা মাথাটা গড়িয়ে দর্শকদের সামনে গিয়ে থামল আর ধড়টা মঞ্চের উপর কাঁপছে!

'আমাগোর এম পি-রে খুন করছে...ধর শালারে...' দর্শকদের মাঝখান থেকে একজন বলল।

মোতালেব খন্দকার বিস্মিত হলেও বোধশক্তি লোপ পায়নি। সে জানে এখানে থাকলে পাবলিকের হাতের প্যাঁদানি খেয়ে মরতে হবে।

মোতালেব খন্দকার মঞ্চের পিছন দিক দিয়ে দৌড় দিল। তার পিছনে বেশ কয়েকজন লাঠি হাতে ধাওয়া করছে। এত তাড়াতাড়ি লাঠি পেল কোথা থেকে তা ভেবে পেল না সে। তার মনে একটাই চিন্তা, পালাতে হবে। অন্ধকারে ফসলের মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে মোতালেব খন্দকার।

ধাওয়াকারী ও মোতালেব খন্দকারের মাঝে ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে। কারণ মোতালেব খন্দকার যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ছুটছে

কিন্তু ধাওয়াকারীদের অনুসরণ করতে হচ্ছে। পিছনে তাকাল মোতালেব খন্দকার। স্কুল মাঠে অনেক আলো, তারমানে অপেরাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দি নিউ মোতালেব ম্যাজিক অপেরার মৃত্যু ঘটেছে। এখান থেকেই অপেরার মালিক হবার পথযাত্রা, আবার এখানেই সব শেষ!

ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়েছে মোতালেব খন্দকার। এক জায়গায় এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল। একটু পরে ধাতস্থ হয়ে উঠে বসল। জায়গাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে তার।

একটু পরেই সে বুঝল এটা সোহরাব উদ্দিন চৌধুরীর কাচারি ঘর। সব আগের মতই, শুধু ছনের জায়গায় টিন, মাটির বদলে ইট। এখানে কেউ আসবে না ভেবে কাচারি ঘরে প্রবেশ করল মোতালেব খন্দকার। কাচারি ঘরের মেঝেতে কে যেন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঘরের এক কোণে হ্যারিকেনের মৃদু আলো জ্বলছে। হ্যারিকেনটা হাতে করে লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল মোতালেব খন্দকার। লোকটার মুখ দেখে প্রচণ্ড চমকে উঠল। সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী! মোতালেব খন্দকার বুঝল কমপক্ষে দশ ঘন্টা আগে মারা গেছে সোহরাব উদ্দিন চৌধুরী। তা হলে শো-এর সময় ওটা কে? এতগুলো মানুষ কি ভুল দেখেছে?

'মতু, তুই আইছোস!' মোতালেব খন্দকারের পেছন থেকে সাপের মত হিস্ হিস্ করে বলল নারীকণ্ঠ। সে বুঝতে পারল কণ্ঠস্বরটা ফুলমতির।

'বারোডা বছর তোর লাইগ্যা বইয়া রইছি। এই লুইচ্চ্যাডারে আগেই শ্যাষ কইরা দিবার পারতাম। দেই নাই তোর লাইগ্যা। দেখ, মইরা আছে, আর কোনও দিন মাল খাইবার চাইব না।' বিকট শব্দে হেসে ওঠে ফুলমতির প্রেতাত্মা।

'ফুলমতি... আমারে মাপ করে দে...আর কোনওদিন...'

'চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা! তোরে মাপ করলে আমি শান্তি পামু না। তোর মাপ নাইরে...'

মোতালেব খন্দকার প্রাণ বাঁচাতে কাচারি ঘরের জানালা দিয়ে বেরিয়ে দৌড় দিল। পিছন থেকে এখনও ফুলমতির হাসির শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পুকুরে গড়িয়ে পড়ল মোতালেব খন্দকার। এই পুকুরেই বারো বছর আগে ফুলমতির লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

মোতালেব খন্দকার পুকুর থেকে উঠতে চাইল। কিন্তু কে যেন সাঁড়াশির মত কঠিন হাত দিয়ে তার পা চেপে ধরল। হাত দিয়ে পা ছাড়াতে গিয়ে সে বুঝতে পারল একটা কঙ্কাল তার পা ধরে আছে। সে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু কঙ্কাল তাকে পানির গভীরে নিয়ে গেল।

'আয়রে মতু...আয় আমার লগে থাকবি।' কথাগুলো শুনতে পায় মোতালেব খন্দকার, যদিও সে পানির নীচে ডুবে গেছে!

মোঃ রাকিব হাসান

লাল বিবি

এক

পাহাড়ের বাঁকটা ঘুরলেই বাংলোটা দেখা যায়। আজ পূর্ণিমা। সাদা জোছনায় ভরে গেছে পাহাড়-জঙ্গল-পাহাড়ি নদী। যদিও নদীটা এখান থেকে কিছুটা দূরে। ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে পথ চলছে জোবায়ের। হাতে বেশ দামি একটা স্কচ হুইস্কির বোতল। রাত এখন কত হবে? হাতঘড়ির দিকে তাকাল জোবায়ের। বারোটা পঁয়ত্রিশ। 'শালার জীবন।' নিজেকেই নিজে গালিটা শোনাল জোবায়ের। করুণ চোখে বোতলটার দিকে তাকাল সে। তার হাতেই দামি জিনিসটা। কিন্তু ওটা তার নয়। আবার লোভাতুর চোখে ওটার দিকে তাকাল জুবায়ের। যদিও ওটা থেকে ছিটে ফোঁটা পাবে সে। এতেই তার আনন্দ। রাস্তাও যেন শেষ হয় না। শীতও অনেক পড়েছে এবার। আগেও একবার এখানে এসেছিল জোবায়ের। আজ থেকে এক বৎসর আগে। গত শীতে। তখনকার ঘটনাগুলো এখনও চোখে ভাসে তার। কত রাত যে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে জেগে উঠেছে, সেই সব স্মৃতি আর মনে করতে চায় না সে। তারপরও মনে পড়ে।

চারপাশটা কেমন নীরব। পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটছে সে। কোথাও কেউ নেই। দূরে জঙ্গলের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। চারপাশে

থোকা থোকা কুয়াশা জমে আছে। কুয়াশা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ জোনাকি আলোর মালা। এই নিশুতি রাতে তাকেই এই 'মাল' আনতে পাঠিয়েছে সোহেল। সোহেল আরমান। কোথায় কোন পার্টির কাছে পাওয়া যাবে ভালই জানা আছে তার। গত শীতে যারা যারা এসেছিল এবারও তারাই এসেছে। আনন্দ ফুর্তি করবে। সবই সোহেলের টাকায়। জুবায়ের ও তাদের মধ্যে একজন। সোহেলের বড় চাচা সোনা কান্দার চেয়ারম্যান। আর সোহেল তাঁর বখাটে ভাই পো।

পাহাড়ি রাস্তা ছেড়ে এখানটায় একটু জংলা মত জায়গা। এখানে এসে গা-টা কেমন ছম ছম করে উঠল জুবায়েরের। চারপাশ ভাল করে দেখে নিল জঙ্গলের ভেতরটায় আলো আঁধারির খেলা। কোথাও কোথাও কুয়াশা। হাতের টর্চটা জ্বালল জুবায়ের। একটা শেয়াল দ্রুত দৌড়ে গেল তার টর্চের আলোর সামনে দিয়ে। হঠাৎ জায়গাটা চিনতে পারল জুবায়ের। এখান থেকে একটু ভেতর দিকে একটা কবর আছে। সে কবরটা ওরা কয়েকজন মিলে খুঁড়েছিল গত শীতে। হঠাৎ করেই যেন তার শরীরটা শিরশির করে উঠল। গায়ে কাঁটা দিল। দ্রুত পায়ে এগোল সে। এই জায়গার গাছপালাগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা। চাঁদের আলো খেলা করছে মাটিতে। সব কিছু দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ঠিক তখনই জুবায়ের দেখতে পেল কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে! 'কে ওখানে?' গলা চড়াল জুবায়ের।

কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে! 'কে ওখানে?' গলা চড়াল জুবায়ের। কিন্তু কোন জবাব এল না। জুবায়ের লক্ষ করল একটা মেয়ে। টর্চের আলো সরাসরি ফেলল সে মেয়েটার ওপর। রং দেখে বোঝা গেল শাড়িটা লাল। দুতিন পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। পায়ের নূপুর বেজে উঠল 'রিনি ঝিনি' করে। মেয়েটার

চেহারা দেখা যাচ্ছে না। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মুখের বেশিরভাগ ঢেকে আছে চুলে। হাতের চুড়িগুলোও লাল। ফর্সা শরীর। আবার পিছিয়ে গেল সে। জুবায়ের যত এগিয়ে যায় মেয়েটা তত পিছায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। খিল খিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'ভয় পেলি নাকি, বাবু?'

জুবায়ের বলল, 'ভয় তো পাওয়ারই কথা, তাই না?'

মেয়েটা আবার হাসল, 'তা যা বলেছিস। তোরা শহুরে বাবুরা ভয় একটু বেশিই পাস্।'

জুবায়ের অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তা এই মাঝ রাতে তোমার মত একটা মেয়ে এই জঙ্গলে বেশ বেমানান। সত্যি করে বলো, তুমি আসলে কে?'

মেয়েটি শব্দ করে হেসে বলল, 'আমি পাহাড়ি মেয়ে, বাবু। আমার বাপু জোর করে এক বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছে। ওদিকে আমার পছন্দের মরদ গেছে শহরে। তাই পালিয়ে এসেছি।'

জুবায়ের এগিয়ে গেল মেয়েটার কাছে। বলল, 'ঠিক বলেছ। জোর করে বিয়ে দেয়াটা তো ঠিক নয়। তোমার চেহারাই তো দেখলাম না এখনও।' হাতের কাছে এমন যুবতী মেয়ে। শিরায় শিরায় রক্তের বান ডাকল জুবায়েরের। বুকের মধ্যে জেগে উঠল একটা আদিম পশু। মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল জুবায়ের। মেয়েটা হেসে উঠল আবার খিল খিল করে। বলল, 'চেহারা দেখবি, বাবু? ঠিক আছে। তা চেহারা দেখে ঠিক থাকতে পারবে তো জুবায়ের?' হঠাৎ মেয়েটার কথার ধরন পাল্টে যাওয়ায় আর মেয়েটার মুখে তার নাম শুনে থমকে গেল জুবায়ের। ভয়ে জমে গেল সে বরফের মত। গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল তার। মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে-কে তুমি?' ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো

পেছনে সরিয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, 'দেখো জুবায়ের, আমাকে চিনতে পারছ?'

'লাল বিবি!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল জুবায়ের। তার হাত থেকে খসে পড়ল হুইস্কির বোতল। আতঙ্কে ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসবে তার চোখ। কল্‌জেটা লাফাচ্ছে ধড়াস ধড়াস করে। তারপর চিৎকার করে বলল, 'না, এ হতে পারে না। অসম্ভব!'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল লাল বিবি। ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল, 'সম্ভব, জুবায়ের, সবই সম্ভব। সবাই এসেছে, তাই না? আমার দেবরের ছেলে সোহেল, জিতু, নিষাদ, শুভ্র—সবাই, তাই না? আর তুমি জুবায়ের। ওহ্, প্রতিশোধ! কতদিন অপেক্ষা করেছি। একা একা এই বিজন পাহাড়ে কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি। আজ এক বছর পর ঠিক এই দিনে আশ্চর্যভাবে মিলে গেল দিনটা—তোমাকে দিয়ে শুরু করব আমার প্রতিশোধ।' জুবায়ের অনুভব করছে সে প্যাণ্ট ভিজিয়ে ফেলেছে। আস্তে আস্তে পিছাতে শুরু করল। লাল বিবি এগিয়ে আসছে আর জুবায়ের পিছাচ্ছে। এভাবে পিছাতে পিছাতে জঙ্গলের একেবারে মাঝে চলে এসেছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা গর্তে উল্টে পড়ে গেল সে। খিল খিল করে হেসে উঠল লাল বিবি। গর্তে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে জুবায়ের। তার দিকে ঝুঁকে এল লাল বিবি। বলল, 'চিনতে পারছ, জুবায়ের, এই গর্তটা? সেই কবর! যেটাতে আমাকে শুইয়েছিলে। আজ এটা তোমার কবর হয়ে গেল। তোমাকে দিয়ে শুরু, জুবায়ের। একে একে সবাইকে শোয়াব।'

মৃত্যুভয় দেখা দিল জুবায়েরের চোখে। কণ্ঠে মিনতি ফুটে উঠল তার, 'আমাকে ছেড়ে দাও, লাল বিবি। আমার কোন দোষ নেই। সোহেলের কথায় আমি একাজ করেছি।'

আস্তে আস্তে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল লাল বিবি।

বলল, 'মনে করো, জুবায়ের, সমস্ত ঘটনা মনে করো।' সত্যি সত্যি জুবায়ের যেন চোখের সামনে সমস্ত ঘটনা দেখতে পেল। তার চোখের সামনে যেন ছবিগুলো ভেসে উঠল। যদিও সব ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটেনি। সোহেল আরমানের কাছে শুনেছে। কিছুটা দেখেছেও। আজ সব তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে জুবায়ের। মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালে ছুঁতে পারবে।

লাল বিবি বলল, 'দেখো, জুবায়ের দেখো। শেষবারের মত দেখে নাও। তা হলে আর আমার হাতে মরতে তোমার কষ্ট হবে না। মনে হবে এ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।'

জুবায়েরের যেন লাল বিবির কথা কানে যাচ্ছে না, সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সব ঘটনা তার মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে যাচ্ছে লাল বিবির করুণ মুখটা। মনে পড়ে যাচ্ছে লাল বিবির মৃত্যু আতঙ্কে নীল চেহারাটা। কী সে ঘটনা যার জন্য আজ এ অবস্থা?

দুই

সোনাপুর কলেজের ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রী চুমকি। বাবা-মায়ের আদরের মেয়ে। সোনা কান্দা থেকে সোনাপুর যেতে দেড় মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। কিছুটা রিকশায় আর কিছুটা পায়ে হেঁটে। রোজই রাস্তায় সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোহেল আরমান। নানা রকম টিট্‌কারী দেয়। কখনও বা বিয়ের প্রস্তাব দেয় চুমকিকে। খারাপ লাগে চুমকির। মা-বাবার কাছে ব্যাপারটা

বলেছে চুমকি। কিন্তু সোহেল আরমানের বড় চাচা সোনা কান্দার চেয়ারম্যান। তাই কিছু বলার উপায় নেই। অবশেষে চুমকির বাবা ঠিক করলেন যে, চুমকির কলেজ যাওয়া বন্ধ। তার বাপ সামান্য মুদি দোকানি। বাজারে একটা ছোটখাট মুদি দোকান আছে। চেয়ারম্যানের সাথে সে তো পেরে উঠবে না। জলে বাস করে কুমিরের সাথে লড়াই চলে না। কিন্তু কলেজ বন্ধ করেও শেষ রক্ষা হলো না চুমকির। বাড়িতে এসেও জালাতন শুরু করল সোহেল। নানান ছুতো-নাতায় বাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাত হলে ঘরের চালে ঢিল ছোঁড়ে, চিৎকার করে গান গায়, কখনও নাম ধরে ডাকে।

শেষে নিরুপায় হয়ে চেয়ারম্যানকে জানাতে বাধ্য হলেন চুমকির বাবা বেলায়েত মিয়া। চেয়ারম্যান সেকান্দর আলী বললেন, 'ঠিক আছে, বেলায়েত মিয়া, আমি আগে তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি। যদি অভিযোগ সত্যি হয় তো ব্যবস্থা একটা নিতে হবে বৈকি। আজ সন্ধ্যায় যাব তোমার বাড়ি।'

সন্ধ্যাবেলা বেলায়েত মিয়ার বাড়ি হাজির হলেন চেয়ারম্যান। ঘরের বারান্দায় বসতে দেয়া হলো তাঁকে। চুমকির মায়ের হাতে বানানো চা আর পান খাওয়ার পর চুমকিকে ডাকলেন চেয়ারম্যান। চুমকি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ধক করে উঠল চেয়ারম্যানের বুক। এত সুন্দরও মানুষ হয়! তাঁর দুই-দুইটা বউ—এর নখের যোগ্যও নয়। মনে মনে ভাবে সেকান্দর, এই মেয়েকে বিয়ে না করলে তার জীবন বৃথা। তার মৃত ছোট ভাইয়ের বখাটে ছেলে সোহেল, তার হাত থেকে এই মেয়েকে সে বাঁচাতে পারবে না। বাঁচানোর একমাত্র পথ চুমকিকে তার চাচী বানিয়ে দেয়া। তাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। চুমকির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এসব কিছুই ভাবছিলেন সেকান্দর আলী। সাহস

করে বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েই দিলেন চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যান সেকান্দর আলীর সাথে বিয়ে হয়ে গেল চুমকির। চুমকির বাবা মনে করলেন, চেয়ারম্যান এখনও তাগড়া জোয়ান। বয়সও ছেচল্লিশ। এমন কোন বয়স নয়। সোহেলের উৎপাত থেকে তো বাঁচা যাবে। চুমকি এখন চেয়ারম্যানের বউ। কিন্তু একজনের মনে শান্তি নেই। সোহেল আরমান। বুকের মধ্যে তার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকল। আমার ছাড়া চুমকি অন্য আর কারও হতে পারে না।' চিৎকার করে বলল আরমান একা একা। তার চাচা যখন চুমকিকে 'লাল বিবি' বলে ডাকে তার চেহারা তখন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। চুমকিকে তার চাচা লাল দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। পরনে লাল শাড়ি, লাল লিপস্টিক ঠোঁটে, পায়ে আলতা, হাতে লাল কাঁচের চুড়ি। কপালে লাল টিপ। পায়ে লাল স্যাণ্ডেল। লাল বিবি নামটা যথার্থ। আর রূপও যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। বুকের মধ্যে কালসাপ বিরাজ করছে সোহেল আরমানের। হাতের পেশি কিলবিল করে ওঠে। ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা করে সোহেল।

সে খবর নিয়ে জানতে পারে চুমকির সাথে তাদের পাশের গ্রামের 'সুজন' নামের একজনের গভীর প্রেম ছিল। তার সাথে চুমকির প্রেম এখনও অটুট আছে। আজ রাতেই সে সুজনের সাথে দেখা করতে যাবে পুরনো জমিদার বাড়িতে। এটাই সুযোগ। তার ভয়ংকর পরিকল্পনায় প্রথমেই সেই রাতে খুন হয়ে যায় সুজন ওই জমিদার বাড়িতে। গুম হয়ে যায় তার লাশ। চেয়ারম্যান বাড়ির সবাই যখন ঘুমে বিভোর তখন নিশিরাত, একা একা বেরিয়ে আসে চুমকি তার প্রেম-অভিসারে। জমিদার বাড়িতে এসে সংকেত দিয়েও সুজনের সাড়া পায় না চুমকি। সুজন নেই ওখানে, যখন বুঝতে পারে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সোহেলের মামার পাহাড়ি বাংলোতে এনে তোলা হয় চুমকিকে। এই বাংলোতে এসে অনেক বার থেকে গেছে সোহেল আরমান। বাংলোর কেয়ারটেকার, মালী, বাবুর্চি সবাই তাকে ভয় পায়। সোহেলের মামা এই বাংলোতে ক্বচিৎ কখনও এসে থাকে। এ ছাড়া বাংলোটা তারই দখলে। সে-রাতে সবার সাথে জোবায়েরও ছিল। যেদিন অপহৃত হলো সেদিন থেকেই চেয়ারম্যান বাড়ির সবাই জানল চুমকি তার প্রেমিক সুজনের হাত ধরে পালিয়েছে। এরপরদিন রাতেই বাংলোবাড়িতে ঘটল সেই ঘটনা। যার মাশুল এখন গুনতে হচ্ছে জুবায়েরকে। একে একে গুনতে হবে সবাইকে, লাল বিবির হাত থেকে নিস্তার নেই কারও।

পাঁচ পাঁচটা নরপশু সেদিন হামলে পড়েছিল লালবিবি অর্থাৎ চুমকির ওপর। লালবিবির আর্তনাদ এখনও কানে বাজছে জুবায়েরের। তাদের লালসা চরিতার্থ হবার পর নির্মম ভাবে হত্যা করেছে ওরা তাকে। বিকৃত উল্লাসে হেসে উঠেছে ওরা সেদিন। তারপর লাশটা এনে কবর দিয়েছে এই জংলামত জায়গায়। চারদিকে নীরব। আঁধার রাতে কেউ শোনেনি লালবিবির মৃত্যু আর্তনাদ। কেউ দেখেনি ওদের কুকীর্তি। শুধু একজন প্রতিবাদ করেছিল। বাবুর্চি ইব্রাহিম। কিন্তু তার প্রতিবাদ ধোপে টেকেনি। কাউকে বলতেও পারেনি সে। চাকরিটা হারাতে চায়নি...।

কবরে শুয়ে আছে জুবায়ের। তার উপর ঝুঁকে আছে লালবিবি। তার চেহারাটা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। হাতে হুইস্কির বোতল। ওটার ছিপি ঘুলে সমস্ত মদ ঢেলে দিল তার শরীরে। ভিজিয়ে দিল জুবায়েরকে। জুবায়ের যেখানে ফেলেছিল সেখান থেকেই তুলে নিয়েছিল বোতলটা। ঝুঁকে এসে জুবায়েরের পকেট হাতড়ে দিয়াশলাইর বাক্সটা বের করল। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল জুবায়েরের চোখ। তার শরীর যেন পেরেক দিয়ে মাটির সঙ্গে

গেঁথে দিয়েছে কেউ। সে নড়তে পারছে না। লাল বিবি কী করতে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে। তাকে পুড়িয়ে মারবে লাল বিবি! ওরা সব ক'জন মিলে যেভাবে লাল বিবিকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মেরেছিল। ধপ্ করে জ্বলে উঠল দিয়াশলাই-র কাঠি। জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে মারল লাল বিবি জুবায়েরের গায়ে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল আগুন জুবায়েরের সারা শরীরে। তার আর্তচিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। রাতের পাখিরা ডানা ঝাপ্টাল। আর লাল বিবির রক্ত হিম করা খিল খিল হাসি রাতের বন-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি করে ফিরতে লাগল। চাঁদ তখন তার অকৃপণ জোছনা ঢেলে চলেছে বিশ্ব চরাচরে। আর অশরীরী লাল বিবির প্রেতাত্মা প্রতিশোধের উন্মত্ততায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বন-পাহাড়ে। আর হাসছে। শুধুই হাসছে।

জুবায়েরের কয়লা হয়ে যাওয়া লাশ পড়ে রইল কবরে। একটা শেয়াল এসে গন্ধ শুঁকে চলে গেল। আর জুবায়ের তখন শব্দ, স্পর্শ আর গন্ধের অন্য পাশে চলে গেছে। লাল বিবির প্রেতাত্মা নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে মিশে গেল বাতাসে। আবার ফিরে আসবে সে তার আসল চেহারায় আগামী রাতে!

তিন

সারারাত জুবায়ের ফেরেনি। তাদের আনন্দও মাটি। কেন ফেরেনি সেটা ভাবতে ভাবতেই বারান্দায় মাদুর পেতে বসে যেখানে ওরা আড্ডা দিচ্ছিল সেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমিয়ে

পড়ে সবাই। সকাল হতেই ঘুম ভেঙে যায় সবার। নিজেদের আবিষ্কার করে শীতের বারান্দায়। চারপাশে ঘন কুয়াশা। বাবুর্চি ইব্রাহিম এসে বলল, 'কাল আপনাদের অনেক ডাকলাম ঘরে এসে ঘুমাবার জন্য। কিন্তু কারোই ঘুম ভাঙল না।'

সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'জুবায়ের রাতে ফিরেছে?'

ইব্রাহিম জবাব দিল, 'না। ফেরেনি।'

সোহেল লক্ষ করল ইব্রাহিম রাতে তাদের লেপ ছাড়া রাখেনি।

সবাই উঠে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে বের হলো জুবায়েরের খোঁজে। চারজনই চলে এল জঙ্গল মত জায়গাটায়। শুভ্র বলল, 'চিনতে পারছিস সোহেল? এখানেই কিন্তু আমরা লাল বিবিকে কবর দিয়েছিলাম।'

চারপাশে তাকাল সোহেল। জঙ্গলের ভেতরটা আরও ঠাণ্ডা লাগছে। ঝোপে ঝোপে কুয়াশা জমে আছে। পাখির কলতানে মুখরিত চারপাশ। জিতু আর নিষাদ প্রস্তাব করল, 'চল সবাই মিলে লাল বিবির কবরটা দেখে আসি।'

সোহেল বলল, 'কবরের ভেতর লাল বিবির হাড়-গোড় এতদিনে মাটির সাথে মিশে গেছে। কেউ কোন কিছু টেরও পায়নি। আর পাবেও না। এক বছর তো হয়ে গেল। ঠিক আছে, কবরটা একটু দেখে আসি। তারপর জুবায়েরকে খুঁজতে যাব।'

কবরের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল ওরা। কবরের জায়গাটা এখন একটা গর্ত! গর্তের কাছে একটা হুইস্কির বোতল পড়ে আছে। একটা দিয়াশলাই-র বাক্স পাশে। দ্রুত পায়ে গর্তের কাছে চলে এল ওরা। উঁকি দিল গর্তের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সব কজন। জুবায়েরের লাশের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। আধ পোড়া শার্টের অংশটা দেখে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল সোহেলের মুখ থেকে, 'জো-বা-য়ে-র!!'

চারজনই সরে ছিট্কে এল কবরটার কাছ থেকে। তারপর আতঙ্কিত চারজন ঘুরেই দৌড় দিল বাংলোর দিকে। বাংলোর বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল চারজনেই। তাদের আতঙ্কিত রূপ কেউ দেখল না। কেয়ারটেকার লোকটা মনে হয় বাজারে গেছে। মালি বোধহয় বাংলোর পেছনের বাগানে। আর বাবুর্চি ইব্রাহিম রান্নাঘরে। এসে ভাবতে বসল সবাই। আসলে জুবায়ের কেমন করে পুড়ে মরল? আর লালবিবির কবরটা খোলা কেন? আর সেই কবরের ভেতরেই কেন পড়ল জুবায়ের? বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে মনে। কিন্তু কোন সদুত্তর পাচ্ছে না কেউ। এখনও ওঠা-নামা করছে ওদের বুক।

শুভ্র বলল, 'আমার কিন্তু অন্য কিছু মনে হচ্ছে। লাল বিবির প্রেতাত্মার কাজ নয়তো?'

সোহেল বলল, 'আরে, ধ্যাৎ।'

জিতু এখনও থর থর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই বলল, 'শুভ্রর কথা ফেলে দিস না, সোহেল। যদি লাল বিবিই না হবে তবে কবরটা শূন্য কেন?'

নিষাদ বলল, 'শেয়াল-টেয়ালের কাজ হবে, বুঝলি।'

সোহেল পায়চারি করতে লাগল। বলল, 'কিন্তু গর্তটা যে রকম গভীর করে খোঁড়া হয়েছিল। শেয়ালের পক্ষে লাশ ওঠানো সম্ভব নয়। আমারও যেন কেমন মনে হচ্ছে। লাল বিবিই...। কিন্তু এটা কেমন করে সম্ভব?'

'আমার এসব আলোচনা ভাল লাগছে না।' চিৎকার করে বলল জিতু। 'আমি এখনই ফিরে যাব। সত্যি সত্যিই লাল বিবি যদি প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসে থাকে আমাদের কাউকে ছাড়বে না। নিজের প্রাণটা অকালে খোয়াতে চাই না।'

তিনটে মোটর সাইকেলে করে এসেছিল ওরা। চারজনেই

দৌড়ে গেল মোটর সাইকেলগুলোর কাছে। 'হায় আল্লাহ! গুঙিয়ে উঠল শুভ্র। একটা মোটর সাইকেলের চাকাও ঠিক নেই! প্রত্যেকটার চাকা হাওয়া-শূন্য। একেবারে নিংড়ে বের করে ফেলা হয়েছে সমস্ত বাতাস। কাছের শহরটাও এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে! 'এখন কী হবে! কে করেছে একাজ?' চিৎকার করে উঠল সোহেল। খবর নিয়ে জানা গেল, মালি, বাবুর্চি, কেয়ারটেকার কেউ একাজ করেনি। ছাউনির ধারেকাছেও যায়নি কেউ। মোটরসাইকেলগুলো ওখানেই রাখা ছিল। বিমর্ষ মনে বসে থাকল ওরা। নেটওয়ার্কবিহীন জায়গায় মোবাইলও কোন কাজ দেবে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপর সন্ধ্যা। বারান্দায় বসে ভাবছে ওরা। পায়ে হেঁটে এত দূর যাওয়া অসম্ভব। কেয়ারটেকারকে বলে দিয়েছে যে করে হোক একটা যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিতে। তাও কালকের আগে সম্ভব নয়। ওরা বিপর্যস্ত মনে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল। তখনই দেখা গেল লোকটাকে। বাংলোর হাতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। জটাধারী সন্ন্যাসী। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে লাল কাপড়, হাতে চিমটা, কাঁধে একটা ঝোলা। বারান্দার কাছে এগিয়ে এল লোকটা। বাবুর্চি ইব্রাহিম এসে সমাদরে বসাল লোকটাকে।

সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'কে উনি?'

ইব্রাহিম বলল, 'তান্ত্রিক ব্রজেশ্বর মহারাজ। জঙ্গলে তাঁর আস্তানা। আমি আসতে বলেছিলাম। আপনাদের সমস্যা তাঁকে খুলে বলতে পারেন। হেলা ফেলা না করে বলে ফেলেন সব। উনি আপনাদের রক্ষা করার উপায় বাতলাবেন। আপনাদের সব কথা আমি শুনতে পেয়েছি। মনে হচ্ছে ওটা লাল বিবিরই কাজ। বাঁচতে হলে ওনার কাছে সব বলুন।'

তান্ত্রিক লাল টকটকে বিশাল দুই চোখ মেলে তাকাল ওদের দিকে একে একে। তারপর বলল, 'একজনকে দরকার আমার। আমি জানি সব। একটা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব অনেক দিন ধরেই টের পাচ্ছি আমি। আমার এমন একজনকে দরকার যে তুলা রাশি।'

শুভ্র বলল, 'আমার তুলা রাশি।'

তান্ত্রিক বলল, 'আমি রাতের প্রথম প্রহরে তোমাকে নিতে আসব। অর্থাৎ রাত আটটায়। আমার আস্তানায় বসে আমি তোমাদের রক্ষা কবচ দেব।' উঠে দাঁড়াল তান্ত্রিক। তারপর চলে গেল।

রাত ঠিক আটটার সময় ঠক ঠক শব্দ হলো দরজায়। দরজা খুলে দিল সোহেল। তান্ত্রিক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। শুভ্র এগিয়ে এলে তান্ত্রিক তাকে ইশারা করে ঘুরে দাঁড়াল। শুভ্রর পিঠ চাপড়ে দিল বন্ধুরা। সোহেল বলল, 'বেস্ট অভ লাক।'

'জোছনা রাত। সামনে তান্ত্রিক পেছনে শুভ্র। ভয় ভয় করছে তার। জোছনায় সব কিছু দেখা যাচ্ছে। তান্ত্রিকের প্রায় গা ঘেঁষে জংলা জায়গাটা পার হলো শুভ্র। পথ যেন শেষ হতে চায় না। তান্ত্রিক একটা কথাও বলছে না। এমন কী পেছন ফিরেও দেখছে না শুভ্র আসছে কিনা। যেন সে জানে শুভ্র আসবেই। এগিয়ে চলল সে মূল জঙ্গলে। তার আস্তানায়।

অবশেষে জঙ্গলে ঢুকল ওরা। অন্ধকার যেন ওদের গিলে নিল। পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে বন ভূমিতে। সেই আলোতে তান্ত্রিকের আস্তানা দেখা গেল। ওখানে একটা আগুনের কুণ্ড ও একটা আসন পাতা। তান্ত্রিক ওখানে বসল। তার চোখগুলো ধক ধক করে জ্বলছে। শুভ্রকে ইশারা করল বসতে। আগুনের কুণ্ডের সামনে বসল শুভ্র। তার ভয়

তখনও কাটেনি। ধীর পায়ে এগিয়ে এল শুভ্র। বসে পড়ল অগ্নিকুণ্ডের সামনে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল তান্ত্রিক। তারপর উঠে দাঁড়াল। চলে এল শুভ্রর পেছনে। তার পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিল শুভ্রর মাথায়। তারপর হাত বুলাতে লাগল তার চুলে। হঠাৎ কিছু বুঝে উঠার আগেই শক্ত হাতে শুভ্রর মাথাটা ঠেসে ধরল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। একটা মাত্র আর্ত চিৎকার শুভ্রর মুখ থেকে বেরিয়ে এসে মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে গেল। শুভ্র যদি তখন দেখতে পেত, তা হলে সে দেখত যাকে সে তান্ত্রিক মনে করেছে আসলে সে লাল বিবি। ধক ধক করে জ্বলছে তার চোখ, তীক্ষ্ণ দুটি দাঁত বের হয়ে আছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। কিছুক্ষণ ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে গেল শুভ্রর দেহ। খিল খিল করে হেসে উঠল লাল বিবি।

এদিকে রাত অনেক হওয়ার পরও ফিরে এল না শুভ্র। দুশ্চিন্তা করতে লাগল সোহেল। জিতু আর নিষাদ। ঘড়ি দেখল সোহেল। রাত দেড়টা। ইব্রাহিমকে ডাকল সোহেল। জিজ্ঞেস করল, 'ইব্রাহিম, তোমার কি মনে হয় শুভ্রর খবর নেয়া উচিত না?'

ইব্রাহিম বলল, 'তা তো অবশ্যই। চলুন সবাই মিলে যাই।'

হাতে টর্চ নিয়ে সামনে চলল ইব্রাহিম। পেছনে ওরা তিনজন—সোহেল, জিতু আর নিষাদ। বাংলো থেকে বের হয়ে কিছু দূর যেতেই রাস্তার পাশে একটা ছাতিম গাছ, তার তলায় কাউকে পড়ে থাকতে দেখল ইব্রাহিম। টর্চের আলোটা সরাসরি ওই পড়ে থাকা লোকটার উপরই পড়ল। কেউ একজন বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ওরা দৌড়ে গেল ওই দিকে। বিস্ময় প্রকাশ পেল ইব্রাহিমের কণ্ঠে, 'হায় খোদা! এ যে দেখছি তান্ত্রিক ব্রজেশ্বর মহারাজ!' তাড়াতাড়ি তার পাশে বসে পড়ল ইব্রাহিম। নাকের

কাছে হাত নিয়ে দেখল। নিঃশ্বাস চলছে। তার মানে বেঁচে আছে। তাকে ধরাধরি করে বাংলোয় নিয়ে আসা হলো। নাকে মুখে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। তড়াক করে উঠে বসল তান্ত্রিক। চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'তা হলে আমি বেঁচে আছি?'

সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'আসলে কী হয়েছিল বলুন তো?'

তান্ত্রিক বলল, 'এখানেই আসছিলাম শুভ্রকে নিয়ে যেতে। কিন্তু ছাতিম গাছটার তলায় আসতেই কেউ একজন পেছন থেকে মাথায় আঘাত করল। চোখে সর্ষেফুল দেখলাম। তারপর কিছু বলতে পারব না।'

ভাল করে দেখে বোঝা গেল মাথার পেছনে রক্ত জমাট বেঁধে আছে তান্ত্রিকের।

নিষাদ বলল, 'তা হলে শুভ্র যার সঙ্গে গেল সে কে?'

সোহেল বলল, 'ওহ্ মাই গড! তা হলে ওই লাল বিবিই তান্ত্রিকের রূপ ধরে শুভ্রকে নিয়ে গেছে?'

জিতু বলল, 'বাঁচব না। আমরা কেউ বাঁচব না। ছাড়বে না লাল বিবি। কাউকে ছাড়বে না। মুক্তি নেই। আমাদের কারও মুক্তি নেই।' প্রলাপ বকতে শুরু করল জিতু।

ইব্রাহিম বলল, 'যা হবার তা এতক্ষণে হয়ে গেছে। আজ রাতে আর শুভ্র সাহেবকে খুঁজতে যাবার কোনও মানে হয় না। বিপদ তাতে বাড়বে। আর তান্ত্রিক মশায় আপনারও আজ আস্তানায় যাবার দরকার নেই।'

সে রাতটা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল ওরা। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। ঘুম ভাঙল দুপুরের দিকে।

তড়াক করে উঠে বসল ইব্রাহিম। বলল, 'হায় হায়! কত বেলা হয়ে গেল যে, বের হতে হবে তো! শুভ্র সাহেবের খোঁজে যেতে হবে।' সবাইকে ডেকে তুলল সে। ছুটল রান্নাঘরে।

চার

তান্ত্রিকের সঙ্গে ওরা প্রথমেই এল তার আস্তানায়। আসার পথে নানা জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছে ওরা শুভ্র'র। শুভ্রকে যে জীবিত পাবে না তা ভাল করেই জানা আছে ওদের। আস্তানার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল তান্ত্রিক। দূর থেকেই দেখতে পেল নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে কে যেন। শুভ্রকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না কারও। দৌড়ে গিয়ে বসে পড়ল ওরা শুভ্রর পাশে। ধাক্কা দিতেই একপাশে গড়িয়ে পড়ল শুভ্র। তার বীভৎস চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল ওরা। চোখ দুটো গলে গেছে। মুখের মাংস পুড়ে গলে দাঁত বেরিয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে আগুনে ঠেসে ধরেছিল ওকে লাল বিবি। তখনই মারা গেছে সে।

চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল জিতু, 'না, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দেব।'

নিষাদ বলল, 'আমিও যাব। আমাকেও নিয়ে যাও।' দু'জনে এক সাথেই দৌড় দিল। হারিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর। কারও মানা শুনল না। কারও ডাকে ফিরে তাকাল না। সোহেল তান্ত্রিক আর ইব্রাহিম মিলে যথেষ্ট চেষ্টা করল ওদের খুঁজে বের করতে। কিন্তু ওরা হারিয়েই গেল। ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। ওদের ডেকে ডেকে আর এদিক ওদিক খুঁজে তারপর সন্ধের একটু [illegible] ফিরে এল ওরা তিনজন।

জিতু আর নিষাদ দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এমন এক

জায়গায় এসে দাঁড়াল যেখান থেকে দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে। থমকে দাঁড়াল ওরা। এবার কোন দিকে যাবে? জিতু প্রস্তাব করল, 'দু'জন দুদিকে একটু এগিয়ে যাই, রাস্তা শেষ হয়ে গেলে ফিরে আসব এখানে।'

তাই ঠিক হলো। দু'জন দুদিকে রওনা হয়ে গেল। তখনও বেশ বেলা আছে দেখে ভাবল, ঠিকই যাবার ব্যবস্থা হবে। জিতু যেদিকে গেল সেদিকে একটু এগোতেই দেখা গেল রাস্তা বন্ধ। ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই। আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। কিছুক্ষণ পর নিষাদের উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল, 'পেয়েছি, জিতু, রাস্তা পেয়েছি।' ছুটে এল জিতু। বলল, 'চল। তাড়াতাড়ি কর। সন্ধ্যাও হয়ে গেছে।' দু'জনেই ছুটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নিষাদ। বলল, 'ওই দেখ, জিতু—কে যেন পড়ে আছে!' অবাক হয়ে সন্ধ্যা আর বিকালের সন্ধিক্ষণের আলোয় একজনকে পড়ে থাকতে দেখল জিতু। কাছে গিয়েই চমকে উঠল সে। ওই তো রক্তাক্ত নিষাদ পড়ে আছে মাটিতে। মৃত। তা হলে সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কে? আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরে দাঁড়াল সামনে দাঁড়ানো নিষাদ। আশ্চর্য! কোথায় নিষাদ! এ তো লাল বিবি!!

খিল খিল করে হেসে উঠল লাল বিবি। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'পালাবি, তাই না? কোথায় পালাবি, জিতু? জুবায়ের শেষ, শুভ্র শেষ, নিষাদ শেষ। এবার তোর পালা। তোর পর সব শেষে সোহেল। হা-হা-হা-হা-হা!'

জিতু দেখল কমলারঙের আগুনের মত জ্বলে উঠল লাল বিবির চোখ দুটি। ঠোঁট ফাঁক করতেই ঠোঁটের দু'পাশ ঠেলে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ সাদা দাঁত। হঠাৎ হাতের নখগুলো বড় হয়ে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিল জিতুর দিকে। জিতুর কাছ থেকে কমপক্ষে সাত/আট

হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল লাল বিবি। তার হাতটা দেখতে দেখতে লম্বা হয়ে পৌঁছে গেল জিতুর গলার কাছে। জিতুর পা যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে কেউ মাটির সাথে। গলাটা খপ্ করে ধরল লাল বিবি। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল জিতু। 'কট্' শব্দে তার ঘাড়টা ভেঙে ফেলল লাল বিবি। বিস্ফারিত চোখ নিয়েই মারা গেল জিতু। খিল খিল হাসিতে সমস্ত জঙ্গল কাঁপিয়ে দিল লাল বিবি।

ওদিকে বাংলোয় ফিরে পাগলের মত হয়ে গেল সোহেল আরমান। মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ছে আর বিড়বিড় করে যেন কী সব বলছে। হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। তান্ত্রিক ফিরে গেছে আগেই। যাবার আগে একটা তাবিজ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সোহেল কোন মতেই ওটা শরীরে বাঁধতে দিল না। চিৎকার করে বলল, 'সামান্য এক পেতনীর ভয়ে হাতে তাবিজ বাঁধব আমি?' তারপরই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

সে রাতটা সোহেলের শিয়রেই কাটিয়ে দিল ইব্রাহিম। কেয়ারটেকার আর বাবুর্চিও জেগেই ছিল। দরজা জানালা ভাল ভাবে বন্ধ করে রেখেছিল ওরা। কোন মতেই যেন লাল বিবি সোহেলের নাগাল না পায়। পরদিনও ঘোর কাটল না সোহেলের। প্রলাপ বকছে সে। জ্বরে গা পুড়ে যাবার মত অবস্থা। ডাক্তার ডাকতে চলে গেল কেয়ারটেকার। এখান থেকে তিন মাইল দূরে ডাক্তারের বাড়ি। এই এলাকায় একমাত্র ডাক্তার। যদিও পল্লী চিকিৎসক। কিন্তু হাতের যশ ভাল। সে যা হোক, দুপুর নাগাদ ডাক্তারের চিকিৎসায় জ্বর ছেড়ে গেল। উঠে বসল সোহেল। রাক্ষসের মত খেল। একেবারে পেট পুরে খেল সে। তারপর আবার ঘুম দিল। এক ঘুমে বিকেল। বিকেল বেলা ঘুম ভাঙল ঠিকই। কিন্তু আবার জ্বর এল। প্রচণ্ড জ্বর। বিছানা থেকে মাথা

তোলার উপায় নেই। কিছুক্ষণ পর বমি করে ভাসিয়ে দিল ঘর। বাবুর্চি ইব্রাহিম যথেষ্ট সেবা করছে। বাড়িতে খবর দেবার কথা বলল। কিন্তু সোহেল মানা করে দিল। কোন দরকার নেই।

সন্ধের দিকে আবার মালিকে সোহেলের শিয়রে বসিয়ে কেয়ারটেকারকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের কাছে রওনা হয়ে গেল ইব্রাহিম। মালি সোহেল আরমানের মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল। বিড়বিড় করে বকতে লাগল সোহেল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরে এল ইব্রাহিম। ঘরে ঢুকেই বলল, 'ডাক্তার নেই। কোন রোগীর বাড়ি গেছে কাউকে বলে যায়নি। এতক্ষণ অপেক্ষা করে তবেই এলাম। আজ রাতে ডাক্তার ফিরবে কিনা তাও জানি না। তাই চলে এলাম।' তারপর মালিকে আবার বলল, 'তুমি যাও, রহমত। আমি আছি।'

মালি বেরিয়ে যেতে সোহেলের শিয়রে বসল ইব্রাহিম। জলপট্টি দিতে লাগল আর বলতে থাকল, 'পাপ এমন একটা জিনিস, কাউকে ছাড়ে না। আপনার বন্ধু যে ক'জন ছিল তারা সবাই গেছে। এখন শুধু আপনিই বাকি।' ভেজা হাতটা সোহেলের মুখে বুলিয়ে দিতে লাগল ইব্রাহিম। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন লাগছে, ছোট সাহেব?'

সোহেল বলল, 'এখন একটু ভাল লাগছে।'

ইব্রাহিম এবার ঘাড় আর গলা মুছিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরল গলাটা। বদলে গেল কণ্ঠস্বর। ভৌতিক গলায় বলল, 'সেই ভালটা আর লাগবে না, সোহেল আরমান!' সোহেল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল তার শিয়রে যে বসে আছে তার দেহটা ঠিকই ইব্রাহিমের, কিন্তু চেহারাটা লাল বিবির! ধক ধক করে জ্বলছে তার চোখ। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে। দুপাশে দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ দাঁত।

চিৎকার করতে চাইল সোহেল। কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। লাল বিবি বলল, 'ইব্রাহিম আর কেয়ারটেকার পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে, সোহেল আরমান। ওরা যখন পথ খুঁজে পাবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মনে পড়ে, সোহেল, আমার করুণ আর্তনাদ? মনে পড়ে আমার কাতর মিনতি? বাঁচার কী তীব্র ইচ্ছে ছিল আমার মনে! তোমরা আমাকে বাঁচতে দাওনি। এবার তোমাকে মরতে হবে, সোহেল আরমান। সব ক'টাকে শেষ করেছি। এবার তোমার পালা।' বলেই খিল খিল হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

রতন চক্রবর্তী

হ্যালোইনের রাতে

এক

মার্টিন ওর দাদীর বাড়ির জানালার কাঁচে মুখ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আছে। শীতের রাতের অন্ধকার ছায়া এর মধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা ডাইনী, ভূত এবং গবলিনের পোশাক পরে সাইডওয়াক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আর ও এখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে। ওদের উত্তেজনা মার্টিন টের পাচ্ছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখা দিলে হ্যালোইনের মজা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে।

নিজের বাড়ির কথা ভাবছে ও। এখন যদি বন্ধুদের সাথে থাকত, এতক্ষণে ওরা ট্রিক-অর-ট্রিট শুরু করতে পারত। হ্যালোইন সব সময় এই রকম। অন্ধকার রাস্তায় ছোট ছেলে মেয়েদের ভয় দেখায়। রাতে সময় যত পার হয় ততই বদ এবং সাহসীরা টিকে থাকে।

এই বছর অবস্থা ভিন্ন। মার্টিনের বাবা-মা ওকে ওর দাদীর কাছে রেখে ছুটি কাটাতে গেছে। খুব ছোট থাকতে এই শহরে একবার এসেছিল ও। এখানে দাদীকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না। যদি ট্রিক-অর-ট্রিট করতে চায় তা হলে ওকে একাই যেতে হবে।

সিঁড়ির কাছ থেকে দাদীর পায়ের শব্দ শুনে মার্টিন ঘুরে তাকাল।

'মার্টিন, ওটা আমি খুঁজে পেয়েছি,' সামনের হলওয়েতে এসে দাদী বললেন। 'যেখানে ভেবেছিলাম ওখানেই ওটা ছিল... চিলেকোঠায় একটা পুরোনো ট্রাংকের ভেতরে।'

ওকে দেখানোর জন্য দাদী লম্বা, কালো এক আলখাল্লা মেলে ধরলেন। জিনিসটা চকচক করছে। আলখাল্লার কলারে পিতলের এক বোতাম লাগানো।

'শহরে কোনও ফেন্সি ড্রেস পার্টি হলে তোমার দাদা এটা পরে যেত,' দাদী বললেন। 'কিন্তু তুমি এটা আজ রাতে পড়তে পার... যদি ট্রিক-অর-ট্রিট করতে চাও।'

উত্তেজনার এক উষ্ণ স্রোত মার্টিনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চলে গেল। কালো আলখাল্লাটার মধ্যে রহস্য আর ভৌতিকতার গন্ধ আছে। মনে হচ্ছে এটা কাউন্ট ড্রাকুলার পোশাক। মার্টিনের পরনে কালো জিন্স আর টার্টেলনেক সোয়েটার। আর আলখাল্লাটা পরলে সত্যিই ওকে নিশাচর প্রাণীর মত মনে হবে।

'ট্রিক-অর-ট্রিট মিস করলে আমি মরে যাব,' মার্টিন বলল, দাদীর বাড়ানো হাত থেকে আলখাল্লাটা নিল।

'এখন, মার্টিন,' দাদী বললেন, 'সাবধান থাকবে। এই শহরে কেউ তোমাকে চেনে না। আমি চাই না কাউকে ভয় দেখানোর জন্য তোমার নামে আমার কাছে নালিশ আসুক। শুধু তোমার মার পীড়াপীড়িতে তোমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছি। ও বলেছিল, এ সময় তুমি খুব মজা পাও।'

মার্টিন মাথা নিচু করে রাখল, তাই দাদী ওর ঠোঁটের হাসি দেখলেন না। এটা সত্য, হ্যালোইন খুব ভালবাসে ও। ভালবাসে অন্ধকার রাতে ভ্যাম্পায়ার হয়ে ঘুরতে। ভালবাসে ভয় দেখাতে...

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না, দাদী। আমি সাবধান থাকব।'

আলখাল্লাটা গায়ে জড়াল ও। নরম চামড়ার মত ওর গায়ে ঝুলছে। কলারের পিতলের বোতাম লাগাল। এটার ওজন ওর মধ্যে ক্ষমতার ধারণা দিচ্ছে। মার্টিন দাদীর চিন্তিত মুখের দিকে তাকাল।

'বাই, দাদী। আমার জন্য জেগে থেকো না।'

তাড়াতাড়ি করে আসার জন্য দাদী কিছু বলার আগেই মার্টিন সামনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

'মার্টিন...মার্টিন...,' পেছন থেকে দাদী ডাকলেন।

কিন্তু দ্রুত রাস্তার পাশে ফার গাছগুলোর অন্ধকার ছায়ায় সরে গেল মার্টিন। ছায়ায় লুকিয়ে বাড়ির দিকে চাইল। ওর দাদী পোর্চে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকার ছায়ায় ওকে দেখার চেষ্টা করছেন। অবশেষে ঘুরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মার্টিনের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। দাদী ওর জন্য চিন্তা করবেন। কিন্তু ও তো তাঁর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেনি। দেরি করে বাড়ি ফেরার যে পরিকল্পনা করেছে ও, সেজন্য তো তিনি বাধা দেননি।

মুখে রং করার সাদা রং-এর টিউবটার অস্তিত্ব জিন্সের পকেটে অনুভব করল মার্টিন। ওটা পকেট থেকে বের করে খুলল। আঙুলে একটু রং নিয়ে মুখে ঘষল। তারপর সতর্কতার সঙ্গে একটা গাছের শিকড়ের নীচে টিউবটা লুকিয়ে রাখল। অন্য এক পকেট থেকে প্লাস্টিকের শ্বদন্ত বের করল। এটা স্থানীয় এক খেলনার দোকান থেকে দুপুরে কিনেছিল। দাঁতের ওপরে নকল দাঁত লাগিয়ে হাসল। ভাবল, এখন আয়নায় নিজেকে দেখতে পারলে খুব ভাল হত।

রক স্টারের ড্রেস পরা দুজন মেয়ে সাইডওয়াক ধরে ওর দাদীর বাড়ির দিকে আসছে। ওদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ

শুনতে পেল ও। কোনও হিংস্র পশু যেমন শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে থাকে সেরকম গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর লাফিয়ে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল।

মেয়ে দুজনের ভয়ার্ত আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে গেল। তারা ঘুরে দৌড় দিল। আলখাল্লাটা গায়ে ভাল মত জড়িয়ে রাস্তার বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল মার্টিন। রাত এখনও অনেক বাকি। ও বাতাসে উত্তেজনার গন্ধ পাচ্ছে। অপরিচিত এই শহরে হ্যালোইন ভালই কাটবে, ভাবল।

রাস্তার ছায়া ছায়া জায়গা ধরে চলতে লাগল মার্টিন, ল্যাম্পপোস্টের বাতিতে আলোকিত অংশগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যরকম পোশাক পরা ট্রিক-অর-ট্রিটারদের দেখে ঝোপঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে থাকছে। সবাই চলে যাওয়ার পর একা হলেই একটা বাড়ির দরজায় ঘণ্টা বাজাল।

'ট্রিক-অর-ট্রিট।'

যেভাবে কথাটা বলে ও, লোকজন সেটা পছন্দ করে না। ও হাত বাড়ালে তারা ক্যাণ্ডি দেয়। তারা যখন দ্রুত দরজা বন্ধ করে, উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে ও। পাঁচবার ও বিভিন্ন বাড়ির দরজা নক করেছে এবং যারা দরজা খুলেছে তাদের ভয় দেখিয়েছে। যারা ওকে ক্যাণ্ডি দিয়েছে সেগুলো ছুঁড়ে মেরেছে। ক্যাণ্ডি পছন্দ করে না ও।

সাইডওয়াকে এসে, হ্যালোইনের পোশাক পরা কতগুলো ছোট বাচ্চার পেছনে দৌড় দিল মার্টিন। ওদের মাথার ওপর দিয়ে আলখাল্লা টেনে নিল, ধমকে দিল, আর একজনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। এরপর দৌড় দিল। বাচ্চাদের ভয়ার্ত চিৎকার চারপাশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'হেই, তুমি!' কেউ একজন কর্কশ কণ্ঠে জোরে চিৎকার করে

উঠল। মার্টিন পেছনে ফিরে দেখল বিশালদেহী এক লোক ওর পেছন পেছন দৌড়ে আসছে।

'নিজেকে কী ভাবিস, শয়তান? আমার বাচ্চাদের ভয় দেখাস?' লোকটা চিৎকার করে বলল, খুব রেগে গেছে।

ও জোরে দৌড়াতে শুরু করল। লোকটার এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল। সামনে, ডানে দেখতে পেল একটা সরু পথ। জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। লোকটা হাত বাড়িয়ে যেই ধরতে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে ডান দিকের পথে মোড় নিল ও।

পথটা আরও দ্রুত সরু আর ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ঝোপের কাঁটা লেগে মার্টিনের মুখ আর হাত কেটে গেল। এর ফলে ওর গতি কমে গেল। রাতের নীরবতায় লোকটার জোর শ্বাস নেবার শব্দ শুনল। কিন্তু শব্দটা এখন অনেক দূরে চলে গেছে। ঘন ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে চলল মার্টিন। অবশেষে থামল, কান পেতে শুনতে লাগল। জঙ্গলে কোনও শব্দ হচ্ছে না। ও ঘুরে দাঁড়াল। কেউ ওকে তাড়া করে আসছে না, কেউ নেই শুধু অন্ধকার রাত।

মার্টিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। কপালে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করছে। আঙুল দিয়ে কপাল স্পর্শ করল। আঙুলে তরল কিছুর স্পর্শ পেয়ে কেটে গেছে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। তারপর হাসল। নিশ্চয়ই ওর চেহারা এখন খুব ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, মুখের সাদা চামড়া বেয়ে কপাল থেকে লাল রক্তের ধারা নামছে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে জঙ্গলে নিজের অবস্থান বুঝতে চাইল। চারপাশের গাছপালাগুলোকে ওর একই রকম মনে হলো। বুঝতে পারছে না, রাস্তা থেকে কোন পথে এখানে এসেছে। যে পথ ধরে এখানে এসেছে সেটা ঘন অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছে।

নেকড়ের ডাকের মত এক চিৎকার রাতের নীরবতা খান খান করে ভেসে এল। মার্টিন আতংকে কেঁপে উঠল। কালো আলখাল্লাটা শরীরে চাদরের মত জড়িয়ে নিল। হঠাৎ হ্যালোইন রাতের জন্য ওর কোনও আগ্রহ থাকল না। শুধু মাত্র এই জঙ্গল ছেড়ে বাড়ি গিয়ে বিছানায় যেতে চাইছে।

'রাস্তাটা খুব দূরে না,' বিড়বিড় করে নিজেকে বলল ও। দুহাত দিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে এগোতে লাগল। কোনও দ্বিধা ছাড়াই যে দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছে তার বিপরীত দিকে যাচ্ছে।

ওর পায়ের নীচে মরা ডাল মট্ মট্ শব্দে ভাঙছে। মুখে গাছের তীক্ষ্ণ ডালের খোঁচা লাগছে। তারপরও হাঁটছে। সময় আর দিকের কথা ভুলে গেছে। অন্ধকার রাত এমনভাবে ওর চারপাশে আছে যেন একটা বিশাল কালো আলখাল্লা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে। স্ট্রীট ল্যাম্পের বাতি কিংবা পোর্চের বাতির আলো এই অন্ধকার দূর করতে পারবে না।

তারপর, হঠাৎ, আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল। পূর্ণিমার চাঁদ হেসে উঠল। রক্তে ভিজে গেছে মার্টিনের চেহারা। ও থেমে চারপাশে তাকাল। ওকি এক বৃত্তাকার পথে ঘুরছে? নাকি এই জঙ্গল কয়েক মাইল বিস্তৃত? মার্টিন পরিশ্রান্ত হয়ে গাছের বিশাল এক কাণ্ডের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। চোখ বুজে নিজের ভেতরের ভয়ের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল।

'তুমি কি হারিয়ে গেছ?'

কণ্ঠস্বরটা শুনে মার্টিনের প্রতিটা নার্ভ যেন লাফিয়ে উঠল। ও চোখ খুলল, কয়েক ফুট দূরে একটা চেহারা দেখতে পেল। ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মার্টিনের মনে হলো

লোকটার দৃষ্টি ওকে গাছের কাণ্ডে বিঁধিয়ে দেবে।

কথা বলার জন্য মার্টিন মুখ খুললেও কোনও শব্দ বেরোল না। গলা বেয়ে উঠে আসা ভয়টাকে ঢোক গিলে নামাতে চাইল। অবশেষে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিল।

'হ্যাঁ...আ...আমি...হা...রিয়ে গেছি।'

'পথ খুঁজে পেতে তোমাকে আমি সাহায্য করব,' লোকটা মেপে মেপে প্রতিটা শব্দ বলল। 'দেখতে পাচ্ছি তুমি ট্রিক-অর-ট্রিটিং খেলছিলে।' সে থামল, মার্টিনের কপালে লেগে থাকা রক্তের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'আরে, তুমি দেখছি আঘাতও পেয়েছ।'

'হ্যাঁ,' মার্টিন ফিসফিসিয়ে বলল।

লোকটা অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। চাঁদের আলোতে মার্টিন লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগল। ওর মনের ভেতরে আশার ছোট্ট একটু আলো জেগে উঠেছে। হয়তো এই আগন্তুক বনের ভেতর থেকে ওকে বেরুতে সাহায্য করবে। হয়তো এই দুঃস্বপ্ন শীঘ্রি শেষ হবে।

শুধু মাত্র ওদের দুজনের পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। দীর্ঘক্ষণ আর কোনও শব্দ। গেল না। হাঁটার সময় মার্টিন আগন্তুককে যাচাই করতে চাইল। লোকটার পরনে কালো পোশাক। চুলের রং কালো কিন্তু গায়ের চামড়া দুধ সাদা। অন্ধকার রাতেও স্পষ্ট ঠাওর করা যায়।

'তুমি ট্রিক-অর-ট্রিট পছন্দ করো, তাই না, মার্টিন?' লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওর দিকে ঘুরে তাকাল না।

'হ্যাঁ,' মার্টিন জবাব দিল। নার্ভাসভাবে হাসল। তারপর ওর রক্ত আতংকে বরফ হবার যোগাড় হলো। লোকটা ওর নাম ধরে

ডেকেছে!

'আপনি আমার নাম জানেন কীভাবে?'

লোকটা এত দ্রুত থামল যে মার্টিন তার গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

'ভয় পেয়ো না, মার্টিন,' লোকটা বলল। 'তোমার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি। জানি তুমি হ্যালোইন কীরকম ভালবাস। এ-ও জানি অপরকে ভয় দেখাতেও ভালবাস।'

মার্টিন লোকটার কথায় দারুণ অবাক। লোকটার কালো চকচকে চোখের দিকে তাকাল। চোখ দুটো যেন ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে।

'এসো, মার্টিন,' লোকটা বলল। 'ভয় সম্পর্কে আরও অনেক কিছু তোমাকে শেখাব।'

লোকটা আবারও ঘুরে বনের মধ্য দিয়ে হাঁটা শুরু করল। পালানোর ভাবতে লাগল মার্টিন। কিন্তু কোথায় পালাবে? নিশ্চয়ই এই আগন্তুক অন্ধকারতম জায়গা থেকেও ওকে খুঁজে বার করবে। রাতের ছায়ার মত মার্টিন লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগল।

মার্টিন যখন এসমস্ত কথা ভাবছিল তখন লোকটা একটা ঝোপ পেরিয়ে নুড়ি বিছানো রাস্তায় পা রাখল। মার্টিনও বেরিয়ে এসে দেখল সামনে একটা উঁচু টিলার গোড়ায় বিশাল পুরোনো এক বাড়ি।

আর এক সেকেণ্ডও ইতস্তত করল না ও। পেছনের আগন্তুকের দিকে না তাকিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল। ওখানে নিশ্চয়ই লোকজন আছে, নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে, ভাবল।

মার্টিনের হৃৎপিণ্ড খুব জোরে লাফাচ্ছে, পা ব্যথায় টনটন করছে। বাড়ির সদর দরজায় একটা বাতি জ্বলছে। ওর কাছে

বাতিটাকে লাইট হাউসের বাতির মত লাগছে। ওখানে যদি নিরাপত্তা পাওয়া যায়। মার্টিন ঘুরে নিশ্চিত হতে চাইল লোকটা ওকে অনুসরণ করছে কিনা। তারপর দৌড়াতে থাকল। ওর একটাই লক্ষ্য, যেভাবেই হোক বাড়িটায় ঢুকতে হবে।

দরজাটা কয়েক ফুট দূরে। বেপরোয়া গতিতে দরজায় লোহার কড়াটা ধরে নাড়তে লাগল মার্টিন। তারপর মুঠি পাকিয়ে দরজার গায়ে কিল মারতে লাগল। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেল, বাড়িতে নিশ্চয়ই কেউ নেই।

অবশেষে বাড়ির ভেতরে পদশব্দ শোনা গেল। শব্দটা দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। মার্টিনের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। দরজায় নব ঘোরার শব্দ শুনতে পেল। প্রচণ্ড শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

মার্টিন ভেতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত। তারপর জঙ্গলে দেখা কালো চকচকে চোখের সেই আগন্তুকের সাথে ওর দেখা হলো। লোকটা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি। হাসির ফলে তার শ্বদন্ত দেখা গেল।

'ট্রিক-অর-ট্রিট, মার্টিন,' আগন্তুক বলল।

মূলঃ জে.বি.স্ট্যাম্পার
রূপান্তরঃ তারক রায়

হরর গল্প লিখতে চেয়েছিলাম

বেশ কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন গল্পের প্লট মাথার মধ্যে ঘুরছে। ব্যাপারটা বিরক্তিকর। কল্পনায় নিজেকে দেখি অন্য একটা গ্রহে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আকাশের রঙ বেগুনি সেই গ্রহে। বড় বড় নীল রঙের গাছ। হিজিবিজি পাতা তাতে। দূরের মাঠে একটা বিশাল স্পেস শীপ ভেঙে পড়ে আছে। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকজন ভিনগ্রহের অধিবাসীর মৃতদেহ।

অথবা নিউ ইয়র্ক শহরে একা হাঁটছি আমি। পুরো শহরটা জনশূন্য। গবেষণাগারে নতুন একটা ভাইরাস আবিষ্কার করেছিল স্থানীয় বিজ্ঞানীরা। কীভাবে যেন কাঁচের জার ভেঙে সেই মৃত্যুভাইরাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরো পৃথিবীর সব মানুষ মারা গেছে। বেঁচে আছি আমি। একা।

একদিন পত্রিকায় পড়লাম–যেভাবে সমুদ্র দূষিত হচ্ছে, তাতে আগামী ৪০ বছর পর সমুদ্রে আর কোনও জীবিত প্রাণী, মাছ আর শেওলা থাকবে না।

আমি নিজে খুব নামকরা এক সীফুড রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি। খবরটা পড়ে বিশাল এক স্যামন হাতে নিয়ে ভাবছিলাম, তা হলে ৪০ বছর পর সীফুড রেস্টুরেন্টগুলোতে কী বিক্রি হবে? প্রোটিন দিয়ে তৈরি কৃত্রিম মাছের ফালি? চট করে একটা গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম।

আমাকে মাছ হাতে চিন্তা করতে দেখে আমার বস

চিলচিৎকার করে বলল, 'মাছটা কেটে রান্না করে ফেল, মিলন। ও মারা গেছে। এর জন্য এক মিনিট শোক পালন করার কোনও দরকার দেখি না।'

মুচকি হেসে মাছটাকে ফালি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

এরই মধ্যে টিংকু ভাই ওরফে কাজী শাহনূর হোসেনকে ফোন দিলাম। জানালাম, ভাই, কতগুলো সায়েন্স ফিকশন গল্প উড়ন্ত সসারের মত আমার মাথার ভেতর সাঁই সাঁই করে ঘুরছে। কী করব? টিংকু ভাই বললেন, 'মিলন, তুমি বরং দু-একটা হরর গল্প দাও দেখি! খুবই চাহিদা আধিভৌতিক গল্পগুলোর।'

'চাহিদা' কথাটা বেশ পছন্দ হলো আমার। চাহিদা মানে যোগানের তুলনায় সরবরাহ কম। আর সেই কাজে 'শাহনূর ভাই' আমার হাত চাইছেন! নাহ্, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে লাগল।

সায়েন্স ফিকশন দ্বীপান্তরে যাক। চট জলদি যোগাড় করে ফেললাম ডজন খানেক ভৌতিক উপন্যাস আর গল্প সংকলন।

সবই ইংরেজি।

স্থানীয় ভিডিও দোকান থেকে এক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসলাম পাঁচ কেজি ডিভিডি। সবই হরর। 'দ্যা একসরসিস্ট' থেকে 'ঘোস্ট রাইডার' পর্যন্ত। প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য এগুলো দরকার।

আমার জীবনে সম্পূর্ণ ভৌতিক যে বইটা প্রথম পড়েছিলাম তা হচ্ছে 'ভূতপেত্নি'। নিউজপ্রিন্টের ইয়া বড় এক বই। এক কথায় রোমহর্ষক। গল্পগুলো প্রায় সবই আজও মনে আছে। আজ এতগুলো বছর পর আবার শুরু করলাম ভূত চর্চা।

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টে রান্না করি। রাতে বাড়ি ফিরে গোসল আর খাওয়া শেষ করে রুমে হিটার

ছেড়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ি। বাইরে ঝুম ঠাণ্ডা। আর ঘরের ভেতর চলছে রক্তহীম করা ভয়াল সব ছবি। রুমে 'হোমথিয়েটার' থাকায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে প্রতিবেশি সবাই জেনে গেল, মিলনের মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সারাক্ষণ সে ভয়াল ছবি দেখছে আর সেরা ভৌতিক গল্প সংকলন পড়ছে।

মোটামুটি উপভোগ করছি। ইতিমধ্যে রাম গোপাল ভার্মার হরর ছবিগুলো পর্যন্ত দেখে ফেলেছি। ভিডিও দোকানের চালবাজ ছোকরা আমাকে 'কিংকং' ছবিটা পর্যন্ত গছিয়ে দিয়েছে। হারামী কোথাকার!

এরমধ্যে এক কলমও লিখিনি কিছু। তো, আসলে সব একই। বাংলাদেশে ভূতের গল্পের পটভূমি হয় অমাবশ্যা রাত আর টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরের দেশে হয় ভরা জোছনার রাত আর ঝুরঝুরে বরফ।

প্রতিটা জিনিসের একটা সাইড এফেক্ট আছে। আমারও হলো। একদিন বাড়িওয়ালা এসে বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার সমস্যা কী বল তো? দিনরাত শুধু হরর ছবি দেখছ, কারণটা কী?'

বাড়িওয়ালা বুড়ো আমার খুব ভাল বন্ধু। সব বললাম। উৎসাহে বগল বাজাতে লাগল বুড়ো। বলল, 'আরে, তুমি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করে লেখো না কেন? চমৎকার হবে। এই সব ক্রুস ফ্রুস, হলি ওয়াটার। কফিন, বাদুর, কালো যাদু, ডাইনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউলফ, জম্বি, ভুডু অনেক হয়েছে। নতুন কিছু করো।'

তাই তো। মুগ্ধ হলাম বুড়োর আইডিয়াতে। জলদি এক কাপ কফি ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'তা তোমার জানামতে কোনও ভৌতিক গল্প আছে নাকি?'

'থাকবে না কেন?' দাড়ি চুবিয়ে কফি খেতে খেতে বলল বুড়ো। 'এই বাড়িতেই তো একটা ঘটনা আছে। নীচ তলার বাম দিকের ১ নম্বর রুমটা আছে না। তাতে থাকত এক বুড়ি। দিনরাত মদ গিলত। একটা হাবা গোবা ছেলে ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না বুড়ির। প্রত্যেক রাতে মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে বাথরুমে যেত। এক রাতে বাথরুম থেকে ফেরার পথে কীভাবে যেন পিছলে পড়ে ঘাড় মটকে মারা যায় বুড়ি। সে প্রায় ১০ বছর আগের কথা। তারপর আর কী! এবাড়ির অনেক বাসিন্দা নাকি রাতের বেলা বুড়িকে হাঁটাচলা করতে দেখেছে। আমি অবশ্য দেখিনি। এটা একটা গল্প হতে পারে না?'

পারে। সায় দিলাম বাড়িওয়ালা বুড়োকে। ঠিক করলাম কিছু গল্প শুনতে হবে অন্যের মুখে। সত্যি ভূতের গল্প।

সে রাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। সিডনী শহরে আমি খুবই রুটিন মেনে চলি। ঠিক বারোটায় বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এখন বাজে রাত দুটো। পাশের ইলেকট্রিক ঘড়িতে টকটকে লাল সংখ্যায় দেখতে পাচ্ছি। পুরো বাড়িটা কবরখানার মত নিঝুম। শব্দহীন।

পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরের কাঠের বারান্দাতে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। হাঁটার শব্দটাও কেমন যেন অদ্ভুত। যেন পা টেনে টেনে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে কেউ। ব্যাপার কী?

প্রায় বছরখানেক এ বাড়িতে আছি। কাউকে এত রাতে বারান্দাতে হাঁটতে দেখিনি। শব্দও শুনিনি। বাধ্য হয়ে চট করে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দাতে। কাঠের চওড়া বারান্দা। ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে। তাতে সবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখলাম—বারান্দার শেষ

মাথায় দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধা। গায়ে ঘুমের পোশাক। সাদা চুলগুলো এলোমেলো। পচা লিচুর মত একজোড়া চোখ। মুখের চামড়া যেন মাকড়সার জাল। হাত পায়ের চামড়া কুঁচকানো। বাঁ হাতে সস্তা এক লাল মদের বোতল।

আমাকে দেখে ভয়াল হাসি দিল বুড়ি। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'সরি, ডারলিং, বিরক্ত করলাম বোধহয়। আসলে ঘুমুতে পারছিলাম না। চলবে নাকি এক পাত্র?

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ব্রেনটা জমে টক দই হয়ে গেছে।

অভিযোগের সুরে বুড়ি বলল, 'আর বোলো না ডারলিং, বাথরুমটা এত পিচ্ছিল যে একটু হলেই পড়ে গিয়ে ঘাড়টা মটকে যেত। তা খাবে নাকি এক পাত্র?'

বলেই আবার হাসল বুড়ি। তার ঘষা কাঁচের মত দুচোখে ঝিক করে উঠল অশুভ কী যেন!

চরম আতংকে ডুবে গেলাম। এই সেই বুড়ি! দশ বছর আগে মারা গেছে। পরিবেশটা যেন থমকে গেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব অশুভ আত্মাগুলো আজ এই বাড়িতে উঠে এসেছে। আজ এক ভয়াল রাত। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে আশপাশে। এই চরম অবস্থার মধ্যেও ঘাড় ফিরিয়ে নীচে তাকালাম। ওখানে দুজন বুড়ো বসা। খিকখিক করে হাসছে। একজন বুড়ো গলা উঁচিয়ে বলল, 'মিলন, ভালই হলো তুমি উঠে পড়েছ। নীচে চলে এসো।'

গলার স্বরটা আমার বাড়িওয়ালা বুড়ো মাইকেলের। সাথে আরেক বুড়ো-সে নীচতলার এক ভাড়াটে। বেকার অভিনেতা। এতরাতে বুড়োবুড়ির মেলা বসেছে নাকি? নাকি এই বুড়ো বাড়িওয়ালা আর বেকার অভিনেতা দুজনও মৃত! মারা গেছে অনেক আগে! আজ রাতে জেগে উঠেছে আমার জন্য!

এক বছরের বাচ্চার মত ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। আমার পেছন পেছন অনুসরণ করে এল সেই মরে যাওয়া বুড়ি। ওমা, নীচে দেখি দুই বুড়ো আসর বসিয়ে রেখেছে। সামনের টেবিল ভর্তি মাছের পিঠা, (ফিশ কেক), বাউল ভর্তি পাস্তা, চিংড়ি ভাজা। আর এক বোতল গ্রীক মদ।

'বুঝলে কিনা!' আসর জমানোর ভঙ্গিতে বলল বাড়িওয়ালা। 'আমার বান্ধবী হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে মেলবোর্ন থেকে। তো হোটেলে ওঠার কী দরকার। নিয়ে এলাম নিজেদের বাড়িতে। ছোট্ট একটা আয়োজনও করে ফেললাম। নাও এক ঢোক অজু (OUZO) খাও। কাল তো রবিবার। কাজ নেই। অসুবিধে হবে না।'

পরিষ্কার কাঁচের গ্লাস ভর্তি পানীয় এল, তাতে চমৎকার মৌরির সুগন্ধ। বেকার অভিনেতা তিমি মাছের মত গিলছে। আমার পাশে বুড়ি বসা। আকাশ ভর্তি তারা। চমৎকার একটা রাত।

ভয়ের বদলে আমার খুব রাগ হলো। ইচ্ছে হলো তিনটাকে একটা বস্তার ভেতরে ভরে দুরমুজ দিয়ে পিটাই। রাশিয়ান রূপ কথা গল্পগুলোতে দুষ্ট ভূতগুলোকে যেমন করা হত আরকী। ওহ্, কী ভয়টাই না পেয়েছি!

আসল ভয়ের ঘটনা ঘটল মাস খানেক পর। এক রাতে মাতাল হয়ে যখন বাড়ি ফিললাম। রাত তখন মাত্র দশটা। আমাদের বিশাল এই বাড়িটা রাত আটটার পরেই নিঝুমপুরী হয়ে যায়। আর মাঝে মধ্যেই সবাই যেন কোন্ চুলোয় চলে যায় এক সাথে।

রুমে ঢোকার আগে দোতলার কমন বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হবার জন্য। তারপর বাড়িওয়ালার

রুমে কফি খেতে খেতে লম্বা একটা আড্ডা দেয়া যাবে।

বাথরুমে ঢুকেই সোজা বেসিনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাতি না জ্বেলেই। এবং বুঝতে পারলাম আমি একা নই। আরও কেউ আছে। অস্বাভাবিক কিছু। হ্যাঁ। বেসিনের ডান দিকে যেখানে শুধু দেয়াল থাকার কথা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

বাথরুমে আলো নেই বটে। কিন্তু বাইরের বসার রুমের আলোতে সব দেখা যাচ্ছে। আমি হলফ করে বলতে পারি আমার জীবনে এমন বীভৎস আর কুৎসিত মুখ আগে কখনোই দেখিনি। চোখ দুটো পিশাচের মত। মুখটা পাথুরে। যেন মৃত মানুষ। ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি। আতংকের এক মুখোশ যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। শুধু মুণ্ডুটাই আছে তার। হাত পা, আর কিচ্ছু নেই।

আতংকে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও থেমে গেলাম। দৌড়ে প্রথমে বাতিটা জ্বাললাম। উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম লোকটা আর নেই। বদলে দেয়ালে সোনালী কাঠের একটা বড় ফ্রেম দেখা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর ডিজাইন করা।

বিরক্ত হয়ে বাড়িওয়ালার রুমে চলে এলাম। বেচারা তখন গ্রামোফোনে শিকাগো শহরের জ্যাজ শুনছে। আর তামাক পাতা দিয়ে সিগারেট বানাচ্ছে নিজের হাতে। আমাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বলল, 'দ্যাখো তুমি সবসময় অভিযোগ করো বেসিনের সামনের আয়নাটা ঝাপসা। চেহারা দেখা যায় না। তাই আজকে অনেক খুঁজে চমৎকার একটা আয়না নিয়ে এসেছি। ফ্রেমের কাজগুলো দেখলে মুগ্ধ হবে। জলদি বাথরুমে গিয়ে দেখে এসো। টাকা দিলেও আজকাল এমন জিনিস পাওয়া যায় না।'

হ্যাঁ, সায় দিলাম। টাকা দিলেও এমন ভয় পাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত নিজের চেহারা দেখে নিজেই ভয় পেলাম! নাহ, হরর ছবি দেখা বন্ধ করতে হবে দেখছি।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। হরর ছবি দেখা বন্ধ করেছি। শেষ যে ছবিটা দেখেছি সেটা লণ্ডনের পটভূমি। এক মহিলা পার্টি থেকে হালকা মাতাল হয়ে ইস্টিশনে এসেছিলেন ট্রেন ধরার জন্য। শীতের রাত। ইস্টিশনটা মাটির নীচে। মহিলা আর আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছে শেষ ট্রেনের জন্য। অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। ঘুম ভাঙার পর দেখেন শেষ ট্রেন চলে গেছে কবেই। বন্ধ হয়ে গেছে ইস্টিশন। বাইরে থেকে তালা দেয়া। সব লাইট অফ করা। ভেতরে আটকে আছেন তিনি। একা, না। তিনি একা নন। ভেতরে কেউ বা কিছু একটা আছে। অশরীরী কিছু একটা।

মাঝখানে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নতুন ধরনের কিছু খাবার ছাড়ার চেষ্টা করছিলাম রেস্টুরেন্টটায়। কিছু খুব ভাল চলছে, কিছু চলতে চাইছে না। আমার এক সাগরেদ আমাকে বলল, 'মামা, আমার স্টকে কিছু গল্প আছে। সত্য ঘটনা। শুনবেন। হানড্রেড পারসেণ্ট সত্য। ভয়ে পিলে (পিলেটা আবার কী জিনিস?) চমকে যাবে আপনার।'

তারপর সে টমেটু কাটা বন্ধ করে গল্প শুরু করল। গল্পটা এরকম:

অনেক আগের কথা। আমার এক মামা ছুটির দিনে মফস্বল থেকে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তিনি মফস্বলে চাকরি করতেন। মামি থাকতেন গ্রামে। সেদিন হাটবার থাকায় বিশাল এক ইলিশ মাছ কিনলেন মামা। মাত্র দশ টাকায়। আজকাল তো দশ টাকায় গুড়ের বাতাসাও কিনতে পাওয়া যায় না। মাছটার ফুলকোতে খড় কুটো দিয়ে তৈরি দড়ি ঢুকিয়ে হাতে নিয়ে

ঝুলাতে ঝুলাতে চললেন মামা। পিঠের পুঁটুলিতে মামির জন্য আলতা, কিছু কাঁচের চুড়ি, একটা সহজ রন্ধন প্রণালীর বই আরও টুকিটাকি কিছু জিনিস।

হাটটা শেষ হবার পর বিশাল এক মাঠ। আমরা বলতাম শ্মশানতলির মাঠ। এই মাঠের ঠিক মাঝখানেই আছে এক বটগাছ। জায়গাটা ভাল না। কিন্তু হ্যাঁ, আমার মামা ছিলেন খুব সাহসী মানুষ।

আমার সাগরেদের গল্প এ পর্যন্ত আসতেই আমি বাধা দিয়ে বললাম বটগাছের নীচে আসতেই তোমার মামাকে নাকি সুরে কেউ বলেছিল, 'এ্যাই মাঁছ দিয়ে যাঁ?'

সাগরেদের চোখদুটি দইবড়ার মত গোল্লা গোল্লা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে ওকে দেখাচ্ছিল ঢাকাই ছবির এক ভিলেনের মত। যে খুব মোটা, কালো আর ভয়াবহ নোংরা ভাষায় সংলাপ দেয়।

'আপনি কী করে জানলেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বেচারা।

'আরে হারামজাদা, এই গল্প আমি তেত্রিশ কোটিবার শুনেছি।' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললাম আমি। 'সবার মামার জীবনে ঘটেছে এ ঘটনা। সবাই ইয়া বড় মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল। গাছতলায় আসতেই কেউ তাদের কাছে মাছ চেয়েছিল। সবাই ছিল ভীষণ সাহসী। তাই মাছ না দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়ি ফিরে দেখে মাছটা পচা। সবার মামি তখন কড়াইতে তেল গরম করছিল মাছ ভাজার জন্য। এমন সময় জানালা দিয়ে কালো কুৎসিত একটা ভয়াল হাত ঢুকিয়ে সেই ভূতটা বলেছিল, "এই মাছ দে।" তখন মামি সেই হাতের মধ্যে গরম তেল ঢেলে দিয়েছিল বুদ্ধি করে। কারণ মামিও ছিল সাহসী। সাথে সাথে বিকট এক চিৎকার। পরদিন সকালে সবাই গিয়ে দেখে রান্নাঘরের পিছনে একটা কালো বাদুর বা কাক বা বেড়াল মরে

কাঁধে ট্রাডিশনাল কেয়ারটেকার।

বাড়ির ভেতরটা ভালই। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। যা আছে তাতে চলে যাবে। বিছানা, কম্বল রান্নাঘরের তৈজসপত্র এগুলো সব পর্যাপ্ত আছে। ভালই চলে যাবে এক সপ্তাহ। একজন কেয়ারটেকারকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালাম। ডিম, আলু, চাল, মুরগি এইসব কিনে আনতে।

একটা বিশাল ড্রয়িংরুম। তাতে সোফা বেড আছে। আরও আছে ছোট্ট দুটো ঘর। বাথরুম একটাই। তবে খুব সুন্দর। কল ছাড়তেই সরবতের মত ঠাণ্ডা পানি পড়তে লাগল। বাথরুমে পেতলের এক বড় বাথটাবও আছে। শহরতলিতে এমন নিঝুম জায়গাতে এত সুন্দর বাড়ি এর আগে কোথাও দেখিনি আমরা। বন্ধুবান্ধব সবাই বেশ হৈ হল্লায় মেতে উঠছিলাম। এই বিজনপুরী বেশ গরম হয়ে উঠল। রান্না করে খাওয়া শেষ করতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল। এমনিতে শীতের সন্ধ্যা তার উপর বাড়ির চারদিকে গাছপালার জঙ্গল থাকায় মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও শুনতে পাচ্ছি।

সবাই ড্রয়িংরুমে বসলাম। খোলা জানালা দিয়ে ঝুম ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সবার হাতে চায়ের কাপ। ভালই লাগছে। কেয়ারটেকার দুজন তাদের জন্য নির্ধারিত কোয়ার্টারে চলে গেছে। বাড়ির পাশেই।

শুরু হলো আমাদের তুমুল আড্ডা। বিষয়বস্তু নেই। তবে লক্ষ করলাম বন্ধু তমুক মানে যার বাড়িতে এসেছি অপেক্ষাকৃত সে একটু চুপ মেরে আছে। কারণটা অবশ্য জেনেছি একটু পরেই।

শীতকালে দুপুরে খাবার পর আমার একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আজ খুব ভোরে উঠে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে যাত্রা

শুরু করেছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই একটু ক্লান্ত লাগছিল আমার। এবং মজার ব্যাপার, জীবনের এই প্রথম আড্ডা মারতে মারতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। সোফাতেই।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ করেই। কেন কে জানে। রাত কটা বাজে তাও বলতে পারব না। বেশ সুনসান চারদিকে। নিঝুম। হঠাৎ অনুভব করলাম কামরাতে আমি একা। আমার বন্ধুদের কেউ নেই। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে এক ফালি চাঁদের আলো এসে ঘরের মেঝেতে জমাট হয়ে পড়ে আছে চীজ কেকের মত। তাতে হালকা হালকা দেখতে পাচ্ছিলাম সব।

আমাকে একা রেখে কোথায় গেল সবাই? ভাবতে ভাবতে আড়মোড়া ভাঙলাম। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি মেঝেতে কী একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে। ছোট্ট কী যেন। আরে, এ তো একটা বাচ্চা। একেবারে পিচ্চি। এখানে বাচ্চা এল কী করে। সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চাটা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই সাথে ওর মুখের বাইরে প্রায় বিঘতখানেক লম্বা লাল জিভ বের হয়ে লকলক করে ঝুলছে। সে এক ভয়াল দৃশ্য।

এবং এবার আবিষ্কার করলাম আমি চিত হয়ে সোফার উপর শুয়ে আছি। তার মানে? তার মানে বাচ্চাটা মেঝেতে নয় সিলিঙের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। টিকটিকির মত। অবিশ্বাস্য।

প্রচণ্ড আতংকে আমি কেঁপে উঠলাম। এ কী হচ্ছে। এক বিকট দর্শন শিশু। যার চোখ দুটো সাদা, কোনও মণি নেই। মুখটায় লাল রক্তের পোচ দেয়া। হামাগুড়ি দিচ্ছে সিলিঙের উল্টো দিকে। ভয়ে হাত পা জমে গেছে আমার। চেঁচিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই ডাকতে পারছি না। শুধু শুনতে পেলাম দূর থেকে কুকুরের ভয়াল একটানা ডাক। যে ডাকে কবর থেকে

কাঁধে ট্রাডিশনাল কেয়ারটেকার।

বাড়ির ভেতরটা ভালই। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। যা আছে তাতে চলে যাবে। বিছানা, কম্বল রান্নাঘরের তৈজসপত্র এগুলো সব পর্যাপ্ত আছে। ভালই চলে যাবে এক সপ্তাহ। একজন কেয়ারটেকারকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠালাম। ডিম, আলু, চাল, মুরগি এইসব কিনে আনতে।

একটা বিশাল ড্রয়িংরুম। তাতে সোফা বেড আছে। আরও আছে ছোট্ট দুটো ঘর। বাথরুম একটাই। তবে খুব সুন্দর। কল ছাড়তেই সরবতের মত ঠাণ্ডা পানি পড়তে লাগল। বাথরুমে পেতলের এক বড় বাথটাবও আছে। শহরতলিতে এমন নিঝুম জায়গাতে এত সুন্দর বাড়ি এর আগে কোথাও দেখিনি আমরা। বন্ধুবান্ধব সবাই বেশ হৈ হল্লায় মেতে উঠছিলাম। এই বিজনপুরী বেশ গরম হয়ে উঠল। রান্না করে খাওয়া শেষ করতে সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেল। এমনিতে শীতের সন্ধ্যা তার উপর বাড়ির চারদিকে গাছপালার জঙ্গল থাকায় মনে হচ্ছে রাত হয়ে গেছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও শুনতে পাচ্ছি।

সবাই ড্রয়িংরুমে বসলাম। খোলা জানালা দিয়ে ঝুম ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। সবার হাতে চায়ের কাপ। ভালই লাগছে। কেয়ারটেকার দুজন তাদের জন্য নির্ধারিত কোয়ার্টারে চলে গেছে। বাড়ির পাশেই।

শুরু হলো আমাদের তুমুল আড্ডা। বিষয়বস্তু নেই। তবে লক্ষ করলাম বন্ধু তমুক মানে যার বাড়িতে এসেছি অপেক্ষাকৃত সে একটু চুপ মেরে আছে। কারণটা অবশ্য জেনেছি একটু পরেই।

শীতকালে দুপুরে খাবার পর আমার একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আজ খুব ভোরে উঠে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে যাত্রা

শুরু করেছিলাম। স্বাভাবিক কারণেই একটু ক্লান্ত লাগছিল আমার। এবং মজার ব্যাপার, জীবনের এই প্রথম আড্ডা মারতে মারতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। সোফাতেই।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ করেই। কেন কে জানে। রাত কটা বাজে তাও বলতে পারব না। বেশ সুনসান চারদিকে। নিঝুম। হঠাৎ অনুভব করলাম কামরাতে আমি একা। আমার বন্ধুদের কেউ নেই। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে এক ফালি চাঁদের আলো এসে ঘরের মেঝেতে জমাট হয়ে পড়ে আছে চীজ কেকের মত। তাতে হালকা হালকা দেখতে পাচ্ছিলাম সব।

আমাকে একা রেখে কোথায় গেল সবাই? ভাবতে ভাবতে আড়মোড়া ভাঙলাম। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি মেঝেতে কী একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে। ছোট্ট কী যেন। আরে, এ তো একটা বাচ্চা। একেবারে পিচ্চি। এখানে বাচ্চা এল কী করে। সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চাটা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই সাথে ওর মুখের বাইরে প্রায় বিঘতখানেক লম্বা লাল জিভ বের হয়ে লকলক করে ঝুলছে। সে এক ভয়াল দৃশ্য।

এবং এবার আবিষ্কার করলাম আমি চিত হয়ে সোফার উপর শুয়ে আছি। তার মানে? তার মানে বাচ্চাটা মেঝেতে নয় সিলিঙের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। টিকটিকির মত। অবিশ্বাস্য।

প্রচণ্ড আতংকে আমি কেঁপে উঠলাম। এ কী হচ্ছে। এক বিকট দর্শন শিশু। যার চোখ দুটো সাদা, কোনও মণি নেই। মুখটায় লাল রক্তের পোচ দেয়া। হামাগুড়ি দিচ্ছে সিলিঙের উল্টো দিকে। ভয়ে হাত পা জমে গেছে আমার। চেঁচিয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাউকেই ডাকতে পারছি না। শুধু শুনতে পেলাম দূর থেকে কুকুরের ভয়াল একটানা ডাক। যে ডাকে কবর থেকে

উঠে আসতে পারে পৈশাচিক আত্মা।

হঠাৎ দেখলাম দরজার সামনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোমটা দেয়া এক মহিলা। মহিলা আবার এল কোত্থেকে? ইনি কি কেয়ারটেকার দুজনের কারও বউটউ? মহিলাকে দেখে সাহস ফিরে পেলাম। কিছু বলতে যাব, দেখি মহিলা উপরের দিকে তাকিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় বাচ্চাটাকে ডাকছে। যার অর্থ অনেকটা 'আয় বাবা,' ধরনের।

বাচ্চাটা দেয়ালের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নামল, তারপর দ্রুত গিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

মহিলা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যাবার সময় শুধু একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। সে চেহারা আজও আমাকে দুঃস্বপ্নে তাড়া করে। অর্ধেক মুখ ঠিক আছে তার। বাকি অর্ধেক বিকৃত। পচা। একটা চোখ নেই। অর্ধেক ঠোঁট না থাকায় অর্ধেক দাঁত বীভৎস ভাবে বেরিয়ে আছে। নাক নেই, সেখানে দুটো ছিদ্র।

এত কিছুর পরও শুনলাম মহিলাটা আঞ্চলিক ভাষায় বলছে, 'ভয় পাইয়েন না। পোলাডা আমার খুব চঞ্চল।'

আমি ভয় পাইনি। তবে ভয়ের সমুদ্রে সাঁতার কাটছি। যা ঘটছে চোখের সামনে তা যে স্বাভাবিক কিছু না। এটা অন্তত বোঝার মত মানসিকতা তখনও আছে আমার।

রান্নাঘর থেকে গুনগুন করে ঘুম পাড়ানি গানের শব্দ ভেসে আসছে তখন। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে হাত-পায়ের জড়তা কেটে গেছে। দৌড়ে বাইরে চলে এলাম। সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকছি বন্ধুদের। কোথায় গেল হারামজাদাগুলো।

অন্ধকারে ভূতের মত পেছনের জঙ্গলের কোয়ার্টার থেকে

বেরিয়ে এল কেয়ারটেকার দুজন। ভাত খাচ্ছিল বোধহয়। দুজনের হাতেই ডাল জাতীয় কী যেন মাখানো। ডান হাতে। ওরাই ধরাধরি করে বাগানের মধ্যে সিমেন্টে বাঁধানো বেঞ্চিতে বসাল আমাকে। একজন দৌড়ে লবণ গোলানো পানি নিয়ে এল টিনের হলুদ মগে করে। হাত-পা তখনও কাঁপছে আমার। একটু সুস্থির হবার পর প্রথম যে প্রশ্নটা আমাকে করল ওরা তা হলো—'স্যর, ভয় পাইছেন?' কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি বন্ধুরা ফিরে এল মাইক্রোবাস ভর্তি করে। সবাই খুশি। গঞ্জের কোনও বাজারে নাকি ব্যাটারি ভেজানো দেশি মদ পাওয়া যায়। খুব সস্তা, কিন্তু কড়া। তাই যোগাড় করতে গিয়েছিল একজন 'মদতি' বন্ধুর অনেক অনুরোধের পর। আমি ঘুমাচ্ছিলাম দেখে আর বিরক্ত করেনি। আমাকে রেখেই চলে গেছে।

বাড়িতে বিদ্যুতের লাইন ছিল না। টেবিলে একটা মোম জ্বেলে রেখে গিয়ে ছিল ওরা। সেটাও নাকি জ্বলতে জ্বলতে নিভে গিয়েছিল, তাই অবেলায় ঘুমানোর পর জেগে উঠে কী না কী দেখে ভয় পেয়েছি আমি। অথবা পুরোটাই দুঃস্বপ্ন।

সবাই হেসে উড়িয়ে দিল আমার কথা। কেউ বিশ্বাস করল না। সবাই মদ আর ডালভাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি একা বাইরে বসে রইলাম।

আর যাই হোক, তাই বাসার ভেতরে ঢোকার সাহস নেই আমার। সারারাত শীতের মধ্যে বাইরে থাকলাম আমি। আর বন্ধুরা হাসল আমাকে নিয়ে। সন্দেহ নেই মস্ত বড় মজার খোরাক দিয়েছি ওদের আমি।

রান্নাঘর হতে শুরু করে পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল দু'এক বন্ধু। নাহ্, কিচ্ছু নেই। থাকার কথাও নয়!

তবে কেয়ারটেকার দুজন আর বন্ধু 'তমুক' মানে যার বাড়ি

ওদের চেহারা দেখেই বুঝেছি আমি ওরা কিছু জানে।

পরদিন খুব সকালে চলে এলাম আমি। বাকি পাঁচজন খুব রেগে গেল আমার উপর। তারপরও আমি একাই ইস্টিশনে গিয়ে ট্রেনের টিকিট কিনে একাই বাড়ি ফিরলাম।

পুরো এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল ওদের। কিন্তু আমি চলে আসার দুই দিন পর বাকি সবাই একজন দুজন করে চলে এল। কেন জানি না। তবে শুনেছি সবারই কিছু না কিছু অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে বাড়িতে। ফিরে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত আমার দিনরাত্রি ছিল দুঃস্বপ্নে পরিপূর্ণ। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে কোনও এক অজানা কারণে আমাদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমরা ছয়জন। কে কোথায় গেল কেউ জানি না। কেউ কারও খোঁজ-খবরও রাখতাম না। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত বটে।

অনেকগুলো বছর কেটে গেল। আমি তখন মাত্র লণ্ডন গিয়েছি পড়াশোনার জন্য। এক দিন পিকাডেলিতে এক পুরনো বইয়ের দোকানে দেখা হলো বাবলুর সাথে। বাবলু আমাদের ছয়জনের একজন। সন্ধ্যায় ওকে নিজের বাসায় নিয়ে এলাম। রাতের খাওয়াটা খাইয়ে দেব, আর আড্ডা মারব। অতীত দিনের স্মৃতির জাবর কাটব।

খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর শুরু হলো আড্ডা। কত কথা যে জমে ছিল আমাদের। এবং অমোঘ নিয়তির মত প্রসঙ্গ উঠল সেই বাড়ি আর সেই সন্ধ্যার কথা। এবং এবার চুপসে গেল বাবলু।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে সাধল আমাকে, তারপর নিজে একটা ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগল নীরবে। অনেকক্ষণ

কেটে যাবার পর আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'তুই বাড়ির পেছনে কবর দুটো দেখেছিলি?'

অবাক হলাম আমি। শিরশির করে উঠল আমার গা-টা। 'মানে? কীসের কবর?'

আবার চুপ মেরে গেল বাবলু। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'বাচ্চা আর মেয়ে মানুষটার কবর দেখিসনি?'

অনুভব করলাম তলপেটের নীচে যেন দৈত্যের একটা হাত খামচে ধরেছে আমার পাকস্থলী। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি।

সিগারেট টানতে টানতে অলস সুরে বলল বাবলু, 'তুই চলে আসার পরদিন থেকে সবারই কিছু না কিছু ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওই বাড়িতে। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অথচ কেউ ভেতরে নেই। অনেকক্ষণ পর আপনাআপনিই খুলে গেল দরজা। গভীর রাতে কে যেন রান্নাঘরে হাঁটে। বাচ্চার হাসির শব্দ শোনা যায়। একঘেয়ে সুরে ঘুমপাড়ানি গান গায় কেউ। ফুঁপিয়ে কাঁদে কেউ। বাথরুমে বাচ্চার পায়ের ছাপ। আরও অনেক কিছু। প্রায় পাগল হবার দশা হয়েছিল আমাদের। একে একে ভয় পেয়ে ভেগে যায় সবাই। সবচেয়ে সাহসী যে আলম ও কী দেখেছে কে জানে। প্রায় বছর খানেক ভয়ে চমকে চমকে উঠত বেচারা।

আমি ভাগি তুই চলে আসার এক দিন পর। বিকেল বেলা বাগানের সবচেয়ে কাছের কোনটাতে গিয়েছিলাম শুকনো গাছের ডাল যোগাড় করতে। সন্ধ্যায় আগুনে ঝলসে বুনো হাঁস খেতাম। তখনই আবিষ্কার করি পুরনো কবর দুটো। গিয়ে ধরি কেয়ারটেকার দুই শালাকে। তলপেটে ঝেড়ে দুটো লাথি

মারতেই সব স্বীকার করল মিচকে শয়তান দুটো।

'কী স্বীকার করে?' প্রশ্নটা না করে আর পারলাম না।

'আবার কী?' শ্রাগ করল বাবলু। 'অনেক বছর আগে মা আর বাচ্চাটাকে খুন করা হয়েছিল। কোনও এক কেয়ারটেকারের বউ ছিল বেচারী।'

'কে করল কাজটা?' গলা শুকিয়ে গেছে আমার। আমার মনে হয় উত্তরটা আমিও জানি। দুপ দুপ করছে বুকের ভেতরে।

'আমাদের বন্ধু "তমুকের" বাবা।' শান্ত গলায় বলল বাবলু। 'মানে সেই উকিল সাহেব। বাড়ির মালিক।'

হাঁ করে বসে রইলাম। কেন যেন অবাক হলাম না একটুও।

উকিল সাহেব সপ্তাহে একদিন বাড়ির কাজ কতদূর হলো তদারক করতে মফস্বলে যেতেন। তখন সেখানে থাকত কেয়ারটেকার। তার সুন্দরী বউ আর বাচ্চাটা। তারপর সব যেমন হয়। কেয়ারটেকারকে বাজারে পাঠায় কিছু একটা আনার জন্য। ফাঁকা বাড়িতে বউটাকে ব্যবহার করে উকিল সাহেব। মাথা ঠাণ্ডা হবার পর বুঝতে পারে, ক্ষণিকের উত্তেজনায় কী ভুল করে ফেলেছে। খুন করে ফেলে বউটাকে। এমনকী অবুঝ বাচ্চাটাকেও। নিজের হাতে কবর দেয় বাড়ির পেছনে। আর কেয়ারটেকারকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় জেলের ভেতরে। কিচ্ছু হয়নি উকিল সাহেবের। সেই সময়ে সরকারি উচ্চ মহলে যোগাযোগ ছিল তার।'

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বাবলু।

'বাড়ি তৈরির পর কেউই থাকতে পারেনি সে বাড়িতে। ভয়াল সব অভিজ্ঞতা হয়েছে সবার। শুধু এই কেয়ারটেকার দুজন টিকে ছিল। কীভাবে যেন তারা জানে সবকিছু। কিন্তু সাহেব তাদের ভাল বখসিস দিয়ে মুখ বন্ধ রাখে। আজও ফাঁকা

পড়ে আছে সে বাড়িটা।'

'উকিল সাহেব কেমন আছেন?' আবার প্রশ্ন করলাম।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবলু: 'বাড়িটা বিক্রি করার জন্য বেশ চেষ্টা করেছিলেন। এক হবু ক্রেতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বাড়িতে। সন্ধ্যা বেলায় কী দেখে যেন ভয় পেয়ে হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। আর আমাদের বন্ধু "তমুক" বদ্ধ পাগল এখন।'

রোগা লোকটার গল্প শেষ হতেই মিনিট খানেক কাশল। তারপর মার্টিনির বোতলটা শেষ করে বিদায় নিল। সাগরেদ জানতে চাইল, 'মামা, কেমন লাগল কাহিনিটা? একদম সত্যি কিন্তু!'

'তুমি জানলে কী করে?' অবাক হলাম।

'না, মামা। ভদ্রলোকের মুখের কথা কি আর নোটারি করে সত্যায়িত করতে হয়? তা কেমন লাগল? চলবে?'

'উমম।' একটু ভেবে বললাম। 'চলে, তবে ঠিক হুবহু না হলেও এই ধারার আরও কিছু কাহিনি আমি শুনেছি।'

এরপর সাগরেদটাকে খণ্ড খণ্ড কয়েকটা কাহিনি শুনিয়ে দিলাম। দেখলাম ওর চোখ দুটো পান্তুয়ার মত বড় বড় হয়ে গেছে। মুখের হাঁ এত বড় হয়ে গেছে বিস্ময়ে, যে অনায়াসে একটা মাঝারি আকারের আনারস আস্ত ঢুকে যাবে।

পরের রোববার থেকে শুরু হলো নতুন নতুন গল্প কথকের আগমন। আমার ধারণা এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আমার দেয়া অঢেল মদের সরবরাহ।

কে কবে নানা বাড়িতে প্রস্রাব করতে গিয়ে রাতের বেলা কাকতাড়ুয়া দেখে ভয় পেয়েছে সে গল্প শোনাতেও লোকজন আসা শুরু করল আমার বাসায়। 'বুঝলেন, ভাই।

অমাবশ্যারাইত। চারিদিকে আলকাতরার মথন ঘুটঘুইটা আন্ধার।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাধ্য হয়ে দামি মদের পরিবর্তে সস্তা ওয়াইন কিনে আনতে লাগলাম। যার স্বাদ হুবহু বাচ্চাদের প্রস্রাবের সাথে চিনি মেশালে যা হয় একেবারে সে রকম। তাই সই। গল্প কথক গ্লাসের পর গ্লাস উড়িয়ে দেয়। আর জড়ানো গলায় বলতে থাকে ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা।

পাগল হবার দশা হলো আমার।

সব প্রায় এক কাহিনি।

কারও দাদার পোষা দুটি জিন ছিল। নাম কেরামত আর কালামত। এরা প্রত্যেক শুক্রবার রাতে দাদার জন্য রসগোল্লা, সন্দেশ, গোলাপ জাম, চমচম, আমিত্তি ইত্যাদি চেনা অচেনা হাজার রকমের মিষ্টি নিয়ে আসত। দাদা সবাইকে বলে দিয়েছে শুক্রবার রাতে কেউ যেন ছাদে না যায়। একবার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় শুক্রবার রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে ফোনে প্রেমালাপ করছিল তখন জিন দুটো তাকে বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় বসিয়ে দেয়। সেই থেকে আত্মীয়ের মুখ বাঁকা হয়ে গেছে। আর জিন দুটো আসা বন্ধ করে দিয়েছে। নইলে গল্প কথক আমাকে মিষ্টি খাওয়াতে পারত।

আরেকজন এসে শুনাল, তাদের বাড়ি মফস্বল শহরে। অনেক বনেদী বাড়ি। প্রত্যেক অমাবশ্যা রাতে বাড়ির ছাদে কিছু অশরীরীর আগমন ঘটে। সারা রাত ধরে চলে হাঁটা চলার শব্দ। কারা যেন যাচ্ছে আসছে। বড় বড় হাঁড়ি পাতিল টানা হেঁচড়ার শব্দ শোনা যায়। বড় পাতিলের ভেতরে নৌকার বৈঠার মত বড় খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। কিন্তু ছাদে গেলে সব সুনসান। কিছু নেই। কাউকে দেখা যায় না। ফিরে এলে

আবার শুরু হয়। এবং এরপর বাতাসে ভুর ভুর করে ভেসে আসে বিরিয়ানী পোলাও ইত্যাদি খাবারের সুঘ্রাণ। অথচ কেউ কোথাও নেই। পরদিন ভোরে ছাদে পাওয়া যায় এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি এই সব টুকরো টাকরা মসলা। যা গতরাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকজনের মুখে শুনলাম তারা একটা সস্তা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠেছিল শহরতলিতে। খুবই পুরনো বাড়ি। এবং বেশ নিঝুম। অতি-প্রাকৃত গল্পের জন্য যা দরকার। সেখানে ভদ্রলোক আর তার স্ত্রী মাত্র দুজন থাকত। তারা মাত্র দুই মাস সে বাসায় ছিল। তারপর অ্যাডভান্সের টাকা ফেলে চলে আসে। কারণ? এই দুই মাসের প্রতিটা মুহূর্তে তারা অনুভব করেছে তারা ওই বাড়িতে একা নয়। কিছু বা কেউ তাদের সঙ্গে আছে। সেই কিছুটার পায়ের শব্দ পেত তারা। গভীর রাতে বারান্দাতে হাঁটত। বাথরুমের ভেতরে ট্যাপ খুলে পানি ছাড়ত। সময় অসময়ে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেত তারা। দীর্ঘ দুই মাস এই অদৃশ্য তৃতীয় জনের সাথে থেকে পালায় তারা। খোঁজ করে আগের ভাড়াটিয়ার কাছে। হুবহু মিলে যায় তাদের অভিজ্ঞতা। এর পরের ভাড়াটিয়া যারা আসে তাদেরও নাকি একই অভিজ্ঞতা হয়। শুধু বাড়িওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলে, 'সবাই মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে।'

আমার ছুটির দিনটা সত্যি বলতে কী উপভোগই করেছিলাম। তবে শেষের দিকে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। ক্রমাগত একই ধরনের কাহিনি চলে আসছিল।

একদিন এক ট্যাক্সি ড্রাইভার ভদ্রলোক এলেন। ইয়া মোটা। আর কাঠ কয়লার মত কালো। সিডনি শহরে আছেন দীর্ঘদিন। আগে তিনি দীর্ঘ অনেকগুলো বছর রাতে ট্যাক্সি ক্যাব চালাতেন।

তাতে পয়সাটা একটু বেশি পাওয়া যায়। টিপসও। আর ট্রাফিক জ্যামেও কম পড়তে হয়। কিন্তু একবার এক ঘটনার পর তিনি ভুলেও রাতের বেলা ক্যাব নিয়ে বের হন না। বাকি জীবনেও নাকি হবেন না। ঘটনাটা আমাকে বলতে এসেছেন।

'সেদিন ছিল রোববার,' ভদ্রলোক শুরু করলেন তাঁর কাহিনি। 'আমি সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাব নিয়ে বের হই। সারারাত চালিয়ে শিফট শেষ করি পরদিন সকাল সাতটায়।

'সেদিন একটু বেশি শীত পড়ায় রাস্তাঘাট ছিল ফাঁকা। প্যাসেঞ্জার তেমন একটা পাচ্ছিলাম না। তারপরও কফি খেয়ে আর F.M রেডিও শুনে সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত এগারোটা গড়িয়ে গেল। আশ্চর্য হলাম। কোনও কাস্টমার নেই। সবাই বাসায় বসে টিভিতে রাগবি খেলা দেখছে নাকি?

'রাত সাড়ে এগারোটার দিকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের 'দ্যা রক' ডিসকো থেকে বের হয়ে এল তিন যুবতী। অপূর্ব সুন্দরী। লম্বা। ফর্সা। তিনজনের পরনে কালো গাউনের মত হাতাকাটা ড্রেস। ককটেল পার্টিগুলোতে মেয়েরা যে পোশাকগুলো পরে। এক রঙা।

'তিনজনে পেছনের সিটে উঠে বসার পর জানতে চাইলাম কোথায় যাবে। যে জায়গার নাম বলল সেটা নিউ ক্যাসেল (New Castle) ছাড়িয়ে অনেক দূর। বেশ গ্রামের মত জায়গা। খুবই নিঝুম। অন্য সময় হলে হয়তো গড়িমসি করতাম। কিন্তু আজ ভাঁড়ে মা ভবানী। না করলাম না, মিটারে ভালই উঠবে। তারপর দশ ডলার ও যদি টিপস দেয়...

'ক্যাব চলতে লাগল। আর পেছনে চুপচাপ বসে রইল তিন সুন্দরী। ব্যাপারটা অদ্ভুত। একেবারে পাথর হয়ে আছে। ক্যাবে

যারাই বসে তারাই মুখে খই ফুটায়। তার উপর রবিবার রাতে ডিসকো থেকে ফিরছে! বয়ফ্রেণ্ডদের সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি? তিনজনেরই? নাকি অন্য কিছু।

'কয়েকবার চুপিচুপি ভিউ মিররে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। দেখলাম এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তিনজন। আমারই দিকে। অদ্ভুত চাউনি। কেমন যেন শিরশির করে উঠল গা-টা। একটু ভয়ও পেলাম।

'গাড়ি চলতে লাগল। নীরবতা বেশ অস্বস্তিকর লাগছিল। তাই F.M রেডিওটা চালু করলাম। সারা সন্ধ্যা যেটা বাজছিল। এখন দেখি উল্টো। একটাও স্টেশনে ধরছে না। কুঁই কুঁই শব্দ করছে। মিনিট খানেক নব ধরে ঘাঁটাঘাঁটির পর হাল ছেড়ে দিলাম।

'এবার গাড়ির ভেতরে কেমন যেন একটা বাজে গন্ধও পেতে লাগলাম।

'কেমন যেন একটা বোটকা গন্ধ। অথচ আমার খুবই পরিচিত। বেশ করে এয়ার ফ্রেসনার ছড়িয়ে দিলাম গাড়িতে। তেমন একটা লাভ হলো না।

'সুন্দরী তিনজনের দেখানো রাস্তা ধরেই যাচ্ছিলাম। অনেক আগে এসেছি এখানে। বেশ অচেনা লাগছে সব কিছু। শেষ পর্যন্ত বিশাল এক গেইটের সামনে এসে গাড়ি থামাতে বলল তিনকন্যা।

'গাড়ি থেকে নেমে চটপট দুজন ঢুকে গেল ফটকের ভেতরে। তৃতীয়জন যে অপেক্ষাকৃত বেশি সুন্দরী আমার দিকে চেয়ে মদির হাসি হাসল। জানতে চাইল আমি মিনিট খানেক অপেক্ষা করতে পারব কিনা? ভেতর থেকে টাকা এনে পরিশোধ করবে আমাকে!

'না বলি কী ভাবে? এরকম হরহামেশাই হয়। নিশ্চয় ডিসকোতে গিয়ে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে! রাজি হলাম। আমার দিকে অদ্ভুত এক চাহনি দিয়ে ফটকের ভেতরে ঢুকে গেল শেষ জন।

'বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। গাড়ির ইঞ্জিন চালুই আছে। সময় চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে পাঁচ-ছয় মিনিট হয়ে গেল। ক্রমেই অধৈর্য বোধ হতে লাগল আমার। ব্যাপার কী? কোথায় গেল ওরা?

'ভাল করে তাকালাম ফটকটার দিকে। বিশাল লোহার তৈরি। বড় শেকল দিয়ে বাইরে বিশাল এক তালা লাগানো। আর ফটকটার দুই দিকে চলে গেছে উঁচু লম্বা এক দেয়াল। সম্ভবত ফটক খুলে কয়েক কদম হেঁটে গেলেই ওদের বাড়ি। ধনীদের বাড়িগুলো যেমন হয়।

'কিন্তু কোনও আলো নেই কেন? এত বিশাল বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে, ব্যাপারটা অবাকই লাগছে আমার। আরও মিনিট দুয়েক বসে রইলাম। দু'একটা হর্নের শব্দও করলাম। আশপাশে কোনও বাড়ি-ঘর নেই। কাজেই হর্নের শব্দে কেউ বিরক্ত হবে না।

'হঠাৎ করে একটা কথা মনে হতেই হৃৎপিণ্ডটা দুটো বিট মিস করল। ফটকে তো তালা মারা, তা হলে তিনকন্যা ভেতরে ঢুকল কী করে?

'তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। দৌড়ে গেলাম ফটকের সামনে। দুহাত দিয়ে ফটকটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠলাম, "হেই। কোথায় তোমরা?"

'মোটা লোহার গ্রিল দিয়ে ফটকটা তৈরি। কাজেই ভেতরের সব কিছুই দেখা যাচ্ছিল। নক্ষত্রের আলো, দূরের ল্যাম্প

পোস্টের আলো। আর গাড়ির হেড লাইটের জন্য সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ফটকের ভেতরে বিশাল শূন্য জায়গা। কোনও বাড়ি ঘর নেই। বদলে চারকোনা উঁচু বেদীর মত কী যেন। অসংখ্য। আর প্রত্যেকটার উপর সিমেন্ট বা পাথরের তৈরি ক্রুস।

'কবরখানা।

'কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। বিশাল এক গোরস্তানের বন্ধ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। একা। আশপাশে মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতিও নেই।

'কীভাবে বাড়ি ফিরেছিলাম সে রাতে আজ আর মনে নেই। তবে বাড়ি এসেই জ্বরে পড়ে গিয়েছিলাম। টানা সপ্তাহ খানেক পর উঠে ক্যাব চালানো কাজে ইস্তফা দিয়ে একটা হোটেলের থালাবাটি ধোয়ার কাজ নিলাম। এখন মাঝে সাঝে ক্যাব চালাই। তবে শুধু দিনের বেলা। আর রোববার সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বেরই হই না।'

মোটা কালো লোকটা গল্প শেষ করে চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কী মনে হয়? মানে ডিসকোতে যাবার জন্য ট্যাক্সি ক্যাব পেয়েছিল কোথায় সেই তিন অশরীরী কন্যা?'

লাল চোখে আমার দিকে তাকালেন কালু। রেগে গেছেন। না মদের কারণে চোখ লাল কে জানে! বিড়বিড় করে কী বললেন ঠিক বুঝলাম না। টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন রুমের বাইরে। তারপর হড় হড় করে বমি করে ফেললেন।

সেটাই ছিল আমার শেষ গল্প শোনার আসর। বাড়িওয়ালা বুড়োর জন্য আসর বন্ধ করে দিতে হলো। বুড়ো বিরক্ত হয়ে একদিন বলল, 'তুমি কি সমকামী নাকি?'

ভয় পেয়ে গেলাম আমি। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'কেন, কেন?'

'আরে এত সুন্দর বিকেলগুলো তুমি ভৌতিক গল্প শোনার নাম করে কতগুলো ছাগলপাগলের সাথে সময় নষ্ট করছ।' বিরক্ত ভাবে বলল বুড়ো। 'এক পাতাও তো লিখতে দেখলাম না। ইয়াংম্যান তুমি। সুন্দরী কোনও মেয়ের সাথে রোববারের বিকেল আর সন্ধ্যাটা তো কাটাতে পারো। তারপর তাকে নিয়ে ডিনারে যেতে পারো। তারপর তাকে নিয়ে...'

'থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। বাধা দিলাম বুড়োকে। সত্যিই তো। আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করি তার পাশের রেস্টুরেন্টের সেই সুন্দরী থাই মেয়েটা কতদিন আমার সাথে বাইরে বেরুতে চেয়েছে। আমি ব্যস্ততার অজুহাতে এড়িয়ে গেছি। নাহ্। সকলই গরল ভেল। আজ থেকে বাদ ভৌতিক গল্পের আসর। হরর গল্প লেখা আমার কাজ নয়। কাজী শাহনূর হোসেনকে একটা ছাতামাথা বুঝিয়ে দিলেই হবে।

পরের দিন একজন ফোন দিল, 'ভাই, পুরনো ঢাকাতে আমরা যে বাসায় থাকতাম। আমার বিছানার নীচে রোজ রাতে একটা মরা লাশ এসে ঘুমাত। গল্পটা শুনবেন?'

আমি হতাশ ভাবে বললাম, 'ভাই, আপনি তো এখন সিডনীতে। লাশটা ঘুমুক না। অসুবিধে কী?'

দুদিন পর রেস্টুরেন্টে কাজ করছি। হাতে সের তিনেক রসুন। মাখন দিয়ে গার্লিক সস বানাতে হবে। এমন সময় সাগরেদ হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসে বলল, 'মামা, খবর শুনেছেন?'

'কী হলো?' অবাক হলাম। 'আবার খদ্দেরের খাবার পুড়িয়ে ফেলেছ?'

'আরে রাখেন আপনার খাবার।' রেগে গেল শান্তশিষ্ট সাগরেদ। 'খবর রাখেন আপনি? প্রায় তিনশোর বেশি

অস্ট্রেলিয়ান যে মানুষের রক্ত পান করে?'

ধারণা করলাম, অতিরিক্ত কাজের চাপে সাগরেদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে সবজান্তা মার্কা হাসতে দেখে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আনল সাগরেদ। কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা। ধরিয়ে দিল আমার হাতে।

প্রিন্টআউটটা পড়তে পড়তে চোখ-মুখ কুঁচকে গেল আমার। মেলবোর্ন শহরের ক্রিসপয়সন নামে এক মহিলা নাকি তার স্বামীকে এতই ভালবাসে যে ভালবাসা প্রকাশের জন্য স্বামীর রক্তপান করে মাঝে মধ্যেই। স্বামী বেচারারও এতে কোনও আপত্তি নেই। এটাও ভালাবাসার বহিঃপ্রকাশ। ইন্টারনেট পত্রিকা 'স্টাফ ডট কো ডট জেড' জানিয়েছে, তিনশো অস্ট্রেলিয়ান এই রকম রক্ত পান করে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর। দীর্ঘ দিন ধরে গোপনে চলছে এ রকম একটি গুপ্তচক্র।

ভয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা মেরে গেল আমার। এ আবার কী রকম অনাসৃষ্টি। তাকিয়ে দেখি পাশের এক টেবিলে এক জোড়া দম্পতি। বসে বসে গ্লাস ভর্তি রক্ত পান করছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, নাহ্ একজন টমেটুর জুস আরেকজন ব্লাডিমেরী পান করছে। প্রচুর টমেটুর রস, ভদকা আর ওয়েস্টার শেয়ার দিয়ে তৈরি ককটেল আর কী! এমন সময় আমার বাড়িওয়ালা এসে হাজির হলো। সপ্তাহে একদিন বুড়ো এসে এখানে খায়। আমাকে রসুন নিয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কী ব্যাপার? রসুন দিয়ে মালা বানিয়ে বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখবে নাকি? কাউন্ট ড্রাকুলার আজ রাতে তোমার বাসায় আসার কথা বোধ হয়!'

যেন মস্তবড় এক কৌতুক বলে ফেলেছে এমন ভাব করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল বুড়ো। আমি কিছু না বলে প্রিন্ট

করা কাগজটা বুড়োর হাতে ধরিয়ে দিলাম।

চুপচাপ পড়ল বুড়ো। তারপর রেগে গেল।

'যত্তোসব ফালতু কথা,' বলল সে। 'দেখো মিলন, তুমি বরং বাংলাদেশি ভূতের গল্প লেখো। কিন্তু ভুলেও অস্ট্রেলিয়ানদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখবে না। এই আমি বলে দিলাম। যদি লেখো তা হলে তোমাকে আমার বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। মনে রেখো এর চেয়ে সস্তায় বাড়ি আর সিডনী শহরে পাবে না।'

কথাটা বুড়ো মিথ্যে বলেনি!

ভাবছি।

মিলন গাঙ্গুলী

কাল কি আমার বিয়ে হবে?

পায়ের ছাপ—পায়ের ছাপ—মরা মানুষের পায়ের ছাপ। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ছাপগুলো! লম্বা হলওয়ে ধরে চলে গেছে ভৌতিক পদচিহ্ন, আমি ছাপগুলোর পেছন পেছন চলেছি। থপথপ শব্দ হচ্ছে আর মার্বেল পাথরের মেঝেয় ফুটে উঠছে ওই কুৎসিত ছাপগুলো।

আমি কাদামাখা জুতো দিয়ে ছাপগুলো মাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি, মুছে ফেলতে চাইছি। কিন্তু মরা মানুষের পায়ের ছাপ কেউ কোনদিন মুছতে পেরেছে?

ভৌতিক পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আর সে সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে অতীত দিনের স্মৃতি।

রাত এখন একটা। বাইরে ঝুম বৃষ্টি। জানালার কাচে ঝাপটা মারছে বাতাস এবং বৃষ্টির ফোঁটা। বাগানের শেষ মাথার লম্বা এলম গাছগুলো বৃষ্টিতে ভিজছে, বাতাস হু হু আর্তনাদ তুলে বয়ে যাচ্ছে বৃক্ষসারির মাঝ দিয়ে। আমি এলম গাছের কান্নার শব্দ বুঝতে পারি। সে রাতেও এরকম ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। তখন অক্টোবর মাস। ঝড়ের শব্দে বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসেছিল আমার প্রথম স্ত্রী।

'ওহ্, ওই ভয়ঙ্কর এলম গাছগুলো!' কাতরে উঠেছিল সে।

'এমন বিশ্রী শব্দ করে, গায়ে কাঁটা দেয়। যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে কোন নারী। তুমি ওগুলো কেটে ফেলছ না কেন, ফ্রাঙ্ক?' আমি ওকে বলেছিলাম গাছগুলো কেটে ফেলব। আমার প্রথম স্ত্রী মারা গেল। কিন্তু অক্ষত রইল গাছগুলো। ইচ্ছে করেই কাটিনি। বুড়ো এলমদের সঙ্গীত শুনতে ভাল লাগে আমার। বিষয়টি অদ্ভুত; স্ত্রীর শোকে আমার বুকটা খালি হয়ে গেছিল কারণ তাকে খুব ভালবাসতাম আমি, আর সে আমাকে তার সারাজীবন এবং শক্তি দিয়ে ভালবেসে গেছিল অথচ আমি কি না আবার বিয়ে করতে যাচ্ছি।

'ফ্রাঙ্ক, ফ্রাঙ্ক, ভুলো না আমায়!' আমার স্ত্রীর শেষ কথা ছিল এগুলো। যদিও আগামীকালই আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসছি। তবে আমার প্রথম স্ত্রীর কথা ভুলিনি আমি। যেমন কোনদিন ভুলব না সেদিনটির কথা যে দিন অ্যানি গাথরি (যাকে আমি এখন বিয়ে করব) আমার প্রথম স্ত্রীকে দেখতে এসেছিল। আমার স্ত্রী এর পরের দিনই মারা যায়। অ্যানি আমাকে বেশ পছন্দ করত আর আমার স্ত্রীও ব্যাপারটি জানত। অ্যানিকে চুম্বন করে ওকে বিদায় দেয়ার পরে সে ফিসফিস করে বলছিল, 'ওই যে তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী যাচ্ছে, ফ্রাঙ্ক। আমার বদলে ওকেই বরং তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল। ও আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী এবং ভাল। ও বেঁচেও থাকবে অনেকদিন; আমার মত অসুখে ভুগে ওকে মরতে হবে না।' মৃদু হেসে আমার প্রথম স্ত্রী যোগ করেছিল, 'ওহ্, ফ্রাঙ্ক, প্রিয়তম, অ্যানি গাথরিকে বিয়ে করার সময় আমার কথা কি মনে পড়বে তোমার? কিন্তু আমি যেখানেই থাকি, সবসময় তোমার কথা মনে রাখব।'

এখন সে সময়টা এসেছে। ঈশ্বর জানেন, আমি আমার প্রথম স্ত্রীর কথা ভেবেছি। ওই পায়ের ছাপ এবং শব্দ আমরা মাঝে

মাঝে দেখেছি এবং শুনেছি। কিন্তু আজ রাতে বড্ড পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পদচিহ্নগুলো। তবে এসব আর দেখতে চাই না, পায়ের শব্দও শুনতে চাই না। আমি এখন বিছানায় যাব, একটু ঘুমাবার চেষ্টা করব। সেই তরুণ বয়স আর নেই, আগের মত শক্তিও নেই গায়ে, ওই বিয়েটা আমার সব শক্তি কেড়ে নিয়েছে। বিয়েটা দ্রুত হয়ে গেলেই বাঁচতাম অথবা না হলে আরও ভাল হত।

কী ওটা? নাহ্, বাতাসের শব্দ নয়, বাতাস ওরকম আওয়াজ তোলে না, বৃষ্টির শব্দ হওয়ারও প্রশ্ন নেই। কারণ বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক আগে; এমনকী ওটা কুকুরের প্রলম্বিত সুরের ডাকও নয়। মনে হচ্ছে কেউ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, কোন নারী। এ সময়ে এরকম ঝড়-বৃষ্টির রাতে—রাত দেড়টার সময় কোন্ নারী ঘরের বাইরে এসে কাঁদবে?

ওই যে আবার শোনা যাচ্ছে শব্দটা—ভয়ঙ্কর একটা শব্দ; গায়ের রক্ত হিম করে দেয়। হ্যাঁ, নারী কণ্ঠ বলেই তো মনে হচ্ছে। এবারে আর কাঁদছে না, নাম ধরে ডাকছে। কেমন চেনা চেনা লাগছে কণ্ঠটা। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, আর একটু পর পর ডাকছে। ওই তো জানালার কাছে চলে এসেছে সে, জানালার কাচে নখ দিয়ে আঁচড় কাটল। ঈশ্বর! ও আমার নাম ধরে ডাকছে।

'ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক!' ডাকছে ও।

আমি লাফ মেরে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে, জানালাটা খুলতে যাচ্ছি, খচরমচর শব্দ হলো আরেকটা জানালায়। ওই জানালায় দাঁড়িয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকল।

ভৌতিক একটা কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল, 'ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক!'

এবারে সদর দরজায় চলে এসেছে সে। ভয়ে আধমরা আমি পড়িমরি ছুটলাম লম্বা, অন্ধকার হলঘর ধরে, দরজা খুলতে। কিছু নেই—কোথাও কেউ নেই, শুধু শোঁ শোঁ করে ছুটে এল শীতল বাতাস। পোর্টিকোতে টপ টপ শব্দে ঝরছে বৃষ্টি। কিন্তু আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি নারীকণ্ঠের ওই বিলাপধ্বনি। হাহাকারটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িময়, ঝোপের আড়াল থেকেও ভেসে এল বিকট কান্নার সুর। দরজা বন্ধ করে কান পাতলাম। ওই যে, ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে বাড়ির আঙিনায় চলে এসেছে সে, এখন গেছে খিড়কির দুয়ারে। ও যে-ই হোক, এ বাড়ির অলিগলি সব তার নখ-দর্পণে। আমি আবার হলঘরে পা বাড়ালাম, ভৃত্যদের ঘর পার হয়ে, রান্নাঘরের সিঁড়িতে ঠোকর খেতে খেতে ভেতরে ঢুকলাম। এখানে উনুনে আগুন জ্বলছে, ঘরটা ঈষৎ উষ্ণ, থিকথিকে আঁধার খানিকটা হলেও দূর হয়েছে।

ওই মহিলা, যে-ই হোক সে, মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে শক্ত কাঠের দরজায় ঘুসি মারতে শুরু করেছে। যদিও খুব জোরে ঘুসি মারছে না সে তবে শূন্য রান্নাঘরে ওই শব্দটাই সজোরে প্রতিধ্বনি তুলল।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, থরথর করে কাঁপছি; দরজা খোলার সাহস নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে একা আমি বেঁচে আছি আর সবাই মরে গেছে।

'ফ্রাঙ্ক! ফ্রাঙ্ক!' পরিচিত সুরে চিৎকার করল নারীকণ্ঠ। 'দরজা খোলো; আমি শীতে জমে গেলাম। আমার হাতে সময় খুব কম।'

আমার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেছে, তবে আমার হাত আদেশ পালন করল। ধীরে, খুব ধীরে দরজার ছিটকিনি

তুললাম, ফাঁক করলাম দরজা। সাথে সাথে বাতাসের তীব্র ঝটকা আমার হাত থেকে যেন ছিনিয়ে নিল কবাট, হাঁ করে খুলে দিল দরজা। মাথার ওপরে কালো মেঘের ঝাড়, তার ফাঁকে এক চিলতে নীলচে, বৃষ্টি ধৌত আকাশ। আর তার মাঝে একটি দু'টি তারা মিটমিট করে জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্য শুধু আকাশটাই দেখলাম আমি, তারপর নজর স্থির হলো আকাশের গায়ে ফুটে থাকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের সারিতে, তীব্র ঝড়ো হাওয়ায় পাগলের মত ওগুলো মাথা নাচাচ্ছে। আর গাছের নীচে বাগানের দেয়াল। বাতাসে উড়ে আসা একটি পাতা বাড়ি খেল আমার মুখে, নিজের অজান্তেই চোখ চলে গেল ছোট্ট কালো, ভেজা একটি মূর্তির দিকে, যাকে এতক্ষণ ঠাহর হয়নি।

'কী তুমি?' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ বেরুল আমার গলা থেকে। প্রথম দর্শনে ওটাকে আমার মনুষ্য মূর্তি বলে মনে হয়নি। 'কে তুমি?'

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?' হাহাকার করে উঠল কণ্ঠটি, সেই চেনা গলায়। 'আমি আর ভেতরে যেতে পারব না। সে সময় নেই। তুমি দরজা খুলতে এত দেরি করলে কেন, ফ্রাঙ্ক? আমি শীতে জমে যাচ্ছি—ওহ্, কী ঠাণ্ডা! ওই যে দ্যাখো, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে চাঁদ। এখন তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তুমি নিশ্চয় আমাকে দেখার জন্য মুখিয়ে আছ, যেভাবে তোমাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছি আমি।'

মূর্তিটি কথা বলছে, আসলে বিলাপের মত একটা ধ্বনি উঠছে বললেই মানায় বেশি, এমন সময় জলে ভেজা বাতাসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে এক চিলতে জোছনা পড়ল তার গায়ে। ছায়ামূর্তি আকারে ছোটখাট এবং সংকুচিত, ক্ষুদ্রাকৃতি এক মহিলাকে ঠাহর হলো চোখে। তার আপাদমস্তক কালো পোশাকে

আবৃত, মাথা ঢেকে রেখেছে কালো ঘোমটায়। ঘোমটা এবং পোশাক থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে পানি।

মহিলার বাঁ হাতে ছোট একটি ঝুড়ি, চাঁদের আলোয় হাতটা ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছে। লক্ষ করলাম তার অনামিকায় লালচে একটা দাগ, একদা যে বিয়ের আংটি শোভা পেত ওতে, তার প্রমাণ। অপর হাতটা প্রসারিত করে রেখেছে সে মিনতির ভঙ্গিতে।

পুরো দৃশ্যটি দেখে নিলাম এক পলকে আর তখুনি তীব্র একটা ভয়ের অনুভূতি আমার গলা টিপে ধরল। মনে হচ্ছিল ওটা জ্যান্ত কিছু, কারণ চেনা-চেনা কণ্ঠটির মত ছায়ামূর্তিটিও যে বড্ড চেনা ঠেকছে, যদিও একে কবর দেয়া হয়েছে অনেক আগে। আমার শুকিয়ে থাকা গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরুল না—নড়াচড়ার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

'ওহ্, তুমি এখনও চিনতে পারোনি আমাকে?' কাতরে উঠল কণ্ঠটি। 'আমি কতদূর থেকে এসেছি তোমাকে একনজর দেখব বলে। নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারিনি। দ্যাখো, আমাকে দ্যাখো।' ব্যস্ত হাতে সে সরু, কংকালসার হাত দিয়ে মাথার ওপর থেকে সরিয়ে দিল কালো ঘোমটা। আমি দেখলাম তাকে। যেন স্বপ্নের মাঝ দিয়ে দেখছি, মনে মনে যা ভেবেছিলাম তা-ই দেখতে হলো—সাদা, পাণ্ডুর একটা মুখ। মাথায় হলুদ চুল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার মৃতা স্ত্রী। কথা বলতে পারছি না, পারছি না নড়তে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম মুখটার দিকে। কোন সন্দেহ নেই এ সে-ই, তাকে শেষবার যখন দেখেছিলাম, সেরকম সাদা মুখ, চোখের চারপাশে বেগুনি দাগ, তার থুতনির নীচে এখনও কাফনের কাপড় গোঁজা। শুধু সে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, স্থির চাউনি আমার

মুখে। বাতাসে হলুদ রঙের কেশগুচ্ছ এলোমেলো।

'তুমি আমাকে এখন চিনতে পারছ, ফ্রাঙ্ক—বলো চিনতে পারছ না, ফ্রাঙ্ক? তোমার কাছে আসতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আর কী হাড় কাঁপানো শীত! কাল তো তোমার বিয়ে, ফ্রাঙ্ক। আমি কথা দিয়েছিলাম—অনেকদিন আগে বলেছিলাম আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমার কথা স্মরণ করব আমি। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করেছি। আমি তোমার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি। কম বয়সে মরে গিয়ে আমার খুব আফসোস হচ্ছে, জানো! কত তরুণ বয়সে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে যেতে হয়েছে। নাও—এটা নাও। জলদি করো। আমি আর এখানে থাকতে পারব না। আমি তো তোমাকে আমার জীবন উপহার দিতে পারিনি, ফ্রাঙ্ক, তাই আমার মৃত্যুটাকে নিয়ে এসেছি তোমাকে দেব বলে—নাও!'

ছায়ামূর্তি আমার হাতে গুঁজে দিল ঝুড়ি। ঠিক তখন আবার ঝুপঝুপিয়ে নামল বৃষ্টি, আবছা করে দিল চাঁদের আলো।

'আমাকে যেতে হবে, আমি যাই,' প্রচণ্ড হতাশায় গুঙিয়ে উঠল ভৌতিক, পরিচিত কণ্ঠটি, 'তুমি দরজা খুলতে এত দেরি করলে কেন? অ্যানির সাথে বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না—কোনদিন নয়! কক্ষনো নয়! আমি তোমাকে সারা জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি। সারা জীবনের জন্য!'

শেষ হাহাকার ধ্বনিটি মিলিয়ে গেল, শোঁ শোঁ শব্দে ধেয়ে এল বাতাস, যেন হাজারটা পাখা মেলে উড়ে এল তীব্র গতিতে, ধাক্কার চোটে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়লাম আমি। দড়াম শব্দে

বন্ধ হয়ে গেল রান্নাঘরের দরজা।

টলতে টলতে সিধে হলাম, হাতে ধরা ঝুড়ি, রাখলাম টেবিলের ওপর। এমন সময় উনুনের আগুনটা দপদপিয়ে জ্বলে উঠল, ড্রেসারের বাসনকোসনগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হলো। একটা মোমবাতি চোখে পড়ল, পাশে এক বাক্স দেশলাইও আছে। অন্ধকারে ভয়ের চোটে আমার পাগল হওয়ার দশা, চট্ করে তুলে নিলাম দেশলাই বক্স, একটা কাঠি ঘষে জ্বেলে দিলাম মোম। মোমের আলোয় চারপাশটায় চোখ বুলালাম। ভৃত্যগুলো রান্নাঘরটিকে যেভাবে রেখে গেছে সেরকমই আছে। ম্যান্টলপিসে রাখা ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে চলছে। রাত দুটো বাজে।

ঝুড়ির দিকে চোখ চলে গেল আমার। সাদা-কালোর চমৎকার বিনুনি দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতলটাও তাই। খুবই সুন্দর একটি জিনিস। এটা ম্যাডিরা থেকে কিনে এনেছিলাম আমার অসুস্থ স্ত্রীর জন্য। কিন্তু আইরিশ চ্যানেলে ঝড়ের মুখে পড়ে ঝুড়িটা হারাই আমি। তবে পরে এরকম দেখতে আরেকটা ঝুড়ি বহুবার রান্নাঘরের টেবিলে দেখেছি আমি। আমার স্ত্রী ওই ঝুড়িতে ফুল রাখত। সে বাগান থেকে গোলাপ এনে ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখত। এ ঝুড়িটা যেখানে রেখেছি ওই ঝুড়িটিও একই জায়গায় থাকত।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মনে পড়ে গেল স্মৃতিগুলো। আমার হাতে ধরা মোমবাতি, ভয়ে আধমরা আমি, কিন্তু মন আশ্চর্যরকম সচেতন, ভাবছিলাম আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং পুরোটাই ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। এসব কিছুই আসলে ঘটেনি। মনে মনে প্রার্থনা করলাম এটা যেন দুঃস্বপ্নই হয়। ড্রেসারের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা ইঁদুর, লাফিয়ে পড়ল মেঝেয়, ভেঙে দিল নৈঃশব্দ্য।

ঝুড়িতে কী আছে? দেখতে ভয় লাগছে, কিন্তু আমার ভেতরে কী একটা শক্তি ওদিকে তাকাতে আমাকে বাধ্য করল। আমি এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। বুকের ভেতর ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে কলজে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি টিবটিব শব্দ। একটা হাত বাড়িয়ে খুলে ফেললাম ঝুড়ির ঢাকনি।

'আমি তোমাকে আমার জীবন দিতে পারিনি, তাই তোমার জন্য নিয়ে এসেছি আমার মৃত্যু!' বলেছিল ও। এ কথার মানে কী? মানেটা জানতেই হবে, নইলে পাগল হয়ে যাব। ওই তো ওটা ওখানে শুয়ে আছে, ঝুড়ির ভেতরে, লিনেন দিয়ে মোড়ানো।

হা, ঈশ্বর! এটা তো মরা মানুষের সাদা একটা খুলি!

স্বপ্ন! নিশ্চয় আমি এতক্ষণ আগুনের পাশে বসে স্বপ্ন দেখেছি। ওটা স্রেফ একটা স্বপ্নই ছিল। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! কাল আমার বিয়ে।

কিন্তু সত্যি কি কাল আমি বিয়ে করতে পারব?

মূলঃ হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

হরর কাহিনি

হাকিনী

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

হাকিনীরা খুব নিচু স্তরের পিশাচ। এদের বুদ্ধিবৃত্তি পশু শ্রেণীর হলেও ক্ষমতা প্রচণ্ড। এদেরকে ডেথ এঞ্জেলও বলা যায়। ডেকে এনে যার মৃত্যু চাওয়া হয় তাকে একবার চিনিয়ে দিলেই হলো। বাকি কাজ তাদের। তবে সমস্যা হলো, যার জন্য ডাকা তাকে মারতে না পারলে যে ডেকেছে তাকেই মেরে ফেলবে হাকিনী।
এত কিছু জেনেও মন্ময় চৌধুরীর সাহায্যে হাকিনী জাগানোর সাধনায় বসল সঞ্জয়...
প্রিয় পাঠক, হাকিনীর মত আরও বেশ কিছু রক্ত হিম করা হরর ও পিশাচ কাহিনি দিয়ে সাজানো হয়েছে এ সংকলন। অনীশ দাস অপু সম্পাদিত হরর সংকলন আপনি পছন্দ করেন কারণ, তাঁর বইয়ের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে ভয় ও রোমাঞ্চ।
এ বইটিও আশা করি আপনাদেরকে হতাশ করবে না।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০